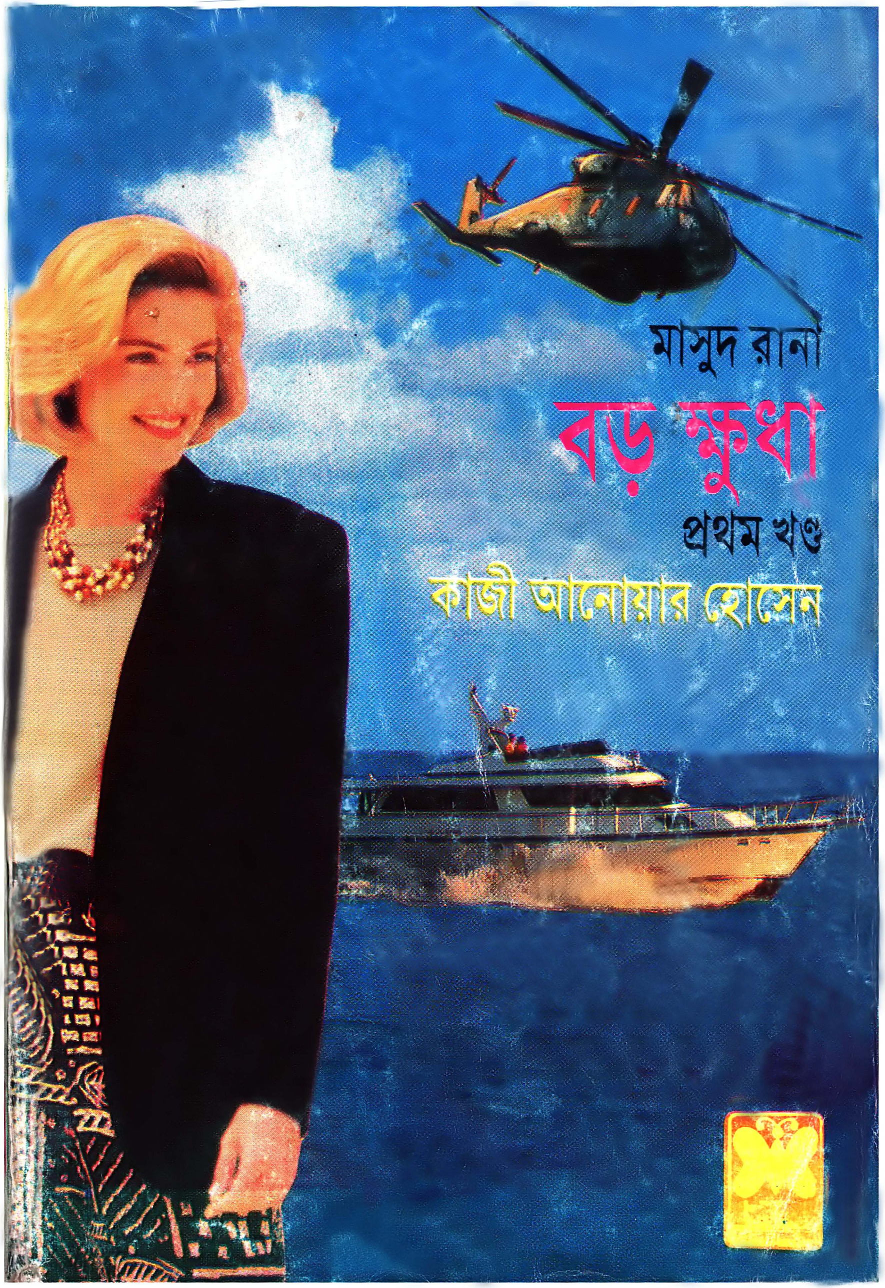
মাসুদ রানা
বড় ক্ষুধা
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

বড় ক্ষুধা

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

আটলান্টিকের অতল গভীর থেকে বেরিয়ে এসেছে অতিকায় এক দানব, ক্ষুধার যন্ত্রণা আর খুনের নেশায় উন্মাদ। ওটাকে মাছ বলা যাবে না, আবার স্তন্যপায়ী কোন প্রাণীও নয়, বাতাস নিতে হয় না বলে পানির ওপর ওঠার কোন দরকার নেই তার।

সে কখনও ঘুমায় না। শত্রু তার মাত্র একটা, বাকি সমস্ত প্রাণী তার শিকার। নিজের বিশাল আকৃতি বা প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। উত্তেজিত হয়ে উঠলে বারবার রঙ বদলায়। ঘন কালো পানিতে ঘুরে বেড়ায় একা।

বারমুডায় ছুটি কাটাতে এসে আঁতকে উঠল মাসুদ রানা। সবাইকে সাবধান করতে চাইছে, কিন্তু কেউ ওর কথা কানে তুলছে না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ২২৭

বড় ক্ষুধা

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সেবা
প্রকাশনী

সাতাশ টাকা

ISBN 984 16 7227 8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-227
BODO KHUDHA
Part-I
By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা *বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা
মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয়
শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ
কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা
কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত
ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ
জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ
অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী।

এক

পানির রঙ ওখানে ঘন কালো। সেই পানিতে ঝুলে আছে ওটা। অপেক্ষা করছে।

মাছ নয়, ভাসিয়ে রাখার জন্যে শরীরে কোন এয়ার ব্লাডার নেই, তবে মাংসে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ থাকায় সমুদ্রের অতলতলে তলিয়ে যায় না। আবার স্তন্যপায়ী কোন প্রাণীও নয় ওটা, বাতাস নিতে হয় না বলে পানির ওপর মাথা তোলার কোন গরজ অনুভব করে না।

কালো পানিতে ঝুলে আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে নেই। ঘুম কাকে বলে জানেই তো না। তবে বিশ্রাম নেয়। বুলেট আকৃতির শরীর, পানি টানার জন্যে গভীর ফুটো বা গর্ত আছে শরীরে, টেনে নেয়া পানি থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে।

ঢেউ খেলানো আটটা বাহু স্রোতের সঙ্গে ঝুলছে, লম্বা দুটো টেন্টাক্যল (কর্ষিকা) শক্তভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে সেঁটে রয়েছে শরীরে। যদি কোন হুমকি দেখা দেয় বা খুনের নেশায় পেয়ে বসে, ছেড়ে দে স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে সামনে ছুটবে ওগুলো, কাঁটা লাগানো চাবুকের মত।

একটাই শত্রু ওটার, পানির জগতে বাকি সমস্ত প্রাণী তার শিকার। নিজের সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, বিশাল আকৃতি বা ধ্বংসকরী ক্ষমতা

সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সমুদ্রের ঠিক আধ মাইল নিচে ভেসে আছে ওটা, সূর্যের আলো যেখানে পৌঁছুতে পারে না। তবু ওর প্রকাণ্ড চোখে অস্পষ্ট চকচকে ভাব ধরা পড়ছে। ছোটখাট অনেক শিকারী প্রাণী আতঙ্কিত বা উত্তেজিত হলে তাদের শরীর থেকে আলো ছড়ায়।

মানুষের চোখ যদি দেখার সুযোগ পেত, তারপরও ওটার গায়ের রঙের বর্ণনা দেয়া সহজসাধ্য হত না। গাঢ় তামার সঙ্গে নীল আর বেগুনি মেশালে যা হয়; তবে তা শুধু এই রকম সময়ে, যখন বিশ্রাম নিচ্ছে। উত্তেজিত হলে বার বার বদলে যায় রঙ।

জলদানবের সেনসরি সিস্টেম সাগরের শুধু একটা বৈশিষ্ট্যই সারাক্ষণ মনিটর করে, তা হলো তাপমাত্রা। চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন ডিগ্রী ফারেনহাইটে সবচেয়ে আরাম বোধ করে ওটা। পাহাড়ের ঢালে বাধা পেয়ে স্রোতের গতি কমে বাড়ে, তাপমাত্রাও ওঠা-নামা করে, সেই সঙ্গে জলদানবও ওপরে ওঠে কিংবা নামে নিচে।

এই মুহূর্তে একটা পরিবর্তন অনুভব করছে ওটা। স্রোতে ভাসতে ভাসতে মৃত একটা আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি চলে এসেছে। সামুদ্রিক খাদ থেকে আগ্নেয়গিরিটা খাড়া হয়ে উঠে এসেছে, ঠিক যেন একটা সূঁচ। পাহাড়টাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে স্রোত, ঠাণ্ডা পানি সবেগে উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে। কাজেই টেইল ফিন-এর সাহায্যে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে ওটা অন্ধকারের ভেতর।

মাছদের মতই ওটার কোন সমাজ নেই, ঘুরে বেড়ায় একা একা। সেজন্যেই জানে না যে তার মত আরও অনেক জলদানবের অস্তিত্ব আছে আটলান্টিকে, সংখ্যায় এত বেশি আগে কখনও দেখা যায়নি। যে-কোন কারণেই হোক, এক্ষেত্রে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকেনি।

ওটা শুধু বেঁচে থাকার জন্যে বেঁচে নেই, বেঁচে আছে খুন করার জন্যে। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে প্রাণী জগতের অনেকেই প্রয়োজন ছাড়াও খুন করে, জলদানবের ভেতরেও যেন সেরকম একটা প্রবণতা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

দূর থেকে বোটটাকে দেখে মনে হবে দিগন্ত বিস্তৃত নীল সাটিনের ওপর একটা ধান পড়ে আছে। দিন কয়েক ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে একটানা বাতাস ছুটেছে, ঘণ্টা কয়েক হলো গতি হারিয়ে একেবারে থেমে গেছে সেটা। এই থমথমে পরিবেশ অনিশ্চিত একটা ভাব সৃষ্টি করে মনে, বাতাস যেন সতর্ক যোদ্ধার মত দম আটকে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে, এরপর কোথায় কিভাবে হামলা করবে।

বোটের ককপিটে বসে রয়েছে বিলি ম্যাক, খালি ডান পা হুইলের একটা স্পোকে তোলা। বাতাস না থাকলেও ঢেউ আছে, বিশেষ একটা ছন্দে ওঠা-নামা করছে বোট। পালগুলোর দিকে একবার চোখ তুলল সে, তারপর হাতঘড়ি দেখল, বোকা বলে গাল দিল নিজেকে। এ-ধরনের শান্ত পরিবেশ আশা করেনি সে, কোর্স নির্ধারণ করার সময় ধরে নিয়েছিল দখিনা বাতাসের সহায়তা পাবে। প্রথমে রয়্যাল নেভি ডকইয়ার্ডে একজন কাস্টমস অফিসার দেরি করিয়ে দিল ওদেরকে, এত থাকতে আজই তার শখ চাপল একজন শিক্ষানবিসকে হাতে-কলমে দেখাবে বাহান্ন ফুটী একটা হ্যাটারাস বোট কিভাবে সার্চ করতে হয়। তারপর বাতাসের এই খামখেয়ালীপনা। এতক্ষণে তাদের গভীর সাগরে পৌঁছে যাবার কথা। অথচ…ফ্যানটেইল-এর পিছনে তাকিয়ে ইস্টার্ন ব্লু কাট-এর শেষ মাথায় লম্বা চ্যানেল মার্কার দেখতে পেল ম্যাক, অস্তগামী সূর্যের আলোয় সাদা একটা বিন্দুর মত চকচক করছে।

হ্যাচ বেয়ে ওপরে উঠে এল তার স্ত্রী, এক কাপ চা ধরিয়ে দিল হাতে। কাপটা নিয়ে ধন্যবাদ দিল সে, তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে মন্তব্য করল, 'তোমাকে তো দারুণ দেখাচ্ছে!'

বিস্মিত লুসি ঠোঁট টিপে হাসল, বলল, 'তোমাকে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না।'

'আমি সত্যি সিরিয়াস। ছ'মাস বোটে থাকার পর কিভাবে এটা সম্ভব বুঝতে পারছি না।'

'দৃষ্টিভ্রম।' ঝুঁকে স্বামীর কপালে চুমো খেলো লুসি।

'গন্ধটাও দারুণ তো!' স্ত্রীর খালি পায়ের দিকে চোখ রেখে বলল ম্যাক। 'নেশা ধরিয়ে দেয়।' তেল মাখানো ওক কাঠের মত চকচকে ওগুলো, কোথাও কোন দাগ নেই, বা নীলচে শিরাও ফুটে ওঠেনি; কে বলবে পনেরো বছর আগে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

'আবার কিভাবে আমি জুতো পরব বলো তো?' হাসছে লুসি। 'চেষ্টা করে দেখতে হবে বেয়ারফুট কমার্স ব্যাংকে কোন চাকরি পাওয়া যায় কিনা।'

'ওখানে আদৌ যদি পৌছুতে পারো।' ইঙ্গিতে মেইনসেইলটা দেখাল ম্যাক, সেটা চুপসে আছে।

'বাতাস আবার শুরু হবে।'

'তা হয়তো হবে। তবে আমাদের হাতে সময় নেই।' সামনের দিকে ঝুঁকল ম্যাক, এঞ্জিন চালু করার জন্যে ইগনিশন কী ধরতে গেল।

'না।'

'ভেবেছ আমার খুব ভাল লাগছে? সোমবার সকালে ব্রোকার ভদ্রলোক ডকে থাকবেন, তার আগেই আমাদের ওখানে পৌছে যাওয়া উচিত।'

'এক মিনিট,' হাত তুলে বাধা দিল লুসি। 'শুনে আসি ওয়েদার রিপোর্ট কি বলে।'

নিচে নেমে গেল লুসি। বোটের পিছন থেকে হালকা ছলছল শব্দ ভেসে এল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে আট-দশটা ছোট মাছ দেখতে পেল ম্যাক, হলুদ রঙা খানিকটা সমুদ্রশৈবালকে ঘিরে লাফালাফি করছে। শ্যাওলার ভেতর আশ্রয় নিয়েছে ছোট চিংড়ি ও অন্যান্য খুদে প্রাণী, কে ক'টা শিকার ধরতে পারে তারই প্রতিযোগিতা শুরু করেছে মাছগুলো। সামুদ্রিক শ্যাওলা আর সামুদ্রিক পাখি খুব ভাল লাগে ম্যাকের। সামুদ্রিক পাখি তাকে স্বাধীনতার কথা বলে। হাঙর বলে নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা। আর ডলফিন? ওগুলো তাকে ঈশ্বরের কথা মনে করিয়ে দেয়। হলুদ সমুদ্রশৈবাল জীবনের কথা বলে। স্রোতের টানে ভেসে যায় ওগুলো, ছোট প্রাণীদের খাবার বহন করে, সেগুলো আবার বড় আকৃতির প্রাণীদের আহারে পরিণত হয়। এভাবেই প্রকৃতি একটা ফুড চেইন তৈরি করে রেখেছে।

রেডিও থেকে শব্দ ভেসে আসে, শুনতে পায় ম্যাক। 'ইয়ট মুনলাইট, বারমুডা হারবার রেডিও··· গো অ্যাহেড।'

'ইয়েস, বারমুডা। উই আর সেইলিং নর্থ ফর কনেকটিকাট। উই উড লাইক টু গেট আ ওয়েদার ফোরকাস্ট। ওভার।'

'রাইট, মুনলাইট। ব্যারোমিটার থ্রী-ওহ্-পয়েন্ট-ফোর-সেভেন অ্যাণ্ড স্টেডি। উইণ্ড সাউথওয়েস্ট টেন টু ফিফটিন ভিয়ারিং নর্থওয়েস্ট। ওয়েভস থ্রী টু সিক্স ফিট টুনাইট অ্যাণ্ড টুমরো, উইথ নর্থওয়েস্ট ফিফটিন টু টোয়েনটি। স্ক্যাটারড শাওয়ার্স পসিবল ওভার ওপেন ওয়াটার। ওভার।'

'মেনি থ্যাঙ্কস, বারমুডা।'

হ্যাচ হয়ে আবার উঠে এল লুসি। 'দুঃখিত।'

'আমিও।'

'ব্যাপারটা এভাবে শেষ হবার কথা ছিল না।'

'না।'

কথা ছিল অর্থাৎ প্ল্যান করা হয়েছিল দক্ষিণ-মুখী বাতাসে ভর করে ফিরবে ওরা, এঞ্জিনের সাহায্য একবারেই নেবে না; পুরোটা দূরত্ব পেরিয়ে সেই উপকূল পর্যন্ত। তারপর মন্টাউক পয়েন্ট পেরোবে, এরপর সামনে থাকে ফিশার্স আইল্যাণ্ড আর স্টোনিংটন হারবার। রওনা হবার পর থেকে গত ছ'মাসে বিভিন্ন দেশের পতাকাবাহী বার্জ, জাহাজ, ইয়ট ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়েছে ওরা, ছুঁয়ে গেছে অসংখ্য ইয়ট ক্লাব আর ডক; ফেরার পথেও আবার সেগুলোকে দেখতে পাবে, পাশ কাটাবে ইয়ট ক্লাব আর ডকগুলোকে। আশা ছিল স্টোনিংটন ব্রেকওয়াটার-এ পৌঁছুলে বাতাস খানিকটা পুব দিকে ঠেলবে ওদেরকে, ওরা যাতে হারবার ধরে বিজয়ীর মত ফিরতে পারে। ডকে ওদের দুই সন্তানকে নিয়ে লুসির মা অপেক্ষা করবেন, ম্যাকের বোনও থাকবে তার বাচ্চাদের নিয়ে। ওখানে একটা শ্যাম্পেনের বোতল খুলবে ওরা, তারপর ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র নামিয়ে বোটটাকে তুলে দেয়া হবে বিক্রির জন্যে একজন ব্রোকারের হাতে।

এভাবেই শেষ হবে ওদের জীবনের একটা পরিচ্ছেদ, শুরু হবে নতুন আরেকটা।

'এখনও যে আশা নেই, তা নয়,' বলল ম্যাক। 'বছরের এই সময়টায় উত্তর-পশ্চিম-মুখী বাতাস টেকে না।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'না টিকলেই রক্ষে, তা না হলে আমাদের ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে। আর ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে বোট শুধু আগুপিছু করবে, ওই অবস্থায়

বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যাব আমরা।' চাবি ঘুরিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। ফোর-সিলিণ্ডার ডিজেল খুব যে একটা শব্দ করে তা নয়, তবে ম্যাকের কানে যেন মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত শুরু হলো।

লুসি চোখ কোঁচকাল। 'গড, আই হেট দ্যাট থিং!'

'একটা মেশিনকে তুমি ঘৃণা করতে পারো না।'

'আমি তা-ও পারি। কারণ আমি দেখতে দারুণ। তুমি নিজেই বলেছ। সংবিধানে আছে, দেখতে দারুণ একটা মেয়ে যে-কোন জিনিসকে ঘৃণা করতে পারে।' নিঃশব্দে হাসছে লুসি, ইয়টের সামনের তেকোণা পালটা নামাবার জন্যে এগোল সে।

'পজিটিভলি চিন্তা করো,' চিৎকার করল ম্যাক। 'এতদিন যথেষ্ট সেইলিং হয়েছে। এবার আমরা খানিকটা মোটরিং করব।'

'আমি পজিটিভলি চিন্তা করতে চাই না। আমার রাগ হচ্ছে, হতাশ লাগছে। ভাল লাগবে তুমিও যদি রেগে ওঠো।'

'কিসের ওপর রাগ করব বলে দাও।' তেকোণা পাল নামানো হয়েছে দেখে গিয়ার দিল ম্যাক, বোটের নাক বাতাসের দিকে ঘোরাল। মনে হলো একটু যেন গতি পেয়েছে বাতাস। 'দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী আর বেপরোয়া একটা মেয়ের সঙ্গে আটলান্টিকে আটকা পড়েছি আমি। আমার একটা বোট আছে, বিক্রি করলে যে টাকা পাব তা দিয়ে এক বছরের খরচ চলে যাবে, এবং ভাল একটা চাকরি পেতে এক বছরের বেশি লাগার কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, সব মিলিয়ে আমার খুব ফুর্তি লাগছে। এর বেশি একজন মানুষ আর কি চাইতে পারে?'

ইয়টের সামনের দিকে চলে এল লুসি, মেইনসেইল গুটাতে শুরু করল। 'আচ্ছা, যা পাওয়ার সব পেয়ে গেছ তাহলে? এখন তুমি সময়টা ফুর্তি করে কাটাতে চাও?'

'ঠিক ধরেছ।' বড় পালটা গুটানোর কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করল সে, ইয়টের বো বাতাসের দিকে ধরে রাখার জন্যে স্টিয়ারিঙে পা আটকে রেখেছে। 'কিন্তু ফুর্তি করতে চাইলে কি হবে, ছোট্ট একটা সমস্যা আছে।'

'কি সেটা?' এক পায়ে দাঁড়াল লুসি, অপর পায়ের আঙুল দিয়ে ম্যাকের পায়ের পাতায় একটা বৃত্ত আঁকছে।

'বোটটা চালাবার জন্যে একজন লোক দরকার।'

'অটোমেটিক পাইলটের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'গ্রেট আইডিয়া···যদি থাকত।'

'তা ঠিক। ভাবলাম ভুলে যাবার ভান করলে হয়তো পেয়ে যাব একটা।'

'তুমি মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন,' বলল ম্যাক। 'বাইরেটা উপাদেয়, তবে ভেতরে পাগলামির ভাব আছে।' ভাঁজ করা পালের মাঝখানে ঝুঁকে স্ত্রীকে চুমো খেলো সে। ক্যানভাসের স্তূপ বাঁধার জন্যে হাত বাড়াল কর্ড-এর দিকে, হুইলে আটকানো পাটা পিছলে গেল, সেই সঙ্গে বাতাসের দিক থেকে ঘুরে গেল বোট। একটা ঢেউ এসে আঘাত করল স্টারবোর্ডে, ঠাণ্ডা পানির ছিটা লাগল লুসির পায়ে।

'চমৎকার,' বলল সে। 'রোমান্সের বারোটা বাজাতে ভালই শিখেছ।'

তাড়াতাড়ি বোট আবার সিধে করে নিল ম্যাক। ঢেউগুলো এখন ঘন ঘন আসছে, মাথায় সামান্য ফেনা। বাতাসের গতি আরও যেন একটু বেড়েছে। 'আমার বোধহয় আরেকটু অপেক্ষা করা উচিত ছিল, দেখে মনে হচ্ছে বাতাস আরও বাড়বে।'

'চোখের সামনে বিশ্ব-সুন্দরী দাঁড়িয়ে থাকলে এ-সব কি কারও

খেয়াল থাকে?' হাসতে হাসতে ঘুরে দাঁড়াল লুসি, গুরুনিতম্ব দুলিয়ে নেমে গেল নিচে।

পশ্চিমে তাকিয়ে ম্যাক দেখল দিগন্তরেখার নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সূর্য। একটা ঢেউ থেকে ঢাল বেয়ে নিচে নামল বোট, পরবর্তী ঢেউয়ের গায়ে নাক ঢোকাল। বোটের সামনে বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ল পানি। ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল সে, ভাবল লুসিকে ডেকে রেনকোটটা আনতে বলবে কিনা। এই সময় আবার ফিরে এল লুসি, নিজের রেনকোট পরে আছে, হাতে এক কাপ কফি।

'ওঠো, আমি কিছুক্ষণ চালাই,' বলল সে। 'তুমি খানিকটা ঘুমিয়ে নাও।'

'আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

'জানি, কিন্তু বাতাস যদি না ফেরে সারাটা রাতই জেগে বসে থাকতে হবে।' হুইল ঘুরে এগিয়ে এল সে, বসে পড়ল ম্যাকের পাশে।

'ঠিক আছে,' বলল ম্যাক, হুইল থেকে স্ত্রীর একটা হাত তুলে চুমো খেলো তাতে।

'এটা কি জন্যে?'

'চেঞ্জ অভ কমাণ্ড। প্রাচীন রীতি। পালাবদলের সময় সহকর্মীর হাতে চুমো খেতে হয়।'

'ব্যাপারটা বেশ তো।'

দাঁড়াল ম্যাক, হ্যাচের দিকে এগোল। 'বাতাস মরে গেলে আমাকে ডেকো।' নিচে নেমে চার্টের ওপর ঝুঁকল সে, নিজেদের পজিশন বের করল, তারপর এখান থেকে মন্টাউক পয়েন্টের দূরত্ব মাপল। হ্যাচ থেকে মাথা বের করে বলল, 'থ্রী-থ্রী-ওহ্, কেমন?' গত কয়েক মিনিটে অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক, কম্পাস রাখার বাক্সের মাথায় যে আলো জ্বলছে

তার আভায় লালচে লাগছে লুসির চিবুক আর গলা, হলুদ রেনকোটটা কমলা হয়ে উঠেছে, লালচে চুল কয়লার মত জ্বলছে যেন। 'সত্যি তুমি খুব সুন্দর,' বলে পিছিয়ে এল সে, কেবিন হয়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে লুসির বাঙ্কে শুয়ে পড়ল ম্যাক। বালিশে স্ত্রীর গন্ধ পেয়ে আবেশে চোখ বুজল সে। ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরই।

এঞ্জিনটা পুরানো নয়, ওরা কেনার আগে মাত্র সাতশো ঘণ্টা চলেছে। ম্যাক ওটার যত্ন নেয় আপন সন্তানের মত। কিন্তু এগজস্ট পাইপটার যত্ন নেয়া খুব কঠিন। পিছনের এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট ওটা, প্রপেলার শ্যাফটের পাশে শক্তভাবে সেঁটে আছে, আফটার কেবিনের নিচে। অত্যন্ত ভাল ইস্পাত দিয়ে তৈরি ওটা, তবে এক হাজার ঘণ্টার বেশি লবণাক্ত পানি আর ঝাঁঝাল গ্যাস বহন করেছে। এঞ্জিন যখন চলে না, পাইপের গায়ে তখন লবণ জমে, সেই সঙ্গে জমে মরচে ধরার অন্যান্য উপাদান। ধীরে ধীরে ক্ষয় হয় ইস্পাত।

এগজস্ট পাইপের অতি সামান্য ফুটোটা হয়তো কয়েক হপ্তা আগেই তৈরি হয়েছে। বাহামা থেকে এ-পর্যন্ত সারাক্ষণ বাতাস পেয়েছে বোট, শুধু সেন্ট জর্জ হারবার অ্যাণ্ড ডকইয়ার্ডে ঢোকার ও বেরুবার সময় ব্যবহার করা হয়েছে এঞ্জিন। কিন্তু এখন এঞ্জিনটা কোন বিরতি ছাড়াই চলছে, হিট-এক্সচেঞ্জার পাম্প কাজ করছে সারাক্ষণ, ফলে ফুটোটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে আকারে। কিনারা থেকে খসে পড়ল মরচে, গর্তটায় এখন একটা পেন্সিল ঢুকে যাবে। আগে পানি চোয়াচ্ছিল, এখন ফিনকি দিয়ে ঢুকছে।

হুইলে পা, ককপিটের পিছনে কুশনের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে লুসি। ওর বাঁ দিকে, পশ্চিমে, দিনের অবশিষ্ট বলতে পৃথিবীর বেগুনি কিনারা

শুধু। ডান দিকে কাস্তে আকৃতির চাঁদ উঠছে, তারই ম্লান আলো সাগরের গায়ে সনাক্ত করছে ওকে।

ওখানে কোন আত্মা নেই, চাঁদটার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করল লুসি। আইডিয়াটা একজন আরব লেখকের, সম্ভবত রূপকথা থেকে নেয়া। আরও অনেক বইয়ের সঙ্গে এই একটা বইও বছরের পর বছর শুধু বুক-শেলফের স্থান পূরণ করেছে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পড়ার সময় পায়নি ও। অবশ্য খেদটা এখন আর নেই, কারণ গত ছ'মাসে শুধু এই বইটা নয়, প্রায় সব বইই ওর পড়া হয়ে গেছে। আইডিয়াটা দারুণ ভাল লেগে গেছে ওর। নতুন চাঁদ আসলে আকাশপথে খালি একটা বাহন, যাবার পথে এক এক করে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মা সংগ্রহ করে। যত দিন যায় ততই আত্মাদের ভারে মোটা হতে থাকে চাঁদ, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়, সমস্ত বোঝা খালাস করে স্বর্গে। স্বর্গ থেকে আবার বেরিয়ে আসে, সরু আর হালকা, নতুন করে শুরু করে আত্মা সংগ্রহের কাজ। এভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী চলছে।

ধারণাটা ভাল লেগে যাবার কারণ, জীবনে এই প্রথম নিজেকে, নিজের আত্মাকে চিনতে শুরু করেছে লুসি। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী কেউই কোনদিন হিসাব মিলিয়ে ভেবে দেখেনি ওরা সুখী কিনা। ম্যাক তার ব্যাংকের চাকরি নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রথম সারির একজন অফিসার তখন। স্ত্রী সুখী কিনা, নিজেরই বা কি অবস্থা সে-কথা ভেবে দেখার সময় কোথায়। দু'জন মিলে দামী খেলনা সংগ্রহ করছিল শুধু—এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটা অ্যাপার্টমেন্ট, স্টোনিংটনে পাঁচ লাখ ডলারের একটা বাড়ি, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত দুটো গাড়ি ইত্যাদি। টাকা এসেছে, আবার টাকা খরচাও হয়ে গেছে। প্রাইভেট স্কুলের ফি বিশ হাজার ডলার, হপ্তায় দু'দিন বাইরে খেতে এক

বছরে বেরিয়ে গেছে পনেরো হাজার ডলার, ছুটি কাটাতে গিয়ে খরচ হয়েছে বিশ হাজার ডলার, পনেরো হাজার ডলার ব্যয় হয়েছে বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে।

এভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন স্রোতটা থেমে গেল। সমস্ত কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হলো। তারপর নতুন প্রস্তাব দেয়া হলো, হয় অর্ধেক বেতনে অর্ধেক কাজ করো, নাহয় অন্য পথ দেখো।

ম্যাকের যে আর্থিক অবস্থা ছিল, এক বছর অনায়াসেই চলতে পারত। বসে বসে খাও, নতুন চাকরির চেষ্টা করো। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কারুরই সেটা পছন্দ হলো না। মাত্র কয়েক দিন ঘরে বসে থেকে ম্যাকের ধারণা হলো, নিজেদেরকে তারা বঞ্চিত করছে। পরামর্শটা এল লুসির কাছ থেকে। একটা বোট কিনে সাগরে ভেসে পড়া যাক, জীবনের কাছ থেকে আরও কিছু পাবার আছে কিনা সেটাও দেখা হবে, সেই সঙ্গে যাচাই হয়ে যাবে পরস্পরকে তাদের আরও কিছু দেয়ার আছে কিনা।

যেই ভাবা সেই কাজ। স্টোনিংটনের বাড়িটা রাখল ওরা, বিক্রি করে দিল অ্যাপার্টমেন্ট। ব্যাংকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখল, সুদের আয় থেকে ছেলে-মেয়ে দুটোর লেখাপড়ার খরচ চলে যাবে।

অবশেষে স্বাধীন হলো ওরা। স্বাধীনতার সঙ্গে এল উত্তেজনা আর ভয়, এবং অদ্ভুত একটা নেশা। আবিষ্কারের নেশা। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে কিছু না কিছু আবিষ্কার করছে ওরা। নিজেকে জানছে, পরস্পরকে জানছে, আবিষ্কার করছে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ, বুঝতে পারছে কোন অভ্যাসটা কেন ত্যাগ করা উচিত।

এর পরিণতি বিষাদময়ও হতে পারত। চল্লিশ ফুট লম্বা আর বারো

ফুট চওড়া একটা বোটে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা দু'জন মানুষ বন্দী। প্রথম দু'হপ্তা সংশয় ছিল মনে। পরস্পরকে বিরক্ত করেছে ওরা, এটা সেটা নিয়ে ঝগড়া হয়েছে।

তারপর, ধীরে ধীরে, পরস্পরের প্রতি সহনশীল হয়ে উঠেছে। যে-যার নিজের অদক্ষতা কাটিয়ে উঠেছে, ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, সেই সঙ্গে পরস্পরের শক্তি ও দক্ষতাকে স্বীকৃতি দিতে শিখেছে।

আবার ওরা প্রেমে পড়ল। এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আবার ওরা পছন্দ করতে শুরু করল নিজেদেরকে।

বাড়ি ফিরে কি করবে সে-সম্পর্কে ওদের কোন-ধারণা নেই। ম্যাক হয়তো কোন ব্যাংকেই ভাল একটা চাকরি খুঁজে নেবে। কিংবা কোন বোটইয়ার্ডে। গত ছ'মাসে প্রমাণ হয়ে গেছে, জাহাজে রঙ লাগানো বা পাল সেলাই করার কাজ ভালই লাগে তার। এ-সব কাজ তার ছোট বলেও মনে হয় না।

আর লুসি? সে হয়তো শিক্ষানবিসদের সেইলিং শেখাবে, কিংবা হয়তো কোন এনভায়রনমেন্টাল গ্রুপে স্টাফ হিসেবে যোগ দেবে। কিছু এসে যায় না। যে-কোন কাজই ওরা করতে পারবে। আর যে-কাজই করুক, এখন ওরা মজা পাবে, কারণ এখন ওরা সম্পূর্ণ নতুন মানুষ।

ভ্রমণটা সত্যি দারুণ উপভোগ্য হয়েছে, কোথাও একটু খুঁত নেই।

না, খুঁত নেই এ-কথা বলা যাবে না। মন খারাপ করার একটা কারণ অন্তত ঘটেছে। এঞ্জিন চালু করতে বাধ্য হয়েছে ওরা। একটানা এই কর্কশ শব্দ একদমই সহ্য করতে পারে না লুসি।

ঘুম এসে গেছে চোখে, ঢুলছে লুসি। আরাম করে একটু ঝিমিয়ে নেবে, তারও উপায় নেই। একে তো এঞ্জিনের শব্দ, তার ওপর ঝাঁকিও খাচ্ছে

বোট। এরকম একটা ঝাঁকি খেয়ে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল সে, ভাবল এবার ম্যাকের ঘুম ভাঙায়। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করল না, মাত্র দেড় ঘণ্টা হলো ঘুমাতে গেছে ম্যাক, আরও অন্তত আধ ঘণ্টা ঘুমাতে দেয়া উচিত তাকে।

ঘুম তাড়াবার জন্যে গান গাইবে নাকি? বৈজ্ঞানিক সত্য, গান করতে করতে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে না। শুরু করল লুসি, 'হোয়াট আর ইউ ডুইং দা রেস্ট অব ইওর লাইফ?' বোটের পিছনে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল একটা ঢেউ, ভিজিয়ে দিল তাকে।

কোন সমস্যা না। পানি ঠাণ্ডা নয়।

ঢেউ? কিন্তু খোলা সাগরে যাবার পথে কি ধরনের ঢেউ একটা বোটে উঠে আসবে? ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল লুসি। পিছনটা ডুবে যেতে আর চার ইঞ্চি মাত্র বাকি। সে তাকিয়ে রয়েছে, বোটের পিছন দিক আবার ডেবে গেল, সবেগে ওপরে উঠে এল পানি, ছড়িয়ে পড়ল কুশনের ওপর। ভয়ে আর উত্তেজনায় শিরশির করে উঠল তার পিঠ। আরও এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল সে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল। প্রথমে বুঝতে হবে আসলে কি ঘটছে। বোটের দু'পাশে সাগর আগের চেয়ে যেন বেশি ফুলে-ফেঁপে রয়েছে। বোটের গতিও আগের চেয়ে মন্থর, হেলেদুলে এগোচ্ছে, যেন ওজন বেড়ে গেছে খুব।

হাত বাড়িয়ে হুইলের সামনে থেকে একটা প্লাস্টিক কাভার সরাল লুসি, সুইচ চাপ দিয়ে বিলজ পাম্প স্টার্ট দিল। ইলেকট্রিক মোটরের আওয়াজ ভেসে এল, কিন্তু শব্দটা কেমন যেন অন্য রকম লাগল কানে। যেন দূর থেকে ভেসে আসছে, অস্পষ্ট; স্বতস্ফূর্ত নয়। 'বিলি!' চিৎকার করল সে। কোন সাড়া নেই। 'বিলি!' গলা চড়াল সে। তবু সাড়া দিচ্ছে না ম্যাক।

পাল বাঁধার খুঁটির সঙ্গে একটা কর্ড ঝুলছে, সেটা টেনে নিয়ে হুইলের একটা স্পোকে বাঁধল লুসি, অপর প্রান্তটা জড়িয়ে আটকাল খুঁটির সঙ্গে, তারপর হ্যাচ বেয়ে নেমে এল নিচে। এগজস্ট-এর ধোঁয়া লেগে জ্বালা করে উঠল নাক, চোখেও পানি বেরিয়ে এল। ধোঁয়া আসছে মেঝে থেকে। 'বিলি!' আফটার কেবিনের দিকে তাকাল সে, কার্পেটের ওপর ছ'ইঞ্চি পানি জমে গেছে।

স্বপ্ন দেখছে ম্যাক, লুসির ডাকটা তার কানে অনেক দূর থেকে ভেসে এল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ মেলল সে, মাথাটা দপদপ করছে তার, যেন কড়া নেশা করেছে। 'কি ব্যাপার?' ঘুম জড়ানো গলা, বাঙ্কে উঠে বসে ঝুলিয়ে দিল পা দুটো। হঠাৎ খেয়াল করল, তার দিকে ছুটে আসছে লুসি, আর চিৎকার করে কি যেন বলছে। কি বলছে সে?

'আমরা ডুবে যাচ্ছি!'

'ধ্যেত...।' মাথা নাড়ল ম্যাক, চোখ মিটমিট করল। এগজস্ট-এর ঝাঁঝটা এবার তার নাকেও ঢুকেছে।

মেইন কেবিনের কার্পেট গুটিয়ে হ্যাচ তুলল লুসি, এই হ্যাচটাই এঞ্জিন কমপার্টমেন্টকে ঢেকে রেখেছে। ইতিমধ্যে তার কাঁধের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাক। ব্যাটারিগুলো এখনও শুকনো, তবে উঠে আসছে পানি, একটু পরই ডুবে যাবে ওগুলো।

আফটার কেবিনে ছলছল শব্দ করছে পানি, সেদিকে তাকিয়ে কি ঘটেছে বুঝতে পারল ম্যাক। 'এঞ্জিন বন্ধ করো!' চিৎকার করল সে।

'কি?'

'জলদি!'

লিভার খুঁজে নিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল লুসি। শব্দটা থেমে গেল, সেই সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল সার্কুলেটিং পাম্প! বোটে এখন আর নতুন

করে পানি ঢুকছে না। বিলজ পাম্পের আওয়াজটা স্বস্তিকর লাগল ওদের কানে। তবে বোটের পিছনে একটা খোলা ক্ষত আছে এখনও। সিঙ্ক থেকে একজোড়া ডিশ টাওয়েল আর হুক থেকে একটা শার্ট নিয়ে লুসির হাতে ধরিয়ে দিল ম্যাক। 'এগজস্ট পাইপের ভেতর এগুলো ঢুকিয়ে দাও। শক্ত করে ঢোকাবে।'

হ্যাচ বেয়ে ছুটল লুসি।

দেরাজ থেকে একটা ক্রিসেন্ট রেঞ্চ বের করল ম্যাক, ডেকে হাঁটু গাড়ল, ব্যাটারির বাক্স খোলার জন্যে রেঞ্চটা অ্যাডজাস্ট করল একটা বোল্টে। সে যদি এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট থেকে বের করে এক কি দু'ফুট ওপরে তুলতে পারে ব্যাটারি, বিলজ পাম্পকে সময় দেয়া হবে তাতে, ফলে অন্তত পানির আরও ওপরে ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রথম বোল্টটা খুলতেই অসম্ভব দেরি হয়ে যাচ্ছে, মরচে ধরায় পিছলে যাচ্ছে রেঞ্চ। ইতিমধ্যে একপাশে কাত হয়ে গেছে বোট, দোল খাচ্ছে ঘন ঘন ঝাঁকির সঙ্গে। কাবার্ডের একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল, অনেকগুলো প্লেট হড়কে বেরিয়ে এল বাইরে, ডেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

রেঞ্চ আঁট করে হাতলটার ওপর ঝুঁকে পড়ল ম্যাক। বোল্ট ঘুরছে। মাত্র আধ প্যাঁচ ঘুরল, রেঞ্চের হাতল আটকে গেল বাল্কহেডে। হ্যাঁচকা টানে রেঞ্চটা ছাড়াল সে, আবার অ্যাডজাস্ট করল বোল্টে। পানি উঠে আসছে।

ককপিটে, ফ্যান-টেইলের ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছে লুসি। তার হাতে গোল পাকানো একটা তোয়ালে, এগজস্ট আউটলেটের দুই ইঞ্চি ফাঁকটা খুঁজছে খোলের গায়ে। আঙুলের মাথাগুলো কোন রকমে নাগাল পেল সেটার, কিন্তু তোয়ালেটা ভেতরে ঢোকাতে গিয়ে পারল না। গর্তের মুখ থেকে পানির ধাক্কায় ছুটে গেল হাত থেকে, ভেসে চলে

গেল আরেক দিকে।

নতুন একটা শব্দ ঢুকল কানে। শব্দ নয়, নীরবতা। বিলজ পাম্প থেমে গেছে। তারপরই ম্যাকের গলা ভেসে এল নিচে থেকে, 'বারমুডা হারবার রেডিও…দিস ইজ দা ইয়ট মুনলাইট…মেডে, মেডে, মেডে… উই আর সিঙ্কিং…আওয়ার পজিশন ইজ…ধুস শালা!'

বুকের তলা থেকে শার্টটা টেনে নিয়ে দ্বিতীয় তোয়ালের সাহায্যে গোল পাকাল লুসি, স্টার্নের গর্তটা আবার হাতড়াল।

কাত হয়ে গেল বোট। স্টার্ন ডুবিয়ে দিয়ে ধেয়ে এল পানি। স্রোতের সঙ্গে হড়কে গেল লুসি। ভেসে যাচ্ছে সে, কেউ তার একটা হাত ধরে ফেলল। 'বাদ দাও এ-সব,' বলল ম্যাক।

'বাদ দেব? আমরা ডুবে যাচ্ছি!'

'আর ডুবব না,' শান্ত গলা ম্যাকের। 'আগেই ডুবেছি।'

'না, আমি …।'

'শোনো,' বলল ম্যাক, স্ত্রীকে টেনে নিল নিজের চওড়া বুকে, হাত বুলিয়ে দিল মাথায়। 'ব্যাটারি গেছে, পাম্প গেছে, রেডিও-ও গেছে। মুনলাইট নেই, লুসি। ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে, লক্ষ্মীটি। এখন শুধু একটা কাজই করার আছে আমাদের, ওটা তলিয়ে যাবার আগে সরে যেতে হবে। ঠিক আছে?'

মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল লুসি। মাথা ঝাঁকাল।

'গুড।' স্ত্রীর কপালে চুমো খেলো ম্যাক। 'যাও, ইপিআইআরবি-টা নিয়ে এসো।'

কেবিনের ছাদের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ভেলাটা, সেটা খুলল ম্যাক। ভেলার সবগুলো সেল ফোলানো কিনা চেক করল সে। ডেক প্লেটের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকানো রাবারের বাক্সটাও পরীক্ষা করল। অসংখ্য

দ্বীপে থেমেছে ওরা, বোটে পোর্টাররা উঠেছে, কিছু চুরি যাওয়া অসম্ভব নয়। ফ্লেয়ার, ফিশিং লাইন, খাবারের ক্যান...না, সব ঠিকই আছে। কোমরে হাত দিয়ে দেখে নিল লেদার কেসে সুইস আর্মি নাইফটা আছে কিনা।

বোটের রেইলিঙের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে পাঁচ গ্যালনের একটা প্লাস্টিক জাগ, ভেতরে খাবার পানি। সেটা খুলে ভেলায় রাখল সে। একবার চিন্তা করল নিচে নেমে ছোট আউটবোর্ড মোটরটা নিয়ে আসবে কিনা। না, থাক। যে-কোন মুহূর্তে ডুবে যাবে বোট।

তৈরি হবার সময় নিজের ওপর খুশি হলো ম্যাক। সে আতঙ্কিত হয়নি। ফিরে এল লুসি, তার এক হাতে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ, তাতে ওদের পাসপোর্ট, নগদ টাকা, বোটের কাগজ-পত্র ইত্যাদি রয়েছে। অপর হাতে ইপিআইআরবি—ইমার্জেন্সী বীকন, হলুদ স্টাইরোফোম মোড়া লাল একটা বাক্স, এক মাথায় একটা অ্যান্টেনা।

ইতিমধ্যে ডেকে পানি উঠে পড়েছে, নিচু রেইলিং-এর ওপর দিয়ে সাগরে ভেলা ভাসাতে কোন অসুবিধে হলো না। এক হাতে ভেলাটা ধরে থাকল ম্যাক, অপর হাত দিয়ে লুসির বাহু আঁকড়ে ধরল, ভেলায় ওঠার সময় যাতে পড়ে না যায়। বো-তে বসল লুসি, তারপর ভেলার পিছনে চড়ল সে।

বসল ম্যাক, ইপিআইআরবি-র সুইচ অন করল, টেনে লম্বা করল অ্যান্টেনা, তারপর ডিভাইসটা ইলাস্টিক স্ট্র্যাপ দিয়ে একটা রাবার সেলের সঙ্গে জোড়া লাগাল। ভেলাটা হালকা, উত্তর-পশ্চিম থেকে বাতাসেও বেশ গতি রয়েছে, সেইলবোট থেকে দ্রুত দূরে সরে এল ওরা। লুসির হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল ম্যাক, কথা না বলে চুপচাপ ফেলে আসা বোটটার দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জন।

তারার গায়ে এখন শুধু কালো একটা কাঠামো ওদের সেইলবোট। পিছনটা আরও ডেবে যাচ্ছে, তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ, ঘোড়ার মত খাড়া হলো বো, স্যাঁৎ করে তলিয়ে গেল সাগরের নিচে। পানির ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে বড় বড় বুদবুদ উঠল, ফাটতে শুরু করল সশব্দে। 'ওহ্ গড!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড় বিড় করল ম্যাক।

কয়েক মুহূর্ত হলো অত্যন্ত সতর্ক হয়ে আছে জলদানব। ওটার সেনসরি রিসেপটরগুলো বিপদের সঙ্কেত দিচ্ছে। বড় আকারের কিছু একটা এগিয়ে আসছে, যেখান থেকে তার শত্রুরা সব সময় আসে। প্রচুর পরিমাণে পানি স্থানচ্যুত হয়েছে, প্রেশার ওয়েভ অনুভব করতে পারছে সে।

আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হলো জলদানব। বিশাল শরীরে কেমিক্যাল ট্রিগার কাজ শুরু করেছে, মাংস আর পেশীতে যোগান দিচ্ছে ফুয়েল। গায়ের রঙ বদলে মেরুন থেকে লালচে হয়ে উঠল।

সবচেয়ে বড় দুটো বাহু, দেখতে চাবুকের মত, কুণ্ডলী পাকানো অবস্থা থেকে লম্বা হলো। এরপর ঘুরল ওটা, মুখ করল যেদিক থেকে শত্রু আসছে।

ভয় কাকে বলে জানে না ওটা, পালাবার কথা বিবেচনায় আনে না। তবে হতভম্ব হয়ে গেছে, কারণ শত্রুর কাছ থেকে আসা সঙ্কেতগুলো অচেনা লাগছে তার। শত্রুর গতি তীব্র নয়, আক্রমণের কোন লক্ষণ নেই। তার শত্রু সাধারণত যে-সব শব্দ করে, তার একটাও শুনতে পাচ্ছে না। কি আসছে বোঝা যাচ্ছে না, তবে ভঙ্গিটা প্রথমে ছিল আড়ষ্ট, এলোপাতাড়ি ডিগবাজি খাবার মত, তারপর সোজা নিচে নামতে

শুরু করেছে কোন বিরতি ছাড়াই। জিনিসটা যা-ই হোক, পাশ কাটিয়ে গভীর তলদেশে নেমে গেল, পিছনে রেখে যাচ্ছে বিচিত্র সব শব্দ। ঠনঠন, ঝনঝন। প্রাণহীন, অর্থহীন শব্দ।

জলদানবের রঙ আবার বদলে গেল। ছড়িয়ে পড়ল বাহুগুলো।

স্রোতের টানে সারফেস থেকে মাত্র একশো ফুট নিচে চলে এসেছে ওটা, তারার রুপালি চকচকে ভাব ধরা পড়ছে চোখে। আলো শিকারের সঙ্কেতও হতে পারে, তাই আলো দেখলেই সেটার দিকে উঠে আসে ওটা।

সারফেস থেকে আর মাত্র বিশ ফুট নিচে জলদানব, ওপরের ঢেউ ওটার নড়াচড়ায় প্রভাব ফেলছে, এই সময় নতুন একটা অনুভূতি হলো। একটা আলোড়ন, পানির প্রবাহে একটা বাধা, নড়ছে অথচ নড়ছে না, ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সঙ্গে, পানিতেই রয়েছে অথচ পানির কোন অংশ নয়।

একই সঙ্গে দু'ধরনের ঝোঁক অনুভব করল জলদানব। একটা খুন করার ঝোঁক, অপরটা খাদ্য গ্রহণের। প্রবল হয়ে উঠল খিদে, কারণ সাগরের গভীর তলদেশে হন্যে হয়ে খুঁজেও শিকার পাওয়া যায়নি। একটা সময় ছিল খিদের অনুভূতি বেশিক্ষণ অস্থির করে রাখতে পারত না, খিদে পেলেই অঢেল খাওয়ার সুযোগ ছিল, যখন খুশি তখন। কিন্তু এখন খাবারের খুব অভাব, শিকার পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।

জলদানব আবার সতর্ক হয়ে উঠল। এবার আত্মরক্ষার জন্যে নয়, আক্রমণ করার জন্যে।

ওরা কোন কথা বলছে না।

আকাশে একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়ল ম্যাক। পরস্পরের হাত ধরে বসে

আছে দু'জন, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠে যেতে দেখল হলুদ ফ্লেয়ারটাকে, কালো আকাশের গায়ে বিস্ফোরিত হলো উজ্জ্বল গোলাপী রঙ। তারপর আবার ওরা চোখ নামিয়ে তাকাল যেখানটায় ওদের বোটটা ছিল। প্রথম কিছুক্ষণ দু'একটা জিনিস ভাসতে দেখা গেছে। ককপিটের একটা কুশন, রাবারের একটা ফেণ্ডার। এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। লুসি অনুভব করল ম্যাকের হাত তার হাতে চাপ দিচ্ছে। 'কি ভাবছ?' স্বামীকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার সমস্ত ভাবনা এখন শুরু হচ্ছে একটা বিশেষ শব্দ থেকে—যদি।'

'মানে?'

'যদি আমরা একদিন আগে রওনা হতাম, যদি বাতাসটা না ঘুরে যেত, যদি আমরা এঞ্জিনটা চালু না করতাম...,' শেষ দিকে ম্যাকের গলা তিক্ত শোনাল, '...যদি কুঁড়েমি না করে পাইপটা চেক করতাম...।'

'বিলি, প্লীজ, নিজেকে এভাবে কষ্ট দিয়ো না।'

'না।'

'দোষ আসলে কারও নয়।'

'সম্ভবত,' ভারি গলায় বলল ম্যাক, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে উৎসাহিত হয়ে উঠল সে। 'এই, লুসি, তোমার মনে আছে বীমা করাবার সময় টমসনকে আমরা কি বলেছিলাম? বলেছিলাম সবচেয়ে সস্তাদরের একটা পলিসি চাই আমরা। কিন্তু টমসন বলল, না। কারণ দেখাল, কম দামী পলিসি নিলে যে টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাব তা দিয়ে খেলনা একটা বোট কেনাও সম্ভব নয়। এক রকম জোর করেই পলিসিটা আমাদেরকে গছিয়ে দিল সে। মনে আছে তোমার?'

'আছে।'

'অর্থাৎ আমাদের বোট সাড়ে চার লাখ ডলারে বীমা করা আছে। বিক্রি করলে অত টাকা কোনদিনই পেতাম না।'

ম্যাক কি বলছে, কি তার উদ্দেশ্য, বুঝতে পারছে লুসি। মনে মনে খুশি হলো সে। কিছু বলতে যাবে, একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে নামতে শুরু করে কাত হয়ে গেল ভেলা।

উল্টে যাচ্ছে ভেলা, বুঝতে পারছে লুসি। ঠেকাবার সাধ্য নেই ওদের, জানে সে। তার গলা থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল।

তারপর সিধে হলো ভেলা, দিব্যি নিরাপদে ভাসছে।

'এই,' ফিসফিস করে বলল ম্যাক, একটু ঝুঁকে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখল। 'সব ঠিক আছে। আমরা ভাল আছি।'

'না,' স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বলল লুসি। 'আমরা ভাল নেই।'

'ঠিক আছে, মানলাম, আমরা ভাল নেই। কিন্তু তোমার ভয়টা কি বলো তো?'

'ভয়টা কি মানে?' ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল লুসি। 'সমুদ্রের মাঝখানে, মাঝ রাতে, পিরিচের সমান ছোট একটা নড়বড়ে ভেলায় ভাসছি...তারপরও তুমি জিজ্ঞেস করছ আমার ভয়টা কি? কেন, মারা যেতে পারি না?'

'কি কারণে মারা যাবে?'

'বিলি, ফর গড়স সেক... ।'

'আমি সিরিয়াস। এসো, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি।'

'না, এ-সব নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না।'

'আরও ভাল কিছু করার আছে কি? নাও, শুরু করো।' স্ত্রীর মাথায় চুমো খেলো ম্যাক। 'ভয় নামে যতগুলো দানব আছে সব এক এক করে বের করো, তারপর এসো সব ক'টাকে গলা টিপে মারি।'

'ঠিক আছে।' বড় করে শ্বাস টানল লুসি। 'হাঙর। আমাকে ছিঁচকাঁদুনে বলতে পারো, কিন্তু সত্যি বলছি হাঙরের নাম শুনলেই আতঙ্ক লাগে আমার।'

'হাঙর। বেশ ভাল। ঠিক আছে। হাঙরের কথা আমরা ভুলে যেতে পারি।'

'তুমি হয়তো সত্যিই পারো।'

'না। শোনো। এদিকের পানিতে হাঙর নেই বললেই চলে। বেশিরভাগই মেরে ফেলেছে জাপানী আর কোরিয়ানরা। তবু বড় আকারের কোন হাঙর যদি এদিকে এসেও পড়ে, তার দৃষ্টিতে আমরা উপাদেয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হব না। আর কি?'

'ঝড়, ধরো...।'

'ঠিক আছে। আবহাওয়া। এটা কোন সমস্যাই নয়। আগেই আমরা আবহাওয়ার ভাল খবর পেয়েছি। বছরের এই সময়টায় হ্যারিকেন আসেও না। আর যদি একটা নর্থস্টার এসেও পড়ে, কে বলল আমাদের এই ভেলাটাকে ডুবিয়ে দিতে পারবে? খুব খারাপ কি ঘটতে পারে? হ্যাঁ, এটা উল্টে যেতে পারে। কিন্তু আবার আমরা সিধে করে নিতে পারব।'

'তারপর ভেসে বেড়াব যতদিন না বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করি।'

'সেরকম কিছুও ঘটবে না,' কথা বলতে পারায় খুশি লাগছে ম্যাকের, তার নিজের ভয়গুলোও মাথাচাড়া দিতে পারছে না। 'কারণগুলো বলছি। এক, বাতাস আমাদেরকে বারমুডার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। দুই, এই পথে রোজই জাহাজ চলাচল করে। তিন, ছেলেরা ও ব্রোকার ভদ্রলোক সোমবার বিকেলের দিকে আমরা নিখোঁজ বলে রিপোর্ট করবে এবং বারমুডা হারবার রেডিও আমাদের সম্পর্কে সব কথাই

জানে। তবে এত সবের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার হবে না।' ইপিআইআরবি-র ওপর হাত চাপড়াল সে। 'এই পরম উপকারী বন্ধু সারাক্ষণ বীপ বীপ করছে, প্রথম যে প্লেনটা মাথার ওপর দিয়ে যাবে তার পাইলটই উদ্ধারকারী দলকে খবরটা পৌঁছে দেবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল লুসি, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এ-সব তুমি বিশ্বাস করো?'

'কেন করব না, অবশ্যই…।'

'এবং বলতে চাইছ, তোমার ভয় করছে না?'

স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল ম্যাক। 'অবশ্যই করছে।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল লুসি। 'ভাল।'

'ভয় পেলে কিছু একটা করা দরকার, তা না হলে ভয়টা তোমাকে একেবারে পেয়ে বসবে…।'

স্বামীর বুকে মাথা রেখে শ্বাস নিচ্ছে লুসি। লবণ আর ঘামের গন্ধ পাচ্ছে সে, আর আছে অভয় ও আরাম। সে তার জীবনের বিশটা বছর অনুভব করতে পারছে। 'আচ্ছা,' বলল সে, 'তুমি তাহলে ফুর্তি করতে চাইছ?'

'ঠিক!' হেসে উঠল ম্যাক। 'ভালবাসার উত্তাল সাগরে ভেসে যাব দু'জনে।' পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকল ওরা, ধীর গতিতে দক্ষিণ দিকে ভেসে যাচ্ছে ভেলাটা। মাথার ওপর মিটমিট করছে তারাগুলো।

কিছুক্ষণ পর ম্যাকের মনে হলো লুসি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপরই অনুভব করল বুকটা ভিজে গেছে। 'এই, কি ব্যাপার?'

'ক্লারা,' জবাব দিল লুসি। 'এখনও এত ছোট ও…।'

'কাঁদে না, লক্ষ্মীটি, প্লীজ…।'

'নিজেকে আমি শান্ত করতে পারছি না।'

'তোমার ঘুমানোর চেষ্টা করা উচিত।'

'ঘুমাব!'

'ঠিক আছে, এসো তাহলে সেই খেলাটা খেলি...আমি একজন পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তির কথা ভাবছি, ভদ্রলোকের নাম শুরু হয়েছে এম অক্ষর দিয়ে।'

'এম। ঠিক আছে। তিনি কি একজন...ফরাসী?' হঠাৎ চমকে উঠল লুসি। সিধে হয়ে বসল সে, ঘাড় ফিরিয়ে বোর দিকে তাকাল। 'কি হলো ওটা?'

'কই কি হলো?'

'আঁচড়ানোর শব্দ।'

'আমি কিছু শুনিনি।'

'মনে হলো নখ দিয়ে কেউ আঁচড়াচ্ছে।'

'কোথায়?'

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল লুসি, ভেলার সবচেয়ে সামনের সেলের রাবার স্পর্শ করল। 'ঠিক এখানে। মনে হলো যেন রাবারে কেউ নখ ঘষছে।'

'বোটের কোন জিনিস হবে, ভেসে যাবার সময় ঘষা খেয়েছে। হয়তো এক টুকরো কাঠ। আবার কোনও ফ্লাইং ফিশও হতে পারে। ভুলে যাও।'

'গন্ধটা কিসের বলো তো?'

'গন্ধ?' বড় করে শ্বাস টানল ম্যাক, এবার সে-ও পেল গন্ধটা। 'অ্যামোনিয়া?'

'আমারও তাই মনে হয়েছে।'

'বোটের কিছু একটা হবে।'

'যেমন?'

'তা কি করে বলব। সিঙ্কের তলায় একটা বোতল ছিল…যদি না এখানে কিছু পড়ে থাকে।' ঘুরল ম্যাক, রাবারের বাক্সটা খুলল। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, ঝুঁকে বাক্সের ভেতরের গন্ধ শুঁকল। ঠিক এই সময় ঘোঁত ঘোঁত ধরনের একটা আওয়াজ ঢুকল তার কানে, সেই সঙ্গে লাফিয়ে উঠে একপাশে কাত হয়ে গেল ভেলা। হাঁটুর ওপর সিধে হয়েছিল সে, পড়ে গেল। বাক্সের ভেতর টিনের কৌটাগুলো বাড়ি খেল পরস্পরের সঙ্গে। রাবারের নিচে ডেক প্লেট ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল। অস্পষ্ট ভাবে পানির ছলছল আওয়াজ ঢুকল কানে, যেন এলোমেলো ঢেউয়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে ভেলা। 'এই!' ভেলার দু'দিকে দুটো হাত রেখে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করছে সে। 'সাবধান কিন্তু!'

বাক্সের ভেতর অদ্ভুত কোন গন্ধ নেই। চেইন টেনে বন্ধ করল সেটা। 'এটা থেকে আসছে না।' অথচ অ্যামোনিয়ার গন্ধ আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। বোর দিকে ঘাড় ফেরাল সে। 'ঠিক বলতে পারছি না কিসের…।'

লুসি নেই।

নেই… স্রেফ নেই।

পলকের জন্যে ম্যাকের অনুভূতি হলো, সে পাগল হয়ে গেছে, দৃষ্টি-ভ্রমের শিকার, যা ঘটতে দেখছে তার কিছুই আসলে ঘটছে না, এক মাস অজ্ঞান থাকার পর আর কিছুক্ষণের মধ্যে কোন হাসপাতালে তার জ্ঞান ফিরবে, কোন সড়ক দুর্ঘটনায় বা বজ্রপাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল।

ডাকল সে, 'লুসি!' শব্দটা গিলে ফেলল বাতাস। আবার ডাকল সে।

ধীরে ধীরে বসল ম্যাক, বড় করে শ্বাস টেনে চোখ বুজল। মাথাটা ঘুরছে, বমি পাচ্ছে।

খানিক পর আবার চোখ খুলল, মনে আশা বোতে লুসিকে বসে থাকতে দেখবে, বাঁকা চোখে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

কিন্তু না, ভেলায় সে একা।

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে গোটা ভেলার ওপর হাত বুলাতে শুরু করল ম্যাক। এখনও ভাবছে, হঠাৎ ছুঁতে পারবে লুসিকে। লুসি হয়তো ভেলা থেকে পড়ে গেছে, লাইফলাইনের কোন লুপ ধরে ভাসছে।

না।

আবার বসল ম্যাক। ঠিক আছে, যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করা যাক। সম্ভাবনাগুলো কি কি? লাফ দিয়ে পানিতে পড়েছে লুসি। মাথা ঠিক রাখতে পারেনি, ভেবেছে সাঁতার কেটে তীরে পৌছুবে। কিংবা আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। অথবা...অথবা কি? মঙ্গলগ্রহ থেকে এসে লুসিকে কিডন্যাপ করেছে একদল টেরোরিস্ট?

লুসির নাম ধরে বারবার ডাকছে ম্যাক।

আঁচড়ানোর একটা আওয়াজ পেল সে, অনুভব করল তার নিতম্বের নিচে রাবার স্পর্শ করল কিছু একটা।

লুসি! লুসি ভেলার নিচে! তারমানে কোনভাবে পড়ে গেছে সে, তারপর কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে ভেলার নিচে চলে গেছে, এখন বাতাসের অভাবে ছটফট করছে ওখানে।

কিনারা থেকে ঝুঁকে পড়ল ম্যাক, ভেলার তলায় হাত দিয়ে খুঁজছে। লুসির চুল, পা, রেনকোট, কিছু একটা ধরতে পারলেই চলবে...।

আঁচড়ানোর শব্দটা আবার হলো, এবার তার পিছন দিকে। পানি থেকে হাত তুলে ভেলার মাঝখানে ফিরে এল সে, তাকাল সামনের

দিকে।

রূপালি চাঁদের ম্লান আলোয় ম্যাক দেখল ভেলার সামনে কি যেন নড়ছে। মনে হলো থাবা দিয়ে ধরে রাবারের ওপর উঠে আসার চেষ্টা করছে কেউ যেন। আঁচড়াআঁচড়ি করছে।

একটা হাত। নিশ্চয়ই ওটা একটা হাত হবে। যে জিনিসের সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়ে থাকুক, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে লুসি। অত্যন্ত ক্লান্ত এখন সে, আধ-ডোবা অবস্থা, আঁচড়ে-পাঁচড়ে ওপরে উঠে আসার চেষ্টা করছে।

লাফ দিয়ে সামনে চলে এল ম্যাক, হাত বাড়াল নাগাল পাবার জন্যে। তার আঙুলগুলো যখন ওটার কাছ থেকে এক কি দু'ইঞ্চি দূরে—এত কাছে যে ওটা থেকে বেরিয়ে আসা শীতল ভাব অনুভব করা গেল—সে বুঝতে পারল, হাত নয়, ওটা এমন কি কোন মানুষও নয়।

ওটা আঠাল, ঢেউ খেলানো। অচেনা আজব একটা জিনিস এগিয়ে আসছে তার দিকে, তার নাগাল পেতে চাইছে। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল ম্যাক, ভেলার পিছন দিকে ফিরে আসার চেষ্টা করল। হড়কে গেল সে, পড়ে গেল। ভারের তারতম্য ঘটায় ভেলার বো উঁচু হয়ে উঠল, জিনিসটা অদৃশ্য হয়ে যেতে এক সেকেণ্ডের জন্য স্বস্তিবোধ করল সে।

কিন্তু পরমুহূর্তে আবার ওটাকে দেখতে পেল ম্যাক। ভেলার কিনারা বেয়ে উঠে আসছে। এক সময় ভেলার সামনেটা ঢাকা পড়ে গেল। সিধে হলো ওটা, নিজেকে ছড়িয়ে দিল। ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড কেউটে সাপের মত, তাকিয়ে আছে, ভাবল ম্যাক। ওটার গায়ে গিজগিজ করছে বৃত্ত, প্রতিটি বৃত্ত কাঁপছে নিজ প্রাণস্পন্দনে, বৃত্তগুলো থেকে ফেনাসহ হড়হড় করে বেরিয়ে আসছে পানি।

চেঁচাতে শুরু করল ম্যাক। কোন কথা নয়, অভিশাপ নয়, আবেদন

নয়, শুধুই রোমহর্ষক চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

থামছে না ওটা, সারাক্ষণ সামনে এগোচ্ছে, কুঁকড়ে মোচাকৃতি একটা স্তূপে পরিণত করছে নিজেকে, মনে হচ্ছে যেন হেঁটে আসছে মোচড় ও পাক খাওয়ায় ব্যস্ত বৃত্তগুলোয় ভর করে—আর প্রতিটি বৃত্ত রাবার স্পর্শ করলেই খরখর শব্দ উঠছে, যেন নখ আছে ওটার।

আসছেই ওটা। কোন ইতস্তত ভাব নেই, বিরতি নেই, দিকভ্রান্তি বা হাতড়ানোর ভাব নেই; এমন ভঙ্গিতে আসছে যেন জানে কি খুঁজছে আর ঠিক কোথায় আছে সেটা।

ভেলার বৈঠার ওপর চোখ পড়ল ম্যাকের, স্টারবোর্ড সাইডের সেলগুলোর নিচে ঢোকানো। ছোঁ দিয়ে তুলে নিল সেটা, বেসবল ব্যাটের মত বাগিয়ে ধরে অপেক্ষায় থাকল, লক্ষ রাখছে ওটা তার আরও কাছাকাছি আসে কিনা।

দুই হাঁটু এক করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে, তারপর যখন মনে হলো এখনই সময়, চিৎকার করে বলল, 'সান অফ আ বীচ!' সেই সঙ্গে হাতের বৈঠা দিয়ে সবেগে আঘাত করল ওটার গায়ে।

ওটার গায়ে বৈঠা আঘাত করতে পারল কিনা জানা হলো না তার, শুধু জানতে পারল হাত থেকে বৈঠাটা কেড়ে নেয়া হয়েছে, নাগালের বাইরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভেঙে কয়েক টুকরো করে ফেলে দেয়া হয়েছে সাগরে।

এবার ওটা পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে ঠিক কোথায় রয়েছে ম্যাক, ফলে এগোবার গতি আরও বেড়ে গেল।

হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটল ম্যাক, পড়ে গেল। ছোট্ট জায়গাটায় নিজেকে কুঁকড়ে ছোট করে ফেলতে চেষ্টা করছে সে। তার মাথা কাজ করছে না, উন্মাদ হয়ে গেছে যেন। হঠাৎ ইচ্ছে হলো সুইস আর্মি

নাইফটা হাতে নেয়। লেদার কেসের বোতামে আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে তার, বিড়ালের মত মিঁউ মিঁউ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, 'ওহ্ গড···ওহ্ জেসাস··· ওহ্ গড···ওহ্ জেসাস!'

তার ওপর ঝুলে থাকল ওটা, গায়ে হড়হড় করে পানি ঢালছে। ওটার প্রতিটি বৃত্ত কোঁচকাচ্ছে আর মোচড় খাচ্ছে, যেন প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর হয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। প্রতিটি বৃত্তের মাঝখানে একটা করে বাঁকা হুক, চাঁদের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হলো দেখতে অনেকটা ছোট তরবারির মত।

ব্যথার কথা বাদ দিলে, আর কিছু জানতে পারল না বিলি ম্যাক।

দুই

প্রথম দিন দেখেই লোকটা সম্পর্কে কৌতূহল জাগল মাসুদ রানার। সঙ্গের মেয়েটিও নজর কাড়ল, এমনকি একটা শিহরণও বয়ে গেল শরীরে, তবে চোখ রাঙিয়ে দমিয়ে রাখল নিজেকে—'অ্যাই, খবরদার, পরস্ত্রীর দিকে তাকাবে না!'

মানুষ নয়, একটা দৈত্য বললেই হয়। ছ'ফুট চার, নাকি পাঁচ? রানা আন্দাজ করল, পাঁচই হবে। ওজন? দুশো পঁচিশ বা ত্রিশ পাউণ্ড, কিন্তু এক গ্রাম চর্বি নেই শরীরে। বারমুডায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির লোকজন এসে বসতি গেড়েছে, লোকটাকে দেখে মনে হতে পারে

তাদের সবারই প্রতিনিধিত্ব করছে সে। গায়ের রঙ রেড ইণ্ডিয়ানদের মত লালচে, আঠারো শতকে টোরিরা মোহাক ইণ্ডিয়ানদের ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে এসেছিল দ্বীপটায়। মাথায় কোঁকড়ানো কালো ছোট ছোট চুল, আফ্রিকার হাবশি বা কাফ্রি ক্রীতদাসদের কথা মনে করিয়ে দেয়। চোখের রঙ ইংরেজদের মত নীল, তবে এশিয়ানদের মত বাদাম আকৃতির। চেহারা আর আচরণে মৌন ও হাল ছাড়ার ভাবটুকু সম্ভবত পর্তুগীজদের কাছ থেকে পেয়েছে সে।

খালি গা, লম্বা লম্বা কালো লোমে পুরো শরীর ঢাকা, বনমানুষ বললেই হয়। খাকি শর্টস পরে আছে, শরীরের তুলনায় এত ছোট, অশ্লীলই বলা যায়। দৃশ্যটা যে কোন লোককে হাসাবে—এই রকম একটা দৈত্যকে লম্বা ঢ্যাঙা এক তরুণী, পরনে জিনস আর সাদা শার্ট, কখনও ঠেলে আবার কখনও ধাক্কা দিয়ে সৈকতের ওপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

খালি গায়ে, শুধু শর্টস পরে, সৈকতে বসে রোদ পোহাচ্ছিল রানা। দূর থেকে দেখতে পেল ওদেরকে। ওর দিকেই এগিয়ে আসছিল দু'জন। লোকটাকে তখন পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল মেয়েটা। প্রতিবার ধাক্কা খেয়ে দু'এক পা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগোয় লোকটা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে আবার ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত। এভাবে রানার সামনে চলে এল তারা। এরপর আর ধাক্কা খেয়েও নড়ে না সে। মেয়েটার অসহায় অবস্থা লক্ষ করে হাসিই পেল রানার। হাতব্যাগটা বগলে চেপে ধরে পিছিয়ে যাচ্ছে সে, ছুটে এসে লোকটার পিঠে দু'হাত দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারছে, কিন্তু এক চুল নড়াতে পারছে না। প্রতিবার ধাক্কা মারার সময় বগলের নিচে থেকে বালির ওপর পড়ে যাচ্ছে হাতব্যাগটা। মেয়েটা এক মুহূর্ত চুপ করে নেই, সারাক্ষণ গাল-মন্দ করছে, তবে লক্ষ করার বিষয় হলো তার বকাঝকার মধ্যে সবটুকুই আদর আর অভিমান, বাকি যা আছে

সবই কৃত্রিম।

'এমন গোঁয়ার-গোবিন্দ লোককে নিয়ে পারে কেউ!' চিৎকার করছে মেয়েটা। 'সবাইকে চিন্তায় ফেলে দিয়ে আজ তিন দিন উনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন! হাঁটার জায়গা নেই, তাই তুমি পা কেটে ফেলবে? বুঝলাম, পানিতে মাছ কমে গেছে, কিন্তু তাই বলে জেলে তার জাল ছিঁড়ে ফেলবে? চলো, বাড়ি চলো, তারপর দেখব কিভাবে তোমার মাথা থেকে ভূত নামাতে হয়!'

এবার আর ধাক্কাধাক্কি নয়, শুরু হলো টানাটানি। দৈত্যের একটা হাত ধরে রূপসী তরুণী বাড়ি ফিরছে। কত বয়েস হবে লোকটার, বালির ওপর পাশ ফিরে ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবল রানা। খুব বেশি হলে ত্রিশ-বত্রিশ। আর মেয়েটার? বাইশ? নাকি পঁচিশ? কাপড়চোপড়, হাতব্যাগ ইত্যাদি দেখে বোঝাই যায়, কোন হোটেল বা অফিসে চাকরি করে মেয়েটা। আর লোকটা বোধহয় মাছ ধরে। উঁহুঁ, মেলে না, অন্তত স্বামী-স্ত্রী বলে মনে হয় না। কে জানে, হয়তো ভাই-বোন।

সেদিনই সন্ধের আগে হোটেলে ফেরার পথে লোকটাকে একটা বাড়ির বারান্দায় আবার দেখতে পেল রানা। এবার তার সঙ্গে অন্য একটা মেয়ে রয়েছে। সে-ও বেশ সুন্দরী, তবে পরনে ঘরোয়া পোশাক, স্কার্ট আর ব্লাউজ। লোকটা বসে আছে চেয়ারে, পিছনে দাঁড়িয়ে মেয়েটা তার মাথায় কি যেন ঘষে দিচ্ছে, সম্ভবত তেল। চোখ বুজে ঢুলছে লোকটা, ভাব দেখে বোঝা গেল ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। ভাগ্যবান, সন্দেহ নেই। গোঁয়ার-গোবিন্দ যাই বলা হোক, মেয়েরা তাকে পছন্দ করে।

দু'দিন পর খুব ভোরে, তখনও সূর্য ওঠেনি, সৈকতে হাঁটতে এসে ওদের তিনজনকেই একসঙ্গে পেয়ে গেল রানা। লোকটা বসেছে

মাঝখানে, তার দু'পাশে মেয়ে দুটো। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে কয়েক পা এগিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল রানা, বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা আলাপ শুনতে পেল পরিষ্কার। বোঝা গেল, বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে মেয়েটা মাথায় তেল ঘষে দিচ্ছিল সে-ই আসলে দৈত্যের স্ত্রী, প্রথম মেয়েটা তার শ্যালিকা। রানার ধারণাই ঠিক, প্রথম মেয়েটি একটা হোটেলে চাকরি করে, রিসেপশনিস্ট। দুই বোন দৈত্যকে বোঝাচ্ছে, সাগরে মাছ কম থাকলেও মাছ ধরার সরঞ্জাম বিক্রি করে ফেলা কোন কাজের কথা নয়। গোটা বারমুডায় তারটার মত মজবুত আর বড় বোট আর কারও নেই, কাজেই সেটাও তার হাতছাড়া করা চলবে না। মাছ ধরা তার পারিবারিক পেশা, সেটা না ছেড়েও রোজগার বাড়াবার অন্য ব্যবস্থা করা যায়। যেমন, স্কুবা ডাইভিং-এর শখ আছে এমন ট্যুরিস্ট খুঁজে বের করতে পারে সে।

বেলা একটু বাড়তে লোকটার পিছু নিয়ে তার বোটটা দেখে এল রানা। সত্যি খুব বড়, বারমুডায় এত বড় বোট আর দেখেনি ও। মজবুত যে তাতেও কোন সন্দেহ নেই—সবগুলো প্লেট ইস্পাতের, বাল্কহেড আর ডেকও তাই। বারমুডার চারধারের পানিতে বাস্তব ও কাল্পনিক নানা রকম বিপদ ওত পেতে আছে, সাগরে নিরাপদ ও সচল একটা আশ্রয় পেতে হলে এই রকম একটা বোটই দরকার। এত বড় বোট, নিশ্চয়ই খুব বেশি ডিজেল খায়, মাছের অভাব থাকলে খরচ তো না পোষাবারই কথা। সে-কারণেই ওদের সংসারে অশান্তি দেখা দিয়েছে। ওদের আলাপ থেকেই জানা গেছে, বছরে পঁচিশ হাজার ডলার কামাতে না পারলে সংসার চালানো যাবে না, অথচ মাছ বিক্রি করে এখন যে আয় তাতে বছরে দশ হাজারের বেশি আসবে না। একটাই মেয়ে ওদের, বোর্ডিং স্কুলে থেকে লেখাপড়া করছে, রোজগার যদি এভাবে দিনে দিনে

কমে যেতে থাকে, বোর্ডিং স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে তাকে। গত ছ'মাসে গ্যাস আর বিদ্যুৎ বিল দিয়েছে দৈত্যের শালী, সে এমনকি পরবর্তী বীমার কিস্তিটাও দিতে চায়, কিন্তু দৈত্য আর শালীর এই সাহায্য নিতে রাজি নয়। সে বলছে, হয় বোট নাহয় বাড়ি, দু'টার একটা বিক্রি করে দিয়ে আমেরিকায় চলে যাবে, চেষ্টা করে দেখবে সেখানে কোন চাকরি-বাকরি পাওয়া যায় কিনা।

লোকটার সঙ্গে যেচে পড়ে আলাপ করল রানা। তার নাম ন্যাট বেল। একটু হয়তো গম্ভীর আর জেদি প্রকৃতির মানুষ, তবে অত্যন্ত সরল। স্ত্রীকে সে সাংঘাতিক ভালবাসে, আর শালীটাকে নিজের মেয়ের মত ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে, লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল একটা চাকরিও যোগাড় করে দিয়েছে।

দু'তিন দিনের আলাপেই দু'জনের সম্পর্কটা বন্ধুর মত হয়ে উঠল। সাগর, মাছ ধরা, বোট ইত্যাদি সম্পর্কে রানার আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা আছে শুনে ন্যাট বেলের চেহারা থেকে গাম্ভীর্য খসে পড়ল, মনে হলো এতদিন সে যেন একটা মুখোশ পরে ছিল। এমন অবস্থা হলো, রানাকে দেখতে পেলে হয়, ন্যাট বেল পাকা বেলের মত হাসিতে ফেটে পড়ে। সে একজন বারমুডিয়ান, অথচ রানা তাকে বারমুডার এমন সব গল্প শোনায়, মুগ্ধ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায়। মাছ নেই তো কি হয়েছে, সাগরে কি সম্পদের কোন অভাব আছে? সোনা আর রূপার মুদ্রার কথাই ধরো না, কত নেবে? এই বারমুডার জলসীমাতেই তো ডুবেছে অ্যাটোকা, সেন্ট্রাল আমেরিকা। বলা হয় শত শত মন সোনা আর রূপা ছিল ওগুলোয়, সবই কি গল্প? তারপর আছে ট্র্যাকার ট্রেজার, ফিশার ট্রেজার। সবাই জানে, বারমুডার কাছাকাছি এসে শত শত জাহাজ ডুবে গেছে, কিন্তু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে মাত্র দু'চারটে। আর শুধু ট্রেজারই

বা কেন, সাগরে হাজার রকম দুর্লভ সব প্রাণীও তো রয়েছে। বিশেষ করে গভীর পানিতে। এ-সব প্রাণী সম্পর্কে এখনও প্রায় কিছুই জানা যায়নি। কে জানে, ওগুলো হয়তো বায়োলজি থেকে শুরু করে ইভোলুশন পর্যন্ত মানুষের সমস্ত ধারণা পাল্টে দিতে পারে, যার ফলে হয়তো ক্যান্সার থেকে বাত পর্যন্ত অনেক রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন সূত্র বেরিয়ে আসবে।

এ-সব কথা শুনিয়ে ন্যাট বেলকে নিরুদ্বিগ্ন আর উৎসাহী করে তুলল রানা। সেই সঙ্গে তার সী কুইনকে ভাড়া নেয়ার একটা প্রস্তাবও দিল। বারমুডায় আসার পর থেকে এরকম একটা বোট মনে মনে খুঁজছিল ও, চওড়া আর অত্যন্ত শক্ত। ভাল আবহাওয়ায় সব বোটই নিরাপদ, কিন্তু বারমুডার পানিতে ভাসতে চাইলে খারাপ আবহাওয়ার কথা মনে রেখে বোট ভাড়া করতে হয়। সী কুইনকে ভাল করে দেখার পর রানার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, এই বোট কখনই ডুববে না। ভেতরে প্রচুর জায়গা, এক জোড়া করে কমপ্রেশর আর জেনারেটর আছে, র‍্যাকে জায়গা আছে বিশটা স্কুবা ট্যাংক রাখার। ঠিক হলো, প্রতি দিন দুশো ডলার করে পাবে বেল, ডিজেলের খরচ রানার, তবে মাছ বিক্রির টাকা থেকে অর্ধেক ভাগ পাবে সে, বিনিময়ে রানার সঙ্গে সারাদিন খাটবে।

প্রস্তাব শুনে খুশি হলো বেল, তবে বলল, 'আমার স্ত্রী আর শালীকে একটু জিজ্ঞেস করতে হবে। ওদেরকে না বলে কিছু করি না তো! বিকেলে তুমি আমার বাড়িতে চলে এসো, একসঙ্গে বসে চা খাওয়া যাবে।'

সে আজ দু'হপ্তা আগের কথা। এ ক'দিন রোজই সাগরে মাছ ধরেছে ওরা, মাঝে মধ্যে পানির তলায় নেমে গুপ্তধনের সন্ধানও করেছে। ইতিমধ্যে বেলের স্ত্রী এনা আর শালী মোনার সঙ্গেও বন্ধুত্ব

হয়ে গেছে রানার। বন্ধুত্ব বলাই ঠিক, কারণ রানাকে ওরা কেউই সাধারণ একজন ট্যুরিস্ট হিসেবে দেখছে না। ওকে এভাবে আপন করে নেয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে, তার মধ্যে একটা হলো ওর গায়ের রঙ। বারমুডায় ট্যুরিস্ট বলতে সাধারণত শ্বেতাঙ্গদেরই বোঝায়। রানার গায়ের রঙ কালো নয়, তবে ওকে শ্বেতাঙ্গ বলেও চালানো যাবে না। একই কথা খাটে ওদের তিনজন সম্পর্কে। আরেকটা কারণ হলো, রানার সঙ্গে পরিচয় হবার পর বেঁচে থাকার ও কাজ করার উৎসাহ ফিরে পেয়েছে বেল। সেজন্যে রানার প্রতি দুই বোনই কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ বেলের একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু টেডি ওয়াটারম্যানও। মুখে অবশ্য কেউই কিছু বলে না, তবে আচরণে সেটা প্রকাশ পায়। প্রথমে দুই বোনই জেদ ধরেছিল, ওদের বাড়িতে খালি ঘর পড়ে রয়েছে, হোটেল ছেড়ে উঠে আসুক রানা। কিন্তু রানা রাজি হয়নি। এরপর তারা জেদ ধরল, হোটেলে থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু তিন বেলা খেতে হবে ওদের সঙ্গে। ওদের জেদের কাছে হার মেনে শুধু সকালের নাস্তাটা খেতে রাজি হয়েছে রানা।

মোনা চাকরি করে হোটেল পিয়ারসন-এ। রানা উঠেছে গোল্ডেন ইন-এ। গোল্ডেন ইনকে পাশ কাটিয়ে পিয়ারসনে যেতে হয়। প্রথম দু'দিন রানার হোটেল কামরায় নাস্তা দিয়েই চলে গেছে মোনা। তারপর থেকে রানা লক্ষ করছে, হাতে একটু সময় নিয়ে আসে মেয়েটা, ওর নাস্তা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে। তার এই বসে থাকার সময়টা যত দিন যাচ্ছে ততই লম্বা হচ্ছে, গল্প আর আলাপের বিষয়ও পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করছে রানা। মনে মনে ঠিক করেছে, কাল থেকে খুব-ভোরে হোটেল ছাড়বে ও, নাস্তা খাবে বেলদের বাড়িতে, তারপর বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সাগরে। মোনা

সত্যি সুন্দরী, তার প্রতি আকর্ষণও বোধ করে ও, কিন্তু এবার ওর ছুটি মঞ্জুর করার সময় অফিস থেকে যে দুটো শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে তার একটা হলো, কোন মেয়ের সঙ্গে জড়াতে পারবে না রানা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই মাসুদ রানা। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা আর রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি তীব্র আকর্ষণই ওকে এই পেশায় টেনে এনেছে। দেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হলে তা বানচাল করার জন্যে ডাক পড়ে ওর। কোন অশুভ বা অপশক্তিকে দমন করতে ব্যর্থ হলে অনেক বন্ধু রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসও বিসিআই-এর সাহায্য চেয়ে পাঠায়, সে-সব কাজেও যেতে হয় রানাকে। এসপিওনাজ জগতের একটা বিস্ময় বলা হয় ওকে, তার কারণ ওর সাফল্যের ইতিহাস সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। যে-কোন স্পাই খুব বেশি হলে দু'পাঁচটা অ্যাসাইনমেন্টে সফল হতে পারে, তারপর তাকে ফিল্ড থেকে প্রত্যাহার করে না নিলে নির্ঘাৎ শত্রুর হাতে মারা পড়বে সে—বরাবর তাই ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু রানার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। একের পর এক অসংখ্য অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হচ্ছে ওকে, প্রতিবার মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসছে বহাল তবিয়তে। রহস্যটা কি? কেউ বলে, অসম্ভব সাহস, ক্ষুরধার বুদ্ধি আর অসীম ধৈর্য আছে বলেই এই বিপজ্জনক জগতে আজও টিকে আছে রানা। আবার কেউ বলে, যে-সব সাফল্য রানার বলে মনে করা হয় সেগুলোর সবই যে ওর সাফল্য তা সত্যি নয়। তাদের ধারণা, মাসুদ রানা একটা সাংকেতিক নাম মাত্র, এই নাম ধারণ করে বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করে বিভিন্ন এজেন্ট। আরও বলা হয়, মাসুদ রানা একজন হোক বা একাধিক, তার বা তাদের সাফল্যের রেকর্ড যেমন আছে তেমনি আছে ব্যর্থতার রেকর্ডও, তবে ব্যর্থতার

কাহিনীগুলো কোন দিন কোথাও প্রকাশ পায় না। একবার কেউ নাম করলে তার সম্পর্কে অসম্ভব সব কথা রটে যায়, কাজেই এ-সবে কান দেয় না রানা। ও ওর নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হলে বিসিআই-এর একদল ডাক্তার তো পরীক্ষা করেনই ওকে, বছর শেষেও আরেকবার পুরোপুরি চেক-আপ করা হয়। এবারের বাৎসরিক চেক-আপ করার পর বিসিআই ডাক্তারদের একটা বোর্ড একমত হয়ে রায় দিয়েছেন, তিন মাস ছুটি নিতে হবে রানাকে, ছুটিটা কাটাতে হবে একা, ভাল হয় কোন দ্বীপে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গেলে। দুটো অবশ্য পালনীয় শর্ত জুড়ে দেন তাঁরা। একটা হলো, নারী সঙ্গ পরিহার করে চলতে হবে। দ্বিতীয়টি, এই তিন মাস কোন অবস্থাতেই বিপদে জড়িয়ে পড়া চলবে না। শেষ শর্তটি জুড়ে দেয়ার পিছনে কারণ আছে। এর আগে দেখা গেছে, ছুটি কাটাতে গেলেও কিভাবে যেন একটা না একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে রানা, ফলে ছুটি আর ছুটি থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েই সময়টা পেরিয়ে যায়। ডাক্তারদের সুরে সুর মিলিয়ে ওর বস্ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানও ওকে সাবধান করে দিয়েছেন, এবার যেন সেরকম কিছু না ঘটে।

আজ থেকে তিন হপ্তা আগে প্লেন থেকে বারমুডায় নামার সময় শর্ত দুটোর কথা নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছে রানা। ওগুলো মেনে চলতে কোন অসুবিধেও হচ্ছে না ওর। পুরানো শত্রুরা সংখ্যায় ভারি হলেও, তাদের কাউকে আজ পর্যন্ত এখানে দেখেনি ও। বারমুডায় কেউ তাকে চেনে না। কোথাও কোন ষড়যন্ত্র বা অশুভ তৎপরতাও চোখে পড়েনি। অর্থাৎ বিপদে জড়িয়ে পড়ার কোন আশঙ্কা এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। আর নারী সঙ্গ এড়িয়ে যাবার ব্যাপারটা সহজই, যদি সুন্দরী কোন মেয়ে

পিছনে না লাগে। তবে রানা খুব সাবধান, আর সেজন্যেই রোজ সকাল বেলা ওর হোটেল রুমে মোনার আসাটা বন্ধ করতে চাইছে।

পরদিন সকাল সাতটায় নিজেই হাজির হলো রানা বেলদের বাড়িতে। ওকে দেখে কেউ যদি অবাক হয়ে থাকেও, মুখে কিছু বলল না। সবার নাস্তাই দেয়া হলো টেবিলে। রানা লক্ষ করল, কেউ দখল করে নেয়ার আগেই ওর পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল মোনা। খেতে বসে একটা অজুহাত দেখাল রানা। 'ভাবলাম অ্যাকুয়েরিয়াম ট্র্যাপগুলো আজ তুলব। অনেক দিন হলো ফেলে রাখা হয়েছে, কিছু যদি ধরা পড়ে থাকে মারা যেতে পারে বা হয়তো কিছুতে খেয়ে ফেলবে।' ফাঁদ পেতে গভীর জলের প্রাণী ধরার চেষ্টা করছে ওরা, এর মধ্যে বেশ কয়েকটা ধরেওছে। বারমুডায় একজন অ্যাকুয়েরিয়াম রিটেইনার আছে, গভীর জলের বিরল কোন মাছ বা প্রাণী ভাল দাম দিয়ে কিনে নেয়।

ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকাল বেল। 'ঠিক আছে।'

'কিছু টোপও সঙ্গে নাও,' বলল রানা। 'কাজে লাগতে পারে।'

কফি শেষ করে টুলশেডে চলে গেল বেল, ফ্রিজার থেকে কিছু ম্যাকরল্ মাছ বের করল, টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে।

সামনেই ডক, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সী কুইনে চড়ল রানা। বড় আকারের ডিজেল এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করছে। খানিক পর টিনশেড থেকে বেরিয়ে এসে বেলও চড়ল বোটে, সামনে আর পিছন থেকে তুলে ফেলল নোঙর। বোট ছেড়ে দিল রানা, ম্যানগ্রোভ বে থেকে ধীরগতিতে বেরিয়ে এল সী কুইন, বাঁক ঘুরে ব্লু কাট-এর দিকে যাচ্ছে।

উত্তর-পশ্চিমে অ্যাকুয়েরিয়াম লাইন সেট করেছে রানা, তীর থেকে

প্রায় ছয় মাইল দূরে, পাঁচশো ফ্যাদম পানির নিচে। দক্ষিণ তীরে হলে পাঁচশো ফ্যাদম আরও কাছাকাছি পেতে পারত ও,কারণ ওদিকে সৈকত থেকে এক-দুই মাইলের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে রীফ, শুরু হয়েছে গভীর পানি। কিন্তু অ্যাকুয়েরিয়াম রিটেইনার যে-সব প্রাণী পেতে চায় সেগুলো শুধু উত্তর-পশ্চিম প্রান্তেই বসবাস করে।

এই মুহূর্তে, রীফ ঘেঁষে এগোবার সময়, পানি প্রায় শান্ত হলেও খুদে ঢেউ থাকায় প্রতিফলিত রোদের আলো ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে না। স্বচ্ছ পানি, নিচে বিভিন্ন রঙের প্রবাল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ফলে মাথা উঁচু করে থাকা চূড়াগুলোকে এড়িয়ে যেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। রীফের কোন কোন ফাঁকে বালির মাঝখানে গভীর গর্ত চোখে পড়ছে, দেখামাত্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে রানার দৃষ্টি। পুরানো ডোবা জাহাজ এ-সব জায়গাতেই লুকিয়ে থাকে।

বারমুডা সম্পর্কে রানার জ্ঞানের বহর লক্ষ করে বেল ওকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে একের পর এক কঠিন সব প্রশ্ন করেছে। তার মধ্যে একটা ছিল, বারমুডা আগ্নেয়গিরিতে ধাক্কা খেয়ে প্রথম কোন জাহাজটা ডোবে?

সবিনয়ে জবাব দিয়েছে রানা, এ-প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই। তবে রানী এলিজাবেথ-এর যুগে অর্থাৎ পনেরোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে যে একটা জাহাজ ডুবেছিল, তার প্রমাণ আছে। ভার্জিন কুইনের আমলে এক দুর্ভাগা স্প্যানিয়ার্ড ছুটি কাটাতে এসে তার জাহাজ হারায়। প্রচুর সময় আর পরিশ্রম স্বীকার করে একটা পাথরের ওপর কয়েকটা হরফ খোদাই করেছিল সে—এফ. টি. ১৫৪৩। লেখাটা এখনও পড়া যায়।

জাহাজের জন্যে বারমুডা চিরকালই একটা ফাঁদ ছিল, আজও তাই আছে। আরডিএফ, লরান বা স্যাটেলাইট নেভিগেশন আধুনিক যুগের

পরস্পরকেও খেয়ে ফেলে। ভুরুতে জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলিয়ে শিকার করতে বেরোয়, এমন সব মাছ। আরও কত কি।

আজকাল বারমুডা শিপ ট্র্যাপে বছরে একটা কি দুটো জাহাজ আটকা পড়ে। সাধারণত লাইবেরিয়া বা পানামায় রেজিস্ট্রি করা একটা ট্যাংকার, নরফোক থেকে রওনা হয়ে কোর্স সেট করল স্ট্রেইট অব জিব্রালটার অভিমুখে। ক্যাপটেন একজন তাইওয়ানিজ, এক বর্ণ ইংরেজি বোঝে না। কোর্স সেট করার পর জাহাজের দায়িত্ব অটোমেটিক পাইলটকে দিয়ে চা খেতে বা গা ডলাতে ব্রিজ থেকে নিচে নেমে এল। খেয়াল করল না যে তার চার্টে, নর্থ ক্যারোলিনার প্রায় ছ'শো মাইল পুবে, একটা ব্লিপ দেখা যাচ্ছে। দুই রাত পর হঠাৎ করে এয়ারওয়েভ ভরাট হয়ে গেল এস. ও. এস. সংকেতে। মাঝে মধ্যে বারমুডার সৈকতের কাছাকাছি যে-সব জেলেরা বাস করে তারা দরজা খুলে বারান্দায় বেরুলেই উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিমে অচল একটা জাহাজের আলো দেখতে পায়। তখন তারা মনে মনে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর, জাহাজটা যেন তেলে ভরা না হয়। আর যদি তেল নিয়ে এসে থাকে, খোলে যেন কোন ফুটো তৈরি না হয়।

আগেকার দিনে রীফে এত বেশি জাহাজ আটকা পড়ত যে বারমুডার বহু মানুষ অচল জাহাজ লুট করাটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে বসে। ব্যাপারটা প্রায় ইণ্ডাস্ট্রি হয়ে ওঠে। কেউ কেউ এমন কি জাহাজ কবে আটকা পড়বে তার জন্যে অপেক্ষায় থাকতে রাজি ছিল না, আলোর সাহায্যে ভুল সংকেত দিয়ে বিদেশী জাহাজগুলোকে রীফের ফাঁদে টেনে আনত।

রানার সঙ্গে বেলও একমত, অদ্ভুত প্রহসনই বলতে হবে যে নাবিকরাই বারমুডাকে শিপ ট্র্যাপ বানিয়েছে। বারমুডাকে তারা এড়িয়ে

জাদু, কিন্তু বারমুডায় ও-সব কোন কাজে আসে না। কারণ, মৃত হলেও এখানকার আগ্নেয়গিরি সাগরের তলা থেকে মাথাচড়া দিয়ে আছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিশৃংখলায় পরিপূর্ণ জাদুর একটা কাঠির মত। মেশিন, ইলেকট্রনিক, ম্যাগনেটিক, সমস্ত কিছু বারমুডায় এসে বেদখল হয়ে যায়, শুরু করে উন্মত্ত আচরণ। কোন কিছুই আর ঠিকমত কাজ করে না। মাতালের মত আগুপিছু ছুটোছুটি করে কম্পাসের কাঁটা।

বারমুডা আগ্নেয়গিরির এই অদ্ভুত খেয়ালই বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গল কিংবদন্তীকে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। তিলকে তাল করা মানুষের স্বভাব, বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গল রহস্যের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে ইউএফও থেকে শুরু করে আটলান্টিস, এমনকি মাটির গভীরে বসবাসকারী সর্বভুক দানবকেও।

বেলকে রানা বলেছে, বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গল নিয়ে মানুষের এই যে মাতামাতি, এ সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ। দুঃখ এই যে অস্তিত্ব আছে এমন সব বিস্ময় সম্পর্কে মানুষ জানতে চেষ্টা করে না, তা করলে দানব বা ড্রাগন সম্পর্কে মানুষের মনে যে কৌতূহল আছে তার অনেকটাই মিটত। পৃথিবীর সত্তর ভাগ পানি, আর সেই সত্তর ভাগের নব্বুই ভাগেই কেউ এখনও পৌঁছুতে পারেনি। পেশাদার নাবিক বা সমুদ্র-বিজ্ঞানী না হওয়া সত্ত্বেও, পনেরো-বিশ বছর ধরে পানির জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল থাকার কারণে, অন্তত এটুকু রানা জানতে পেরেছে যে সাগরের গভীরে এমন সব দানব লুকিয়ে আছে, গোটা মানবজাতিকে আতঙ্কিত করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। ত্রিশ ফুট লম্বা হাঙর, বসবাস করে কাদার ভেতর। মোটর গাড়ির মত বড় আকারের কাঁকড়া। ফিন বিহিন মাছ, মুখ আর মাথা ঠিক যেন একটা ঘোড়ার। সর্বভুক ভাইপার ঈল, এমন কি

যেতে পারে, কিন্তু মুশকিল হলো, এই দ্বীপটাকে তাদের দরকার হয়।

সতেরোশো আশি সাল পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য লংগিচিউডিনাল নেভিগেশন বলে কিছু ছিল না। দিগন্তরেখা থেকে সূর্যের কৌণিক দূরত্ব লক্ষ করে ল্যাটিচিউড নির্ধারণ করত নাবিকরা। অথচ অক্ষরেখার পুব-পশ্চিমের ঠিক কোথায় তারা রয়েছে তা নিখুঁত ভাবে জানতে হলে একটা ক্রোনোমিটার অবশ্যই দরকার। কিন্তু তা তাদের ছিল না।

সমুদ্রের বুকে বারমুডা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু, একবার ওটাকে দেখতে পেলে নাবিকরা জানতে পারত ঠিক কোথায় তারা রয়েছে। কাজেই ইস্ট ইণ্ডিজ বা হাভানা থেকে রওনা হয়ে উত্তরে গালফ স্ট্রীমে আসত তারা, তারপর উত্তর-পুবে ঘুরে যেত, যতক্ষণ না বত্রিশ ডিগ্রী উত্তর ল্যাটিচিউডে পৌঁছায়। এরপর তারা পুব দিকে ঘুরে বারমুডার খোঁজ করবে। কিন্তু যদি ঝড়ের মধ্যে পড়ে, প্রবল বাতাস আর প্রকাণ্ড ঢেউয়ের কারণে অথবা কুয়াশা থাকায় সামনে কি আছে দেখতে না পায়, তাহলে কি হবে? বারমুডাকে অবশ্যই তারা দেখতে পায়, তবে দ্বীপটার সঙ্গে ধাক্কা খাবার পর।

আজ অবশ্য অগভীর পানিতে ওরা কোন বিধ্বস্ত জাহাজ দেখতে পেল না। তবে যা দেখল, অন্তত বেলের মন খারাপ হবার জন্যে যথেষ্ট। একটা প্যারট ফিশ; সরু সুচের মত একটা গারফিশ, পানির ওপর লেজ তুলে রেখেছে; পাঁচ-ছ'টা ফ্লাইং ফিশ, বোটের বো দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল; আর অল্প কয়েকটা ঢেউ খেলানো ব্রীম মাছ, গায়ে রূপালি আঁশ।

এদিকের রীফে এক সময় এত বেশি মাছ থাকত যে নিচের বালি প্রায় দেখাই যেত না। এখন জায়গাটাকে বোমা বিস্ফোরণের পর পরিত্যক্ত রেলওয়ে স্টেশনের মত লাগে।

সাগরের অগভীর তল ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। চল্লিশ ফুট, ষাট ফুট, একশো ফুট—গভীরতা বাড়ছে। এক সময় সাগরের তলা থেকে চোখ তুলে নিজেদের বয়া খুঁজতে শুরু করল রানা।

বয়াটা যেখানে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেখানেই রয়েছে দেখে একটু অবাক হলো ও। কেউ কারও জিনিস ছোঁবে না, বেপরোয়া ফিশারম্যানরা অনেক দিন হলো এই নীতি বিসর্জন দিয়েছে। তাছাড়া, মানুষ যদি না-ও ছোঁয়, টোপগুলো এত গভীরে ফেলা হয়েছে যে অতলতলের দৈত্যকার প্রাণীদের ওগুলো নিয়ে ছুট দেয়ার কথা। মাছ কমে গেলেও, ছয় ফুলকাঅলা হাঙর বা বিশাল-চক্ষু থ্রেশার অর্থাৎ শেয়ালমুখো হাঙরের কোন অভাব নেই। ট্র্যাপগুলো সাধারণত কয়েক মাইল দূরে টেনে নিয়ে যায় ওগুলো, তারপর ছাড়াতে পারে নিজেদের।

'কাছে চলে আসছে বয়া,' বেলকে বলল রানা। স্টার্ন-এ, একটা হ্যাচ কাভারের ওপর বসে রয়েছে বেল, কোলে অকেজো একটা পাম্প মোটর। মোটরটা নামিয়ে রেখে বোট হুকের দিকে হাত বাড়াল সে।

বোটের গা ঘেঁষে এগিয়ে এল হলুদ আর কমলা রঙের বয়া, স্টার্ন-এ পৌঁছুতে খপ্ করে সেটাকে ধরে তুলে ফেলল বেল, সামনের দিকে হেঁটে এসে রশিটা জড়িয়ে বাঁধল উইঞ্চের সঙ্গে।

এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, শান্ত পানিতে অল্প অল্প দুলছে বোট, তারপর নেমে এল ফ্লাইং ব্রিজ থেকে।

'নাও, শুরু করো,' বলল বেল।

লিভার ঠেলে উইঞ্চ চালু করল রানা। ওপরে উঠে আসতে শুরু করল রশি, বেলের সাহায্যে পঞ্চান্ন গ্যালনের একটা প্লাস্টিক ড্রামে ঠাঁই পাচ্ছে।

পানিতে তিন হাজার ফুট পলিথিন রোপ ফেলেছে ওরা; ভাসিয়ে

রাখার জন্যে মাথায় ছিল বয়া, আর নিচে ধরে রাখার জন্যে সঙ্গে আছে পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের স্যাশ ওয়েট। শুরু হয়েছে দু'হাজার ফুট নিচে থেকে, প্রতি একশো ফুট বাদ দিয়ে এক প্রস্থ বিশ ফুট লম্বা স্টেনলেস-স্টীল এয়ারপ্লেন কেবল জুড়ে দিয়েছে। আটচল্লিশটা ইস্পাতের তার পাকিয়ে তৈরি এই কেবল। প্রতি এক প্রস্থ কেবলের শেষ মাথায় রয়েছে অ্যাকুয়েরিয়াম-এর সরঞ্জাম। কোনটা তার দিয়ে বানানো ছোট বাক্স, কোনটা মিহি তার দিয়ে তৈরি জাল। প্রায় প্রতিটির ভেতর কিছু না কিছু টোপ আছে, অন্ধকার জগতে বসবাসকারী প্রাণীদের আকর্ষণ করার জন্যে। এ-সব প্রাণী কেমন দেখতে বা কি খেতে পছন্দ করে জানা নেই ওদের, কেউই তা জানে না। তবে রানা শুনেছে, টোপ যত বেশি দুর্গন্ধ ছড়াবে তত বেশি আকৃষ্ট হবে ওগুলো। কাজেই সবচেয়ে পচা মাছগুলোই টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে ওরা।

কয়েকটা ফাঁদে কোন টোপই দেয়া হয়নি, তার বদলে আছে শুধু কেমিকেল লাইট। ওদের ধারণা, ঘন কালো অন্ধকারের ভেতর আলো এমন একটা অভিনবত্ব সৃষ্টি করবে, কৌতূহলবশত দু'একটা প্রাণী ওটার কাছাকাছি না এসে পারবে না।

ওদের ইচ্ছা, প্রাণীগুলোকে জ্যান্ত তুলে এনে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কোল্ড-ওয়াটার ট্যাঙ্কে ফেলে দেয়া। প্রতি হপ্তায় অ্যাকুয়েরিয়াম থেকে একজন বিজ্ঞানী আসেন ওরা কি ধরেছে পরীক্ষা করার জন্যে, অচেনা বা বিরল প্রজাতির কোন প্রাণী পেলে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যান তিনি। রানা হিসেব করে দেখেছে, অ্যাকুয়েরিয়ামে পাঠাবার জন্যে শতকরা বিশ ভাগ প্রাণী বাঁচে। সংখ্যাটা খুশি হবার মত নয়, তবে ওগুলোর বিনিময়ে যে টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে ডিজেলের খরচটা ওঠে। অ্যাকুয়েরিয়ামের সঙ্গে চুক্তিটা অবশ্য বেলকে দিয়ে সই করিয়েছে

রানা। ও বারমুডা ছেড়ে চলে যাবার পরও কাজটা তার থাকবে।

লিভার ধরে আছে রানা, রশির ওপর চোখ। টান টান হয়ে আছে ওটা, পানি ছিটাচ্ছে। নিজেকে স্থির রাখার জন্যে বুলওঅর্ক-এ পা বাধাল ও, তারপর ঝুঁকে বোটের বাইরে তাকাল, পানিতে চোখ রেখে আশা করছে বড় কোন মাছ দেখতে পাবে।

দূর, কোথায়!

'কি যেন একটা গোলমাল আছে,' বলল বেল। এক হাত দিয়ে রশি ছুঁয়ে আছে সে, আঙুলের ডগা দিয়ে টানটান ভাবটা অনুভব করছে।

'কি গোলমাল?'

'কেমন যেন কাঁপছে। ধরে দেখো।' রানার হাতে রশিটা ধরিয়ে দিয়ে, ওর হাত থেকে উইঞ্চ লিভারটা নিজের মুঠোয় নিল সে।

রশিটা ধরল রানা। সত্যি কাঁপছে, কেমন এলোমেলো ভঙ্গিতে।

প্রতি একশো ফ্যাদমে একটা করে চিহ্ন দেয়া আছে। তিনটে চিহ্ন উঠে আসার পর একটা হাত তুলে উইঞ্চের গতি কমাবার ইঙ্গিত দিল রানা। তারপর ঝুঁকে নিচে তাকাল প্রথম ফাঁদটা দেখার জন্যে। ওটা যদি রশির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে থাকে, বোটের গায়ে ধাক্কা খাবার আগেই সাবধান হতে চায়। গভীর জলের কোন কোন প্রাণী এত বেশি স্পর্শকাতর যে জোরে একটু ঝাঁকি খেলেও বাঁচে না।

স্টেনলেস স্টীল-এর প্রথম আঙটা দেখতে পেল রানা, প্রথম প্রস্থ কেবলটাকে আটকে রেখেছে, তারপর কেবলটাও দেখতে পেল। কিন্তু এরপর··· কিছু নেই।

ট্র্যাপটা গায়েব হয়ে গেছে।

অসম্ভব। ফাঁদটাকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবার মত বড় প্রাণী একটাই আছে, হাঙর; কিন্তু হাঙরকে আকর্ষণ করার মত কিছুই ওটায় ছিল না।

তাছাড়া, কোন হাঙর যদি কামড় দিয়ে নিয়েই যায়, সবটুকু নিয়ে যাবে, রশি সহ। একটা হাঙরের পক্ষে এই কেবল ভাঙা সম্ভবও তো নয়।

উইঞ্চ ঘুরছে, কেবলটাকে নাগালের মধ্যে উঠে আসতে দিল রানা। রশি থেকে খুলে ভাল করে শেষ্র মাথাটা পরীক্ষা করল। তারপর বেলকে দেখাল।

'ছিঁড়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল বেল।

'না। তা গেলে তারগুলো এলোমেলোভাবে ছিঁড়বে। প্রতিটি আলাদা তার লক্ষ করো, একেবারে নতুন লাগছে।'

'তাহলে?'

কেবলের শেষ মাথাটা আরও কয়েক সেকেণ্ড পরীক্ষা করল রানা। নিখুঁতভাবে কেটে নেয়া হয়েছে, যেন অসম্ভব ধারাল কোন অস্ত্র দিয়ে। কেবলের আর কোথাও কোন দাগ নেই। 'কেটে নেয়া হয়েছে,' বলল ও। 'কামড়ে।'

'কামড়ে?'

ঝুঁকে পানির দিকে তাকাল রানা। 'কি হতে পারে, স্টেনলেস স্টীলের আটচল্লিশটা তার এক কামড়ে কেটে নিতে পারে?'

বেল কিছু বলল না। ইঙ্গিতে তাকে আবার উইঞ্চ স্টার্ট দিতে বলল রানা। একটু পরই দ্বিতীয় কেবলটা উঠে এল।

'নেই!' বলল রানা। দ্বিতীয় ফাঁদটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে, কামড়ে কেটে নেয়া হয়েছে দ্বিতীয় কেবলটাও।

'নেই!' পরবর্তী কেবল ওপরে উঠে আসতে আবার বলল রানা। কেবলগুলো একের পর এক উঠে আসছে, সেই সঙ্গে রানার মুখ থেকেও ওই একটা মাত্র শব্দ বেরুচ্ছে, 'নেই।' কোন ফাঁদই নেই, প্রতিটি কেবল কাটা।

এবার দেখা গেল স্যাশ ওয়েট উঠে আসছে। কি যেন একটা অসঙ্গতি লক্ষ করে বেলকে উইঞ্চ থামাতে বলল রানা। রশির শেষ অংশটুকু হাত দিয়ে টেনে তুলল।

'ও খোদা!' আঁতকে মত উঠল রানা। 'বেল, দেখো!'

একটা ট্র্যাপ ওয়েটগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, এমন শক্তভাবে গাঁথা যে দেখে মনে হবে সবগুলো একসঙ্গে ফারনেসের আগুনে ফেলে গলানো হয়েছিল। জিনিসটা তুলে ডেকের ওপর রাখল ওরা—ইস্পাতের রড, তার আর সীসা মিলে তৈরি অদ্ভুত একটা আকৃতি।

সেটার দিকে ঝাড়া বিশ সেকেণ্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকার পর বেল বলল, 'রানা, আমরা কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? জেসাস! কোন শালা এরকম একটা কাণ্ড করতে পারে?'

'কোন মানুষের কাজ নয়,' বলল রানা। 'কোন প্রাণীর কাজও.... না, কোন প্রাণীর কাজও হতে পারে না। অন্তত আমি চিনি, এমন কোন প্রাণীর পক্ষে এ-কাজ সম্ভব নয়।'

তিন

রিগটা খুলে কেবলের প্রতিটি প্রস্থ কুণ্ডলী পাকাল ওরা, অবশিষ্ট রশি প্লাস্টিক ড্রামে রাখল। কেউ কোন কথা বলছে না, চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছে। যে-সব প্রাণী চেনে রানা, এক এক করে সবগুলোর কথা

বিবেচনা করছে মনে মনে। কিন্তু না, সেগুলোর একটাও এই কেবল কাটতে পারবে না। তাহলে কি বেলের ধারণাই ঠিক? কোন মানুষের কাজ? আক্রোশ বা ঈর্ষাবশত ওদের ক্ষতি করার ইচ্ছে থেকে কাজটা করেছে? কিন্তু মাছের এই আকালের দিনে কে ওদেরকে ঈর্ষা করবে? উঁহুঁ, না, এমন কি কোন মানুষের পক্ষেও কাজটা সহজ নয়।

তাহলে? আটচল্লিশটা তার দিয়ে বানানো কেবল কে কাটল?

প্রকৃতির যে একটা অস্পষ্ট দিক আছে, রানা জানে। বছর পাঁচেক আগের কথা, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছাকাছি একটা ট্যাঙ্কারে ছিল ও। শান্ত সাগর, চমৎকার আবহাওয়া। হঠাৎ করে কোত্থেকে কে জানে সগর্জনে ছুটে এল একশো ফুট উঁচু একটা ঢেউ, জাহাজের সামনে পানির একটা পাঁচিল খাড়া হয়ে গেল। এরকম আগে কখনও ঘটতে দেখেনি ক্যাপটেন, জাহাজে যারা ছিল তাদের কাছেও এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। কি করা উচিত বুঝতে না পেরে পানির পাঁচিলের দিকে সরাসরি এগোয় তারা, ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তলিয়ে যায় জাহাজ। তিন মিনিট আগে কি একটা কাজে ক্রো-নেস্টে উঠেছিল রানা, তা না উঠলে বাকি সবার সঙ্গে ওকেও সেদিন জাহাজের সঙ্গে ডুবে মরতে হত। জাহাজ থেকে ঢেউটা ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, একটা হ্যাচ কাভারে বসে কাটিয়ে দেয় দুটো দিন, তারপর একটা জাহাজ ওকে উদ্ধার করে।

আরেকটা ঘটনা শুনেছিল এক বন্ধুর মুখে। অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি পৌঁছুবার পর ওদের জাহাজে প্লেগ দেখা দেয়। তিনজন বন্ধুকে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে বোট নিয়ে সাগরে ভাসে সে। ছোট একটা দ্বীপে আশ্রয় নেয়। ওখানে ছুটি কাটাতে আসা একটা পরিবারকে দেখতে পায় ওরা, জঙ্গলের ভেতর তাঁবু ফেলেছে। এক বিকেলে পরিবারটির সঙ্গে দেখা করতে এল ওরা, দেখল সবাই মারা গেছে। মারা গেছে টাইপান-এর

কামড়ে। টাইপান এমন একটা সাপ, কোন কারণ ছাড়াই কামড়ায়, খুন করার জন্যেই খুন করে।

ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে রানা, প্রকৃতিকে সব সময় বিশ্বাস করা যায় না; মাঝে মধ্যে সে তার অশুভ ভীতিকর দিকটা মেলে ধরে। কাজেই সাবধান ও সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। ভয় পাওয়া কোন কাজের কথা নয়, এ-ধরনের বিপদে বুকে সাহস রাখতে হয়।

কিন্তু বেলের ব্যাপারটা আলাদা। অচেনা অজানা রহস্যকে ভয় পায় সে। কোন প্রশ্নের উত্তর নিজে যদি না পায়, প্রসঙ্গটা ভুলে থাকার চেষ্টা করে; কিন্তু উত্তরটা রানার বা আর কারও জানা না থাকলে ঘাবড়ে যায়।

সে যে এখন উদ্বিগ্ন, তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় লক্ষণ, রানার দিকে তাকাচ্ছে না। খুব যত্ন করে কেবলগুলো কুণ্ডলী পাকাচ্ছে সে। রানা উপলব্ধি করল, লোকটার উদ্বেগ দূর করা দরকার। 'আমার বোধহয় ভুল হয়েছে,' বলল ও। 'ওটা একটা হাঙরই হবে।'

'কেন, হাঙর মনে হচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করল বেল।

'হাঙর হতে বাধ্য। এইমাত্র ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির একটা লেখার কথা মনে পড়ে গেল। এক ধরনের হাঙর আছে, তার কামড়ে প্রতি এক বর্গ ইঞ্চিতে বিশ টন চাপ সৃষ্টি হয়। কেবলগুলো কাটার জন্যে ওই চাপ যথেষ্ট।'

'কাটল, কিন্তু তারপর ওগুলো নিয়ে যায়নি কেন?'

'নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওগুলোয় কোন হুক ছিল না। ওগুলোকে ঘিরে বারবার চক্কর দিয়েছে, একটা একটা করে কেটেছে।' বলছে বটে, তবে নিজে রানা একবিন্দু বিশ্বাস করছে না এসব কথা।

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল বেল, তারপর বলল, 'ও!'

বেলকে কথা বলাবার চেষ্টা করল রানা। কথা বললে প্রসঙ্গটা ভুলে থাকবে সে। কি নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে, জানা থাকায় কৌশলটা কাজে লাগল। প্রশ্ন করতেই শুরু করে দিল:

বারমুডায় প্রথম যখন মানুষ এল তখন শুধু পাখি আর শুয়োর ছিল। পাখিগুলো এত বোকা ছিল যে মানুষের মাথায় এসে বসত, অপেক্ষা করত কখন তাদেরকে ধরে জবাই করা হবে। পাখিই বারমুডার আদি বাসিন্দা। শুয়োর নয় ওগুলো ডুবন্ত জাহাজ থেকে সাঁতার কেটে তীরে এসে ওঠে, জীবন ধারণ করে পাখি আর ডিম খেয়ে।

তবে বারমুডার আসল সম্পদ ছিল চারধারের পানিতে। কাঁকড়া, হাঙর, তিমি আর কচ্ছপই শুধু নয়, বিরল প্রজাতির আরও অসংখ্য মাছ ও প্রাণী ছিল এখানে। কিন্তু সে-সব আজ রূপকথার মত শোনায়। কারণ মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সব মেরে সাফ করে ফেলেছে। বিশেষ করে গত বিশ বছরে আক্ষরিক অর্থেই বারমুডাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

সত্তরের দশকেও রীফ থেকে একবার ঘুরে এলেই রাতের খাবার যোগাড় করতে পারত বেল। প্রতিটি পাথরের নিচে ছিল লবস্টার, ঝাঁক ঝাঁক প্যারট্‌ফিশ, অ্যাঞ্জেলফিশ, টাইগারফিশ, সার্জেনফিশ, ড্যামসেলফিশ, হগফিশ, এমনকি মাঝে মধ্যে গ্রুপারও পাওয়া যেত। ডোবা জাহাজ থেকে কিছু আনতে গেলে দেখতে পেত তার পাশে বালির ভেতর ডেবে রয়েছে গোটফিশ, সাগরের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য স্টিং-রে। সব সময় ভয় লাগত, কখন না একটা র‍্যাস তার কানের লতি কামড়ে ধরে। একবার নয়, বহুবার তাকে ধাওয়া করেছে হাঙর, ফ্লিপারের ডগা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।

গভীর পানির ঠিক কিনারায় পাওয়া যেত নাসাউ গ্রুপার, স্পটেড গ্রুপার আর ব্ল্যাক গ্রুপার, মাঝে মধ্যে পাঁচশো থেকে ছয়শো পাউণ্ড ওজনের দু'একটা জিউফিশ। আরও ছিল মোরে ঈল, টাইগার শার্ক, বুল শার্ক, হাইণ্ড আর স্ন্যাপার। কচ্ছপগুলো এমন ভঙ্গিতে পানির ওপর মাথা তুলত, যেন বাচ্চা ছেলেরা সাঁতার কাটছে।

আর গভীর পানিতে? টোপ গেলার জন্যে ব্যারাকুডার সঙ্গে যুদ্ধ করত ওয়াহু। বোটের পিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াত বনিটোস আর অ্যালিসন টুনা। বিলফিশের ডরসাল ফিন পানি কাটত ঠিক একটা কাস্তের মত। ভাল একটা দিন মানে ছিল বোটে উঠত এক হাজার পাউণ্ড রকফিশ আর এক হাজার পাউণ্ড টুনা।

কিন্তু সে-সব দিন গত হয়েছে। কোন কোন হোটেলে এখনও বারমুডা ফিশ পরিবেশন করা হয় বটে, তবে বেশিরভাগই অখাদ্য। ও-সব মাছ আজও অস্তিত্ব রক্ষা করছে, কারণ ওগুলো কেউ চায় না। এখন যদি কোন ফিশারম্যান একটা গ্রুপার ধরে, কাগজে সেটা খবর হয়।

লোকে বলে পানি দূষিত হয়ে গেছে বলে মাছও শেষ হয়ে গেছে। রানার সঙ্গে বেল একমত, আসল কারণ তা নয়। মাছ শেষ হয়ে যাবার পিছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী ফিশারম্যানরা। তবে শুধু বারমুডার ফিশারম্যানরা নয়। বড় অর্থে, মানুষ। মানুষই নির্বংশ করছে মাছকে, তাদের ফিশ ট্র্যাপ দিয়ে।

আগেকার দিনে মানুষ মাছ ধরত হাত দিয়ে, হ্যাণ্ডলাইনের সাহায্যে। ক্লান্ত বোধ করলে, হাতে ফোস্কা পড়ে গেলে, ক্ষান্ত হত তারা। তারপর একজনের মাথায় ঢুকল, টোপ ভরে তারের খাঁচা নামাও পানিতে, ওপরে থাক বয়া। খাঁচার ভেতর মাছ ঢুকতে পারবে, কিন্তু বেরুতে পারবে না। ব্যস, শুরু হয়ে গেল, এরপর কেউ আর ফাঁদ ছাড়া

মাছ ধরে না। কেউ একবার ভেবে দেখল না যে এভাবে মাছ ধরা হলে সব শেষ হয়ে যাবে।

আর ধরাও পড়ল। শত শত টন মাছ, এত মাছ দিয়ে কি করবে মানুষ! দে ফেলে, ভালগুলো রেখে বাকি সব ফেলে দে। মরা হোক, মুমূর্ষু হোক, ছোট হোক, পোয়াতি হোক—ধর আর মার, ধর আর ফেল। কার কি আসে যায়!

মহৎ কোন উদ্দেশ্য থাকলে আলাদা কথা, তা না হলে ফাঁদ পেতে মাছ ধরার পক্ষপাতী নয় বেল। ফাঁদ পেতে মাছ ধরাকে ফিশিং বলে না, বলে কিলিং।

ফাঁদকে নিয়ে প্রথম সমস্যা হলো, ওটায় সব কিছু ধরা পড়ে—ছোট, বড়, পোয়াতি, বুড়ো। হ্যাণ্ডলাইনের সাহায্যে মাছ ধরলে ফিশারম্যান বাছাই করার সুযোগ পায়, যেটা তার প্রয়োজন নেই বা পছন্দ হচ্ছে না সেটাকে আবার পানিতে ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু ফাঁদে আটকা পড়া মাছ খাঁচার ভেতর কয়েক দিন বন্দী থাকে, ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ে, আহত হয়; বোটে তোলার পর বেশিরভাগই বাঁচে না। তবু যদি ওগুলোকে দেরি না করে পানিতে ছেড়ে দেয়া হত! কিন্তু তা কেউ দেয় না, নিষ্ঠুরের মত ফেলে রাখে বোটে। হাতের কাজ শেষ করে যখন ফেলে তখন আর ওগুলোর বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয় সমস্যা, হারানো ফাঁদ। কোন কারণে বয়া যদি ছিঁড়ে যায়, কিংবা যদি গভীর পানির কিনারা থেকে নিচে নেমে যায় ফাঁদ, কোন দিনই তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ ফাঁদে আটকা পড়ে মাছগুলো মরতেই থাকে। একবার আটকা পড়লে মাছ আর বেরুতে পারে না, মারা গিয়ে পচে যায়, পরিণত হয় টোপে, ফলে আরও মাছ ধরা পড়ে, এভাবে চিরকাল চলতে থাকবে।

রানার সঙ্গে গভীর পানির কিনারায় মাছ ধরতে এসে এরকম হারানো দু'একটা ফাঁদ খুঁজে পেয়েছে বেল, ভেতরে তিল ধারনের জায়গা নেই, জ্যান্ত আর মরা মাছে গিজগিজ করছে—ঈল থেকে শুরু করে প্যারটফিশ, অক্টোপাস থেকে শুরু করে কাঁকড়া, সব আছে। তার বন্ধু বিদেশী হলে কি হবে, স্থানীয় ফিশারম্যানদের মত পাষাণ নয়। গভীর পানিতে যখনই নামার সুযোগ হয়, হারানো ফাঁদ খুঁজে বের করে, খুলে দেয় খাঁচার দরজা।

তবে, উনিশ শো নব্বুই সালে বারমুডা সরকার ট্র্যাপ ফিশিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অনেকের মত বেলেরও ধারণা, ফাঁদ নিষিদ্ধ হবার পর আবার হয়তো বারমুডায় মাছ ফিরে আসবে। তবে রানার মনে সন্দেহ আছে। সন্দেহ আছে বেলের বন্ধু টেডি ওয়াটারম্যানেরও।

ওয়াটারম্যান ইউএস নেভী বেস-এ কাজ করে। পরিবেশ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে সে। বেলকে একটা রিপোর্ট দেখিয়ে বলেছে, বারমুডার চারপাশে পানির তাপমাত্রা গত বিশ বছরে দুই ডিগ্রী বেড়ে গেছে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে অ্যামাজন জঙ্গল কেটে সাফ করা আর অতিরিক্ত ফসিল ফুয়েল জ্বালাবার কারণে এটা ঘটেছে। আবার কেউ কেউ বলছে, এটা প্রকৃতির একটা নিজস্ব ছন্দের কারণে ঘটছে, যেমন বরফ যুগ আসে ও যায়। তার বন্ধু রানা বলেছে, ওর দেশেও নাকি ঠিক এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠে আসছে পানির স্তর। শুধু তাই নয়, বঙ্গোপসাগরেও মাছের আকাল শুরু হয়েছে। কারণটাও পরিষ্কার।

টোপ দিয়ে ডীপ লাইন সেট করতে এক ঘণ্টা লাগল ওদের। লাইনের শেষ মাথায় একটা রাবার বয়া আটকাল রানা, তারপর ফেলে দিল বোট থেকে। স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে ওটা, বাতাসের সঙ্গে

দক্ষিণ-পুব দিকে এগোচ্ছে বোট। একটা ঝুড়ি থেকে রুটি, মাখন, সেদ্ধ ডিম আর কোক বের করল বেল। নিজের ভাগটা আলাদা করে নিয়ে বোটের সামনে চলে গেল সে, খেতে খেতেই পাম্প মোটরটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল আবার।

খাওয়া শেষ করে হুইলহাউসে উঠে এল রানা, রেডিও অন করে আবহাওয়া বার্তা শুনল, তারপর কান পাতল কে কি ধরেছে জানার জন্য। একজন ক্যাপটেন রিপোর্ট করল, সে একটা হাঙর তুলেছে। চ্যালেঞ্জার ব্যাংক থেকে এক চার্টার বোটের আরেক লোক জানাল, কয়েকটা অ্যালিসন টুনা জুটেছে তার কপালে। বাকি কেউ কিছু পায়নি।

মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তে শুরু করেছে সূর্য, এই সময় লাইন টেনে তুলল ওরা। আটটা হুকে ধরা পড়েছে ছোট আকারের এক জোড়া লাল স্ন্যাপার। সেগুলো পানিতে ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল রানা, তারপর পানির দিকে। কোথাও কোন ফিন দেখা যাচ্ছে না, এমনকি আকাশে কোন ক্ষুধার্ত পাখিও নেই। ট্রাউজারে হাত মুছে বেলের দিকে তাকাল ও। 'চলো, ফেরা যাক।' কেবিনে ঢুকতে যাবে, ওকে বাধা দিল বেল।

'ওদিকে তাকাও।' দক্ষিণ দিকের আকাশে হাত তুলল সে।

ওদিক থেকে নেভীর একটা হেলিকপ্টার আসছে ওদের দিকে। 'এই সময় ওটা যাচ্ছে কোথায়?'

'কোথাও না। স্রেফ সময় কাটাচ্ছে।'

একটু পরই ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা। রানা ভাবল, হয়তো বেলের কথাই ঠিক। সার্চ-অ্যাণ্ড-রেসকিউ অপারেশন ছাড়া নেভী পাইলটদের কোন কাজ নেই বারমুডায়। যদিও এই পাইলট অলস সময় কাটাচ্ছে বলে মনে হলো না। কারণ হেলিকপ্টারটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে

সোজা উত্তর দিকে যাচ্ছে। হুইলহাউসে ঢুকে রেডিও অন করল রানা। 'ড্রাগন ওয়ান…ড্রাগন ওয়ান…ড্রাগন ওয়ান…দিস ইজ সী কুইন… কাম ব্যাক…।'

লেফটেন্যান্ট টেডি ওয়াটারম্যানকে ডেকে অপারেশনস অফিসার জানাল, মায়ামি যাবার পথে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর এক পাইলট বারমুডার বিশ মাইল উত্তর থেকে একটা ইমার্জেন্সী কল শুনতে পেয়েছে।

পাইলট কিছু দেখতে পায়নি, কারণ ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল গতিতে ছুটছিল তার প্লেন, সাগর থেকে ছ'মাইল ওপর দিয়ে। তবে তার ভিএইচএফ রেডিওতে সিগন্যালটা পরিষ্কার ধরা পড়েছে। সন্দেহ নেই, কেউ ওখানে বিপদে পড়েছে।

বারমুডা ন্যাভাল এয়ার স্টেশনের টাওয়ার থেকে মায়ামি, আটলান্টা, ডারহাম, বাল্টিমোর ও নিউ ইয়র্কের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, জানতে চাওয়া হয় কোন প্লেন পৌঁছুতে দেরি করছে কিনা। তারপর যোগাযোগ করা হয় বারমুডা হারবার রেডিওর সঙ্গে, কোন জাহাজ বা বোট নিখোঁজ কিনা জানার জন্যে। কেউ কিছু বলতে পারেনি। তবে ন্যাভাল এয়ার স্টেশন চুপ করে থাকতে পারে না, বিপদ-সঙ্কেত পেলে তৎপর তাদের হতেই হবে।

বিশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আকাশে উঠে এসেছে ওয়াটারম্যান, আজ অনেক দিন পর নিজেকে তার একজন জ্যান্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছে। বারমুডায় কিছু ঘটছে না, জীবনটা একেবারে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। হোক ইমার্জেন্সী কল, তবু তো একটা কাজ পাওয়া গেল। সত্যি হয়তো পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে কেউ।

ওয়াটারম্যানের সমস্যা শুধু একঘেয়েমি নয়। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, মারা যাচ্ছে সে—শারীরিক অর্থে নয়, মানসিক অর্থে। চিরকাল অ্যাডভেঞ্চারের ভক্ত সে, বিপদে পড়ে রোমাঞ্চিত হতে চায়, উপলব্ধি করে পরিবর্তন ছাড়া দম আটকে স্রেফ মারা যাবে।

মিশিগান রাজ্যের নেভী অফিসাররা ঠিকই তাকে চিনতে পেরেছিলেন। দুটো পা-ই ভাঙা, এমন এক তরুণ নৌ-বাহিনীতে নাম লেখাতে চায়? আশ্চর্য ব্যাপার তো! কৌতূহল বশতই অফিসারদের বোর্ড মীটিঙে ডাকা হলো তাকে। ওয়াটারম্যানের একটা পা ভেঙেছে স্কিইং-এ, অপরটা হ্যাণ্ড-গ্লাইডিং- এ, অথচ এখনও দুটো খেলাতেই সাংঘাতিক নেশা তার। শুধু তাই নয়, চোদ্দ বছর বয়েস থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া স্কুবা ডাইভার সে। নেভীর সাইকোলজিক্যাল-প্রোফাইল টেস্টে তিনজনের নাম বলল ওয়াটারম্যান, এরা তার হিরো—আর্নস্ট হেমিংওয়ে, থিয়োডর রুজভেল্ট আর জেমস বণ্ড। কারণ হিসেবে লিখল, 'তিনজনই তাঁরা কর্মীপুরুষ, দর্শক নন, নিজেদের জীবন তাঁরা অপচয় হতে দেননি।' বাস্তবের সঙ্গে কিংবদন্তী আলাদা না করায় অফিসাররা অসন্তুষ্ট হননি। তাঁরা বুঝতে পারেন, ছেলেটার মধ্যে যে অসম্ভব প্রাণশক্তি রয়েছে তা সদ্ব্যবহারের একটা সুযোগ তাকে দেয়া উচিত। তার এই প্রাণচাঞ্চল্য যদি দেশ সেবার কাজে লাগে, মন্দ কি। উনিশশো তিরাশি সালে, গ্রাজুয়েট হবার আগেই, নৌ-বাহিনীতে নাম লেখাল সে, নিউপোর্ট-এর অফিসার্স ক্যানডিডেট স্কুলে ট্রেনিং নিতে চলে গেল।

প্রথম কয়েক বছর তার প্রত্যাশা পূরণ হলো। আণ্ডারওয়াটার ডিমোলিশন এক্সপার্ট হয়ে উঠল সে। দক্ষ হেলিকপ্টার পাইলট হিসেবে উত্তীর্ণ হলো। কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে সাগর পাড়ি দিল সে, পানামায়

সত্যিকার যুদ্ধ দেখার সুযোগ ঘটল। তারপর মীটিয়ারলজি আর ওশেনোগ্রাফির ওপর এক বছরের একটা কোর্স কমপ্লিট করল।

জীবনে যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে ওয়াটারম্যান, তার পেশায় অ্যাডভেঞ্চারের কোন অভাব নেই। কিন্তু গত এক-দেড় বছর হলো বৈচিত্র্য আর মজা সব গায়েব হয়ে গেছে। কোন কিছুই আর ভাল লাগে না তার। এর একটা কারণও অবশ্য আছে।

প্যান-আমেরিকান এয়ারলাইন্সের এক অ্যাটেনড্যান্ট মেয়ের প্রেমে পড়েছিল ওয়াটারম্যান। মেয়েটাও তার মত স্কিয়ার ও স্কুবা ডাইভার, দু'জন তারা দুনিয়ার বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। দু'জনেই বয়সে তরুণ, বুকে সাহসের কোন অভাব নেই। বিয়ে একটা সম্ভাবনা বলে মনে হত, একান্ত প্রয়োজন নয়। বর্তমানটাকে চুটিয়ে উপভোগ করছিল, এবং তাতেই খুশি ছিল।

তারপর এল উনিশশো উননব্বুই সালের সেপ্টেম্বর মাস। ওরা তখন নর্থ কুইনসল্যাণ্ডে। সৈকত থেকে খানিকটা দূরে স্নরকেল নিয়ে বেড়াচ্ছিল সাগরে। বিপজ্জনক প্রাণী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছিল ওদের, তবে রুটিন ওয়ার্নিং বলে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। শার্ক আর ব্যারাকুডার সঙ্গে সাঁতরাচ্ছিল ওরা, কিভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হয় জানে। ওদের দৃষ্টিতে সাগর বিপজ্জনক কোন জগৎ নয়, বরং অ্যাডভেঞ্চার আর আবিষ্কারের উৎস।

দেখল একটা কচ্ছপ সাঁতার কেটে যাচ্ছে। ওটার পিছু নিল তারা। গতি কমাল কচ্ছপ, মুখ খুলল, যেন কিছু খেতে চায়, যদিও খাবার মত কিছু তারা দেখতে পেল না। কাছে চলে এল দু'জন, ওটার সৌন্দর্য আর পানিতে ভেসে থাকার নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়াল ক্যাথি, খোলে হাত বুলিয়ে আদর করবে। হঠাৎ কি হলো,

মোচড় খেয়ে গেল তার শরীর, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠল পিঠ, হাত দিয়ে খামচে ধরল বুক। মুখ থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল স্নরকেল। বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ, গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে, টেনে ছিঁড়ে আনার চেষ্টা করছে নিজের মাংস।

তাকে ধরে পানির ওপর টেনে তুলল ওয়াটারম্যান, কথা বলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ক্যাথি শুধু চিৎকার করছে।

তীরে নিয়ে আসার পর দেখা গেল মারা গেছে সে।

কচ্ছপটা সামুদ্রিক ওঅস্প্ আর বক্স জেলিফিশ খাচ্ছিল, পানির ভেতর সহজে চোখে পড়ে না। ওগুলো এত বিষাক্ত যে শুধু একটু ঘষা লাগলেও মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ঘটেছেও ঠিক তাই।

ইণ্ডিয়ানায় কবর দেয়া হলো ক্যাথিকে। ওয়াটারম্যানের জীবন থেকে বিদায় নিল সুখ আর আনন্দ। ক্যাথি মারা যাবার পর এই প্রথম জীবনের অশুভ দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা এল তার মধ্যে। সে উপলব্ধি করল, নিয়তি আসলে স্বৈরাচারীর মত আচরণ করে। তার মনে অবিচার বা নিরপেক্ষতার প্রশ্ন ওঠেনি, নিয়তিকে তার খেয়ালী মনে হয়েছে। এই প্রথম কে যেন তার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, মানুষ মরণশীল, কোন কিছুই চিরকাল টিকে থাকবে না।

জীবন হয়ে উঠল উদ্দেশ্যবিহীন। ইউএস নেভী সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যই করল তাকে। তার মনের অবস্থা উপলব্ধি করে দু'বছরের লম্বা ট্যুরে পাঠাল বারমুডায়। রোদ ঝলমলে একটা দ্বীপ, তেমন কাজ নেই, শান্ত পরিবেশ।

কিন্তু শান্ত পরিবেশ চায় না ওয়াটারম্যান। তার দরকার অ্যাকশন। আর শুধু অ্যাকশনেও কাজ হবে না, সেই সঙ্গে একটা উদ্দেশ্যও

থাকতে হবে।

বারমুডায় এসে কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছে সে, আর মাঝে মধ্যে হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় আশা করছে কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার সুযোগ পাবে।

এই মুহূর্তে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওয়াটারম্যান, ভাবছে সার্চ প্যাটার্নটা ওদিক থেকেই শুরু করবে। সারফেস থেকে পাঁচশো ফুট ওপরে রয়েছে সে। ইউএইচএফ আর ভিএইচএফ, দুটো রেডিওই অন করল। দ্বীপ থেকে ছ'মাইল দূরে চলে এল সে, নিচে যেখানে শেষ হয়েছে রীফ, এই সময় একটা বীপ শুনতে পেল। খুবই অস্পষ্ট, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে, তবে বারবার আসছে। কো-পাইলটের দিকে তাকাতে সে-ও মাথা ঝাঁকাল। ইন্সট্রুমেন্টের দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান, হেলিকপ্টার খানিকটা ঘুরিয়ে বীপ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাক করল নাক। তারপর কম্পাস থেকে একটা বেয়ারিং নিল।

হঠাৎ মেরিন রেডিও থেকে ভেসে এল একটা গলা, 'ড্রাগন ওয়ান··· ড্রাগন ওয়ান···ড্রাগন ওয়ান··· দিস ইজ সী কুইন···কাম ব্যাক।'

'সী কুইন··· ড্রাগন ওয়ান···,' হাসছে ওয়াটারম্যান। 'মি. রানা, আপনারা কোথায়?' মাসুদ রানা, বেলের নতুন বন্ধু।

'তোমার ঠিক নিচে। রাস্তার ওপর চোখ রেখে হাঁটো না?'

'আমার চোখ ভবিষ্যতের দিকে, মি. রানা।'

'বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি?'

'বিএ পাইলট কিছুক্ষণ আগে একটা ইপিআইআরবি সিগন্যাল পেয়েছে। আপনারা কিছু শুনেছেন নাকি?'

'আহ। কত দূরে?'

'দশ, পনেরো মাইল। বীপটা পাচ্ছি, ওয়ান-টোয়েনটি-ওয়ান-ফাইভে। জিনিসটা যা-ই হোক, বাতাস এদিকে ঠেলে আনছে।'

'দোস্ত,' রেডিওতে এবার ভেসে এল বেলের গলা, 'ভাবছি আমরাও তোমাদের পিছু নেব কিনা। তুমি কি বলো?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ওয়াটারম্যান, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তাই করো। কে জানে! তোমার কপালে কিছু জুটলেও জুটতে পারে।'

'ধন্যবাদ, টেডি। সী কুইন স্ট্যাণ্ডিং বাই।'

ভালই হলো, ভাবল ওয়াটারম্যান। সামনে যদি কোন বোট বিপদে পড়ে থাকে, বেস থেকে রেসকিউ ভেসেল এসে পৌঁছুনোর অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে যাবে সী কুইন। ওটা যদি কোন পরিত্যক্ত বোট বা লাইফবোট হয়, অনুসন্ধান চালাবার জন্য একজন ডাইভারকে নিচে পাঠাতে হবে তার। আবহাওয়া ভালই, তবে যে-কোন আবহাওয়াতেই হেলিকপ্টার থেকে খোলা সাগরে ডাইভার নামানোয় ঝুঁকি আছে। সে নিজে নামতে ইতস্তত করবে না, কিন্তু উনিশ বছরের একটা ছেলেকে একা পাঠাতে ভয় করবে। তাদের হয়ে সী কুইন চারপাশটা সার্চ করতে পারবে। ওরা যদি কোন জীবিত মানুষজন পায়, তখন ডাইভার নামাতে বাধ্য হবে সে। তাছাড়া, কে জানে, ওখানে দামী কিছু পেয়েও যেতে পারে বেল। একটা ভেলা বা রেডিও, কিংবা একটা ফ্লেয়ার গান। বিক্রি বা ব্যবহার করার মত কিছু একটা। ওয়াটারম্যান জানে, বেল খুব অভাবে আছে। মাসুদ রানার মত একজন ট্যুরিস্ট পেয়ে আপাতত তবু কিছুটা বেঁচেছে বেচারা। আশ্চর্য এক মানুষ, এই ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক। ওঁর কথা শুনে সে উপলব্ধি করেছে, সাগর সম্পর্কে এতদিন কিছুই তার শেখা হয়নি। ভদ্রলোককে সাগর সম্পর্কে সচল একটা এনসাইক্লোপিডিয়া বলে মনে হয়েছে তার।

বীপ বীপ শব্দটা এখন বেশ অনেকটা জোরে শোনা যাচ্ছে। ঢেউয়ের সঙ্গে হলুদ কি যেন একটা ওঠা-নামা করছে, দেখতে পেল ওয়াটারম্যান। হেলিকপ্টার নামিয়ে আনল সে, সারফেস থেকে একশো ফুটের মধ্যে চলে এল।

একটা ভেলা, ছোট আর খালি। দেখে অক্ষতই মনে হলো। ভেলাটাকে ঘিরে চক্কর দিল সে। তারপর রেডিওতে বলল, 'সী কুইন··· ড্রাগন ওয়ান··· ।'

'হ্যাঁ, টেডি···' বেলের গলা ভেসে এল।

'একটা ভেলা। কেউ নেই ওটায়। শুধুই একটা ভেলা। কোন বোট থেকে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। কোন কোন ইপিআইআরবি লোনা পানি পেলে সচল হয়ে ওঠে।'

'তুমি আমাকে ওটা ডেভিটের সাহায্যে বোটে তুলতে বলছ না কেন?. চারপাশে ঘুরে দেখব কেউ ভেসে থাকার চেষ্টা করছে কিনা, তারপর ওটাকে নিয়ে তীরে ফিরব। তোমাদের কাউকে ভিজতে হবে না।'

'ঠিক আছে, বললাম। তোমরা যেখানে আছ সেখানে থেকে এখানে পৌঁছুতে ঘন্টাখানেক লাগবে তোমাদের। ফুয়েল যতক্ষণ থাকে আমরাও চক্কর দিই।'

'ঠিক আছে, টেডি। ধন্যবাদ।'

'ফলস অ্যালার্ম, আমার ধারণা। তবে আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, বেল।'

'মাই প্লেজার। সী কুইন স্ট্যাণ্ডিং বাই··· ।'

'দিনটা খুব খারাপ গেল তা বলা যাবে না,' মই বেয়ে ফ্লাইং ব্রিজে ওঠার

সময় মন্তব্য করল রানা।

'কি রকম?' জানতে চাইল বেল, হুক লাগানো তার-এর লাইন কুণ্ডলী পাকাচ্ছে সে।

'ভেলাটা সংগ্রহ করার সুযোগ পাওয়া গেল। বিক্রি করলে অন্তত দু'হাজার ডলার পাব আমরা।'

'যদি কেউ দাবি না করে। এর আগে যতগুলো ভেলা বোটে তুলেছি, সবগুলো কেউ না কেউ নিজের বলে দাবি করেছে।'

হেসে ফেলল রানা।

ভেলাটার কাছে পৌঁছুতে এক ঘণ্টাও লাগল না ওদের। বোটে তোলার আগে ওটাকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিল ওরা, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল।

'দেখে তো মনে হচ্ছে একেবারে নতুন,' মন্তব্য করল বেল।

'ভেলায় কোন লোক ছিল না, অন্তত কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। কিংবা হয়তো ছিল, খুব তাড়াতাড়ি তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে।' ভেলাটায় রাবার শ্যুর দাগ, কোন রকম আবর্জনা, কাপড়চোপড়, কিছুই নেই। ভেলায় বসে কেউ যদি মাছ ধরে থাকে, তার রক্ত থাকবে, তা-ও নেই।

'লোকগুলো হাঙরের পেটে যায়নি তো?' জানতে চাইল বেল।

মাথা নাড়ল রানা। 'হাঙর হলে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলত রাবার, এক-আধটা সেল চুপসে যেত।'

'তাহলে কি ঘটেছে?'

'হয়তো তিমি।' ভেলাটাকে ঘিরে এখনও চক্কর দিচ্ছে বোট। কি ঘটতে পারে ভাবছে রানা। কিলার হোয়েল ভেলা, ডিঙ্গি, এমনকি বড় বোটেও হামলা চালায় বলে প্রমাণ আছে। কারণটা কেউ জানে না।

সাধারণত মানুষ দেখলে কখনই এগিয়ে আসে না ওগুলো, আক্রমণও করে না। সম্ভবত ভেলা-টেলা দেখলে খেলার সাধ জাগে ওদের, আর হঠাৎ বেড়ে ওঠা কিশোরের মত নিজেদের শক্তি সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না বলে ঘটে যায় অঘটন।

হাম্পব্যাক হোয়েল মানুষ মেরেছে, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়ী করতে হয় দুর্ঘটনাকে। কৌতূহলবশত ভেলার কাছে চলে আসে ওগুলো, ভেলার তলায় ঢুকে লেজ ঝাপটায়, লোকজন ছিটকে পড়ে মারা যায়। 'না,' বলল রানা। 'তিমি নয়। তিমি লেজ ঝাপটালে ভেলাটা উল্টে যেত, কিছু দাগও থাকত।'

বেল বলল, 'হয়তো কোন বোটের ডেক থেকে খসে নিচে পড়ে গেছে।'

'তাহলে ইপিআইআরবি অন করা থাকবে কেন?' ইঙ্গিতে স্টাইরোফোম-কেডস্ বীকনটা দেখাল রানা। 'ওটা অটোমেটিক নয়। কেউ একজন অন করেছে।'

'লোকগুলোকে হয়তো কোন জাহাজ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। অফ করতে ভুলে গেছে তারা।'

'বারমুডায় রিপোর্ট করতেও ভুলে গেছে?' মাথা চুলকাল রানা। 'আমার ধারণা, বোট ডুবে যাচ্ছে দেখে ভেলাটা পানিতে ফেলে দেয় লোকগুলো, তারপর লাফ দিয়ে ওটায় নামতে গিয়ে পানিতে পড়ে তলিয়ে গেছে।'

এই ব্যাখ্যায় বেল সন্তুষ্ট হলো দেখে দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথাটা তুলল না রানা। ধারণাটা ওর নিজের কাছেও পরিষ্কার বা স্পষ্ট নয়। ভেলাটাকে হুক দিয়ে আটকাল ওরা, রশির প্রান্তটা ডেভিটের ব্লক-অ্যাণ্ড-ট্যাকল রিগের সঙ্গে বাঁধল, তারপর উইঞ্চ চালু করে বোটে তুলে আনল

ওটা।

হাঁটু গেড়ে বসল বেল, এটা-সেটা নেড়েচেড়ে দেখছে। সাপ্লাই বক্সটা রয়েছে বো-তে, খুলল সেটা। রাবার সেলের নিচটা হাতড়াল।

'ইপিআইআরবি অফ করো,' বলল রানা, হুক খুলে রশি প্যাঁচাচ্ছে। 'পাইলটদের আর বিরক্ত করার কোন মানে হয় না।'

বীকন-এর সুইচ অফ করল বেল, অ্যান্টেনা নামিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর দাঁড়াল সে। 'কিছুই নেই। না কিছু হারিয়েছে, না কোন অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে।'

'না,' অস্ফুটে বলল রানা, এখনও তাকিয়ে আছে ভেলাটার দিকে। কি আছে আর কি থাকার কথা, মেলাবার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু মিলছে না কেন যেন।

তারপর ব্যাপারটা ধরা পড়ল চোখে। বৈঠা। হ্যাঁ, বৈঠা। ভেলায় কোন বৈঠা নেই। অথচ প্রতিটি ভেলায় অন্তত একটা বৈঠা থাকতে বাধ্য। এটায় তো একাধিক থাকার কথা, কারণ একাধিক ওরলক রয়েছে।

তারপর, বোট সামান্য কাত হতে, রাবার সেলের ওপর রোদ লাগায় কি যেন চকচক করে উঠল। ঝুঁকল রানা, রাবারের কাছাকাছি নামিয়ে আনল মুখ। আঁচড়ের দাগ, যেন ছুরির ডগা দিয়ে দাগ কাটা হয়েছে, তবে রাবার ভেদ করেনি। আর, প্রতিটি আঁচড়ের দাগের চারদিকে পিচ্ছিল আঠাল কি যেন লেগে রয়েছে, রোদে চকচক করছে। আঙুলের ডগায় নিয়ে নাকের সামনে তুলল ও।

'কি?' জিজ্ঞেস করল বেল।

ইতস্তত করল রানা, সিদ্ধান্ত নিল সত্যি কথা বলবে না। 'সানবার্ন অয়েল। বেচারারা তেল মেখে রোদ পোহাতে এসে ডুবে মরেছে।'

জিনিসটা কি, ওর কোন ধারণা নেই। গন্ধটা অ্যামোনিয়ার মত।

রেডিওতে ওয়টারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করল ও, জানাল ভেলাটা উদ্ধার করেছে ওরা, এখন উত্তর দিকে সার্চ করতে যেতে চায়।

উত্তর দিকে, প্রায় দশ মাইল, এক ঘণ্টা ধরে সার্চ করল ওরা। তারপর ঘুরে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পুব দিকটা দেখল। বেল দাঁড়িয়ে আছে বো-তে, তার দৃষ্টি কাছাকাছি সারফেসের ওপর। রানা ফ্লাইং ব্রিজ থেকে চোখ বুলাচ্ছে আরও দূরে।

মাত্র পুব দিকে ঘুরেছে ওরা, এই সময় বেল বলল, 'ওদিকে!' হাত তুলে পোর্ট সাইডটা দেখাল সে।

বিশ কি ত্রিশ গজ দূরে খানিকটা শ্যাওলার সঙ্গে বড় কি যেন একটা ভাসছে। বোটের গতি কমিয়ে সেদিকে ঘোরাল রানা। কাছাকাছি এসে দেখল, জিনিসটা যা-ই হোক, মানুষের তৈরি নয়। ধীরে ধীরে উঁচু-নিচু হচ্ছে, ভেজা চকচকে ভাব লক্ষ করা গেল, একটু যেন কাঁপছেও।

'কি ওটা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বেল।

'দেখে মনে হচ্ছে একটা ছ'ফুটি জেলিফিশ শ্যাওলার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।'

'মরুকগে।'

বোটের এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, বোটের পাশ ঘেঁষে ভেসে যাবার সময় ফ্লাইং ব্রিজ থেকে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। জিনিসটা আঠাল মনে হলো, স্বচ্ছ, বেশ বড় আর চারকোণা; মাঝখানে একটা গর্ত রয়েছে। মনে হলো নিজস্ব একটা প্রাণ আছে জিনিসটার, কারণ এমন ভঙ্গিতে ঘুরছে যেন কয়েক সেকেণ্ড পরপর রোদের দিকে মেলে ধরছে নিজের নতুন নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

বেল বলল, 'এরকম জেলিফিশ বাপের জন্মেও দেখিনি।'

'না,' বলল রানা। 'কি হতে পারে বুঝতে পারছি না। কোন মাছের ডিম হতে পারে।'

'কিছুটা তুলতে চাও?'

'কি হবে?'

'অ্যাকুয়েরিয়ামের জন্যে।'

'না। সেদিনই তো কথা হলো, ওরা ডিম নেবে না। যদি ডিমই হয়, যার-ই হোক, ফুটে বাচ্চা বেরোক।'

আবার দক্ষিণ-পুব দিকে বোট ছাড়ল রানা। যেখানে ভেলাটা পাওয়া গিয়েছিল সেখানে পৌঁছে একজোড়া সীট কুশন আর একটা রাবার ফেণ্ডার ভাসতে দেখল ওরা।

'আশ্চর্য, টেডি এগুলো দেখতে পায়নি কেন?' হুক দিয়ে আটকে ফেণ্ডারটা বোটে তুলে ফেলল বেল। 'দেখে তো মনে হচ্ছে না পানির তলায় ছিল।'

'হেলিকপ্টার খুব ধীরগতিতে না উড়লে নিচের অনেক জিনিসই দেখা যায় না।' পানির চারধারে চোখ বুলাল রানা। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। 'চলো, ফেরা যাক।'

কোণ ঘুরে যখন ম্যানগ্রোভ বে-তে পড়ল বোট, নীল আকাশ দ্রুত গোলাপী হয়ে উঠছে, যে-কোন মুহূর্তে ঝপ করে দিগন্তরেখার নিচে অদৃশ্য হয়ে যাবে সূর্য। ডকে নিঃসঙ্গ একটা বালব জ্বলছে, তার নিচে নোঙর করা রয়েছে পঁচিশ ফুট লম্বা সাদা একটা আউটবোর্ড মোটরবোট, নীল বড় বড় হরফে পাশে লেখা রয়েছে—পুলিস।

ডকে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন মেরিন পুলিস, একজন কালো, অপরজন শ্বেতাঙ্গ, ইউনিফর্ম পরা। শার্ট, শর্টস আর হাঁটু ঢাকা মোজা। দু'জনকেই চেনে রানা, দু'জনেই তারা বেলের বন্ধু। ওদের সঙ্গে মাঝে-

মধ্যে তারা সাগরে মাছ ধরতেও যায়, শখ করে। তাসত্ত্বেও, কি মনে করে, ফ্লাইং ব্রিজেই থাকল রানা, নিচে নামল না। 'কি খবর, তোমরা এখানে কি করছ—ট্যাকার, জ্যাকনি?'

'ওহে, বেল…' ট্যাকার ডাকল, সে শ্বেতাঙ্গ।

জ্যাকনি রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'বোটে উঠব, মি. রানা?'

'ওঠো,' বলল রানা। 'কি ব্যাপার বলো তো?'

'শুনলাম আপনারা নাকি একটা ভেলা পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল জ্যাকনি।

'পেয়েছি।'

বোটে উঠে ভেলাটার দিকে আঙুল তাক করল জ্যাকনি। 'এটা?'

'হ্যাঁ।'

ভেলার ওপর টর্চের আলো ফেলল জ্যাকনি, নাক কোঁচকাল। 'আরে, গন্ধ কিসের!'

ডক থেকে ট্যাকার বলল, 'বেল, এটা আমরা নিয়ে যাব।'

ধীরে ধীরে তার দিকে ঘুরল বেল। 'কেন? কেউ দাবি করেছে?'

'না… ঠিক তা নয়।'

'তাহলে এটা আমাদের, নয় কি?'

'ফার্স্ট ল অভ স্যালভেজ,' বলল রানা, 'যে পায় তার।'

'না, মানে…,' ইতস্তত করছে ট্যাকার। নিজের পায়ের দিকে তাকাল। 'এবার নয়।'

'এবার নয় মানে?' খেঁকিয়ে উঠল বেল। 'কি বলতে চাইছ?'

'ড. কাইল ফ্যাদম,' বলল ট্যাকার। 'তিনি ওটা চেয়েছেন।'

'ড. কাইল ফ্যাদম।' বেল বুঝতে পারল, পরাজয় মেনে নিতে হবে তাকে। মাথা গরম হয়ে উঠছে তার। 'আচ্ছা!'

কাইল ফ্যাদমকে চেনে রানা, বেলই তার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বেল সহ্য করতে পারে না, এমন লোক বারমুডায় যদি কেউ থাকে তো ওই একজনই। ভদ্রলোক আইরিশ, তাঁদের পরিবার দুই পুরুষ ধরে বারমুডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। লেখাপড়া করেছেন মন্টানায়, অখ্যাত একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছেন, সেখান থেকেই তাঁকে ডক্টরেট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ঠিক কোন বিষয়ে ডক্টরেট পেয়েছেন, কেউ তা জানে না, কাউকে কোনদিন বলেননি তিনি।

সরকারী মহলে তাঁর বাপ-চাচার প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধব আছে, নিজেকে সুপরিচিত করে তোলার জন্যে এই যোগাযোগটা কাজে লাগান কাইল ফ্যাদম। মন্ত্রী আর সচিবদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি, সাক্ষাৎকারের বিবরণ ফলাও করে কাগজে ছাপার ব্যবস্থাও করা হয়। তাঁর কথা হলো: ম্যারিটাইম আর ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্টে শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই, অ্যামেচাররা সব এলোমেলো করে রেখেছে, এ-সব বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া উচিত সার্টিফিকেটধারী যোগ্য বিশেষজ্ঞদের— অর্থাৎ তাঁকে, কারণ কয়েকজন চিকিৎসক ছাড়া গোটা বারমুডায় আর কারও ডক্টরেট ডিগ্রী নেই।

রাজনীতিকরা অত শত বোঝেন না। কাইল ফ্যাদম তাঁদের প্রশংসা করেন, আর বেশ দামী দামী কথা বলেন, তাঁদের জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট। ডিরেক্টর অভ কালচারাল হেরিটেজ নামে একটা পদ তৈরি করা হলো, সেই পদ দিয়ে অলংকৃত করা হলো তাঁকে। এই পদের কি কাজ তা নির্দিষ্ট করে না দেয়ায় সুবিধেই হলো তাঁর, সমস্ত ব্যাপারে নাক গলাতে পারেন তিনি, নিজের প্রয়োজনে নতুন নতুন নিয়ম-কানুনও চালু করা যায়।

বেলের মুখে শুনেছে রানা, নিজেও লক্ষ করেছে, কাইল ফ্যাদমের নিয়ম-কানুন শত শত বারমুডিয়ানকে অপরাধী বানিয়ে ছেড়েছে। নতুন একটা আইন হলো, তাঁর কাছ থেকে লাইসেন্স না নিয়ে অচল বা ডোবা জাহাজ কেউ ছুঁতে পারবে না। লাইসেন্স নিতে হলে মোটা টাকা জমা দিতে হবে। সেটা নাহয় দেয়া গেল। কিন্তু অলিখিত আইন হলো, সুপারভাইজ করার জন্যে তাঁর স্টাফ থাকবে, তাকে দিতে হবে দৈনিক দুশো ডলার। ফলে, কেউ যদি কিছু পায়, রিপোর্ট করা হয় না। সৌখিন শিল্প-সামগ্রী, সোনা বা হীরের গহনা, স্প্যানিশ তৈজস-পত্র, যা-ই উদ্ধার করা হোক, সব লুকিয়ে রাখা হয়, গোপনে পাচার করা হয় অন্য কোন দেশে। কালচারাল হেরিটেজ-এর ডিরেক্টরকে ধন্যবাদ, বারমুডার হেরিটেজ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে শোভা পাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা এক সময় বারমুডাকে ডীপ-ওয়াটার ল্যাবরেটরী বলে মনে করতেন, মধ্য-আটলান্টিকে একখণ্ড অভিনব জমি। আজকাল তাঁরা কেউ আর আসেন না। কারণ কাইল ফ্যাদম চান যেখানে যা কিছু আবিষ্কার হোক, সব তাঁর স্টাফদের হাতে পরীক্ষার জন্যে তুলে দিতে হবে। সেগুলো দেখার পর তালিকায় উঠবে, তারপর সরকারী মিউজিয়ামে ঠাঁই পাবে। মন্দ কি, ভালই তো। কিন্তু সমস্যা হলো, তালিকা তৈরি হতে মাসের পর মাস লেগে যায়, তারপর দেখা যায় তালিকায় যা থাকার কথা তার অর্ধেকও নেই।

বেল আর তার বন্ধুদের আলাপ করতে শুনেছে রানা, বারমুডা থেকে কিভাবে খেদানো যায় কাইল ফ্যাদমকে। একজনের প্রস্তাব ছিল, একটা জাহাজডুবির খবর দিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেই হবে, বাকিটা সহজ—জাহাজ দেখতে বোটে চড়ে আসবেন তিনি, তখন তাঁর বোটটা ডুবিয়ে দেয়া কোন সমস্যা নয়। শোনা যায়, কাইল ফ্যাদম সাঁতার

জানেন না। প্রস্তাবটায় ভেটো দেয়া হয়, কারণ সবাই জানে জাহাজডুবির খবর পেয়ে নিজে আসবেন না তিনি, তাঁর কোন স্টাফকে পাঠাবেন।

আরেকজনের প্রস্তাব ছিল, এত সব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে লোকটার মাথায় লোহার ডাণ্ডা মারা হোক, তারপর গভীর সাগরে লাশটা ফেলে দিয়ে এলেই চলবে। প্রস্তাবটা সবারই পছন্দ হলো, কিন্তু কাজটা করার জন্যে কোন স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যায়নি।

বেল আর তার বন্ধুদের কথাবার্তা শুনে রানার ধারণা হয়েছে, ঘটনাটা ঘটলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কোন রাতে হয়তো দেখা গেল ড. কাইল ফ্যাদমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, স্রেফ গায়েব হয়ে গেছেন তিনি।

'ট্যাকার,' বলল বেল, 'আমার একটা উপকার করবে?'

'শুনে বলতে পারব।'

'তুমি ড. কাইল ফ্যাদমের কাছে ফিরে যাও, তাকে বলো যে ভেলাটা আমি দেব…।'

'ঠিক আছে…।'

'…যদি সে নিজে এখানে আসে, আর ভেলাটা তার গলায় বেঁধে ঝোলাবার অনুমতি দেয়।'

'এ-সব কি!' ট্যাকার ঝট করে জ্যাকনির দিকে তাকাল, তারপর বেলের দিকে। 'এরকম পাগলামি করলে তো চলবে না, বেল।'

'তাহলে তো একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ট্যাকার,' বলল বেল। 'কারণ, তোমরা যদি ভেলাটা নিয়ে যাবার চেষ্টা করো, সেটাকেও আমি পাগলামি বলে মনে করব।'

'আমাদের উপায় নেই, বেল!' চিৎকার করলেও, অসহায় দেখাল ট্যাকারকে।

ভেলার কাছ থেকে সরে মইয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়াল জ্যাকনি, মুখ তুলে রানাকে বলল, 'মি. রানা, আমরা বেলের বন্ধু, সেই সূত্রে আপনিও আমাদের বন্ধু। আমি আর ট্যাকার বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে বলছি, ভেলাটা ওকে দিয়ে দিতে বলুন। তা না হলে বিপদে পড়বে ও, আমরাও বিপদে পড়ব। বোটটা বেলের, কিন্তু ভাড়া করেছেন আপনি, কাজেই আপনি বললেই আমরা এটা নিয়ে যেতে পারি।'

জবাব দেয়ার আগে রানা দেখল, বোটের সামনের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে বেল। র‍্যাকটার কাছে থামল সে, বড় আকৃতির মাছ আটকানো বা দমন করার জন্যে ওটায় মুগুর আর গ্যাফ হুক রয়েছে। 'বোটটা আমি ভাড়া করেছি ঠিকই,' বলল ও, 'তবে বিক্রি করার মত যা কিছু পাব তার অর্ধেকের মালিক বেল। আমি নাহয় আমার দাবি ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বেল যদি না ছাড়ে?'

'ওকে আপনি বোঝান, স্যার,' অনুরোধ করল জ্যাকনি। 'ড. কাইল ফ্যাদম ওটা স্টাডি করার জন্যে চাইছেন…।'

'বাজে কথা,' র‍্যাক থেকে তিন ফুট লম্বা একটা গাফ তুলে নিয়ে বলল বেল, গ্যাফটার শেষ মাথায় হুকটা চার ইঞ্চি লম্বা। 'ফ্যাদম ব্যাটা পরীক্ষা করার নাম করে কেড়ে নিয়ে বিক্রি করে দেবে ভেলাটা।'

'কিন্তু আমাদেরকে তিনি তা বলেননি।'

'সত্যি কথা বলা তার স্বভাব নয়।'

বেলের সঙ্গে পারা যাবে না, কাজেই আবার রানার দিকে তাকাল জ্যাকনি। 'মি. রানা, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা এখন কি করতে যাচ্ছি?'

'পারছি বৈকি,' রানা কিছু বলার আগে কথা বলে উঠল বেল। 'তোমরা এখন ফিরে যাবে, ফ্যাদমকে বলবে বড় একটা ডিম পাড়তে।'

'না। আমরা ফিরে গিয়ে আরও দশজন পুলিস নিয়ে আসব, জোর করে নিয়ে যাব ভেলাটা।'

'তাহলে এখানে একটা যুদ্ধ হবে।'

'তুমি যা মাথা গরম লোক, তা হয়তো সত্যি হবে,' গম্ভীর সুরে বলল জ্যাকনি। 'কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় একবার ভেবে দেখ, বেল। মারামারি হলে জেলে যেতে হবে তোমাকে, আর ভেলাটা তো আমরা নিয়ে যাবই। তাহলে বলো, শেষ হাসিটা কে হাসবে? ড. কাইল ফ্যাদম না?'

বোটে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'বেল?' নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা।

'জ্যাকনি,' ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা নিয়ে বেল বলল, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। তুমি আসলে সত্যি জ্ঞানী মানুষ।'

ট্যাকারের দিকে তাকাল জ্যাকনি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসল সে।

'কাইল ফ্যাদম সম্মানী ব্যক্তি,' বলল বেল, 'তিনি যদি আমাদের ভেলাটা চান, না দিয়ে কি পারি? নিয়ে যাও ওটা, বলবে আমি তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।' কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল সে, গাফটা কাঁধের ওপর তুলে সবেগে নামিয়ে আনল ভেলার ওপর। ভেলার রাবারে গেঁথে গেল হুক, হিসহিস শব্দ করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল বাতাস, চুপসে গেল সেল। 'দুঃখিত,' এক গাল হেসে বলল সে, ভেলাটাকে বুলওয়ার্কের দিকে টেনে আনল। আরেকটা সেলে হুক গাঁথল সে। সেটাও চুপসে গেল। ভেলাটাকে টেনে বুলওয়ার্ক তুলছে সে, ওটা থেকে কি যেন একটা পড়ল ইস্পাতের ডেকে, খট করে শব্দ হলো। হুকটা খুলে নিয়ে পিছিয়ে এল এক পা, তারপর আবার ভেলার সামনের সেলটা বিদ্ধ করল। দু'হাতে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওপরে তুলল, হাতের পেশীগুলো থরথর করে কাঁপছে। 'উফ!' সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল একটা, তারপর

ছেড়ে দিল। পুলিসের বোটে পড়ল সেটা, হিসহিস করে এখনও বাতাস ছাড়ছে।

পুলিস দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'ঠিক আছে,' বলল জ্যাকনি, তাড়াতাড়ি বোট থেকে ডকে নেমে পড়ল সে। 'ড. কাইল ফ্যাদমকে আমরা বলব, এভাবেই পেয়েছি এটা।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ট্যাকার। 'দেখে মনে হচ্ছে একটা হাঙরের কীর্তি।'

'তাছাড়া, সাগরে খুব ঢেউ ছিল,' বলল জ্যাকনি। 'আশপাশে অসংখ্য হাঙর, বোকা ছাড়া কেউ ওটাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে যাবে না।'

ভেলা নিয়ে চলে গেল তারা।

বোট পরিষ্কার করছে ওরা, ইকুইপমেন্টগুলো জায়গামত তুলে রাখছে, পরিষ্কার করছে ডেক, এই সময় পায়ের তলায় ছোট আর তীক্ষ্ণ কি যেন অনুভব করল রানা। জিনিসটা তুলল ও, কিন্তু আলো কম থাকায় ভাল করে দেখা হলো না, রেখে দিল পকেটে।

ডক থেকে বাড়ি ফেরার পথে বেল বলল, 'এক কাপ কফি খেয়ে যাবে নাকি?'

'চলো।'

'কাল সকালে আবার বেরুতে চাও?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'অ্যাকুয়েরিয়ামে খবর দিতে হবে, দেখতে হবে ওরা আমাদেরকে আরও ইকুইপমেন্ট দিতে রাজি হয় কিনা। রাজি না হলে কাল থেকে আমরা ডোবা-জাহাজ খুঁজতে বেরুব।'

হাতমুখ ধুয়ে খোলা বারান্দায় বসল ওরা, টেবিলে ব্র্যাণ্ডি মেশানো কফি আর বাদাম পরিবেশন করল এনা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে মোনাও বসল। বাইরে বেরুনোর জন্যে কাপড়চোপড় পরে তৈরি

হয়ে রয়েছে সে। মুচকি হেসে বেল তাকে বলল, 'এই রাতে শালী আমার কোথাও যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ, অভিসারে,' হেসে উঠে বলল মোনা। তারপর রানার দিকে তাকাল সে। 'আজকাল কি হয়েছে, রাতে মেয়েরা একা কোথাও যেতে পারে না। সবগুলো বারের সামনে একদল ছোকরা মাতলামি করে। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও পারলাম না, সেই রাতেই ডিউটি গছিয়ে দিল। মাসুদ ভাই, আমাকে কিন্তু আপনার খানিক দূর পৌঁছে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আমি তো ওদিকেই যাব।'

'ক'টা পর্যন্ত ডিউটি?' জিজ্ঞেস করল বেল।

'একটা পর্যন্ত।'

'ঠিক আছে,' বলল বেল। 'রানা তোমাকে নিয়ে যাক, আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব। সব কিছুতেই যখন আধাআধি বখরা, তোমাকেও আমরা সমান দু'ভাগে···· ঠিক আছে?'

দুলাভাইকে কিল দেখাল মোনা। তারপর কৌতুকে ঝিক করে উঠল তার চোখ। 'তার আগে নিজের বউটাকে ভাগ করো। পারবে?'

এনা বলল, 'তুই না! দিলি তো বেচারাকে বিপদে ফেলে!'

'কে বিপদে পড়েছে? আমি? আরে, ধ্যাত্! এনার অর্ধেক দান করার বিনিময়ে মোনার অর্ধেক আমি ঠিকই কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে পারব। বিপদে পড়েছে আসলে রানা। কারণ ওকে দিলেও নিজের ভাগ নিতে পারবে না ও। প্রমাণ চাও, শোনো তাহলে···।' ভেলাটাকে নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছে সংক্ষেপে বর্ণনা করল বেল। সবশেষে মন্তব্য করল, 'ওর এই আচরণকে বোকামি বলে ওকে আমি ছোট করতে চাই না। সত্যি কথা বলতে কি, এটা ওর এক ধরনের উদারতা।' হঠাৎ তার গলা

কেঁপে গেল। 'ওর এই উদারতার কারণেই আজ আমি বিদ্যুৎ আর গ্যাসের বিল দিতে পারছি, সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে বাজারে যেতে পারছি··· ।' আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল সে, যেমন—বিক্রি করার মত মাছ পাওয়া যাবে না জেনেও তার বোটটা ভাড়া করেছে রানা, কারণ তাকে সাহায্য করাই ওর উদ্দেশ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বলা হলো না, তাকে থামিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা।

'এ-সব তোমার কল্পনা,' বলল রানা। 'আমি একজন ট্যুরিস্ট, ছুটি কাটাতে এসেছি, আমার একটা বোট দরকার—ব্যস।' ও যখন দাঁড়াল, টেবিলের কিনারায় ধাক্কা লাগায় কি যেন খচ্ করে বিঁধল উরুতে। ব্যথায় উফ করে উঠল, পিছু হটে আবার বসে পড়ল চেয়ারটায়।

'কি হলো?' মোনা আর এনা দু'জন একসঙ্গে আঁতকে উঠল।

'মাংস বোধহয় ফুটো হয়ে গেছে।' পকেটে হাত ভরে জিনিসটা বের করল রানা, বোটের ডেকে যেটা কুড়িয়ে পেয়েছিল।

কাস্তে আকৃতির একটা হুক ওটা, তবে ইস্পাতের নয়; শক্ত, চকচকে, যেন কোন হাড় জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি।

'কি হতে পারে জিনিসটা?' হুকটা টেবিলে রেখে চাপ দিল রানা, বাঁকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁকাতে পারল না।

'দেখে মনে হচ্ছে নখ,' বলল এনা। 'কিসের নখ বলো তো, বেল? বাঘের নাকি? কিংবা কোন কিছুর দাঁত নয় তো? কোথায় পেয়েছ, রানা?'

'ভেলাটা থেকে পড়ে যেতে দেখেছিলাম,' বলল রানা। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে ও। ভেলায় দেখা দাগগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—রাবারের গায়ে কিসের আঁচড় ছিল ওগুলো? বেলের দিকে তাকাল, তারপর হুকটার দিকে। 'কি হতে পারে বলো তো···?'

সমুদ্রের গভীরে ঝুলে আছে ওটা। অপেক্ষা করছে।

অনড়, অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য, অনুভূতির সাহায্যে কম্পনের আভাস পেতে চাইছে, যে কম্পন সঙ্কেত দিয়ে জানিয়ে দেবে শিকার এগিয়ে আসছে।

না চাইতেই অঢেল খাবার পেতে অভ্যস্ত সে, মুখের সামনে এসে ধরা দেয় শিকার। সারফেস থেকে এক হাজার ফুট নিচের ঠাণ্ডা পানিতে ছোট বড় সব আকৃতির প্রাণীই ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। খাবারের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে জানে না সে, কারণ এর আগে কখনই শিকারের কোন অভাব হয়নি। কোন পরিশ্রম বা চেষ্টা ছাড়াই নিজের বিশাল শরীরের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পেরেছে ওটা।

ওটার দক্ষতা খুন করায়, শিকার করায় নয়, কারণ শিকার করার কখনও প্রয়োজনই হয়নি।

কিন্তু কিছুদিন হলো জীবন ধারণের অভ্যস্ত ছকটা পাল্টে গেছে। খোরাক এখন পাওয়াই মুশকিল। যেহেতু যুক্তি বা কারণ বোঝে না, অতীত বা ভবিষ্যৎ বোঝে না, ক্ষুধাজনিত অপরিচিত অস্বস্তি দিশেহারা করে তুলেছে ওটাকে।

ওর প্রবৃত্তি ওকে শিকার করার প্ররোচনা দিচ্ছে।

সমুদ্রের প্রবাহে একটা ছন্দপতন লক্ষ করল ওটা, পানিতে কিসের যেন অনিয়মিত চাপ পড়ছে।

শিকার। অনেকগুলো। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

ওগুলো কাছে নয়, দূরে কোথাও রয়েছে, ওপরে কোথাও।

অতিকায় প্রাণীটা তার ম্যানটল্-এর পেশল কলার দিয়ে বিপুল পানি টানল, তারপর পেটের ফানেল থেকে সবেগে বের করে দিল; ফুল

স্পীডে ছুটন্ত একটা ট্রেনের মত ওপর দিকে উঠে আসছে বিশাল কাঠামো। সঙ্কেত লক্ষ্য করে ছুটছে, ফানেল থেকে থেমে থেমে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে আসছে পানি। সঙ্কেতের মর্ম এখন আরও স্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে পারছে—অনেক মাছ, অনেক বড় বড় মাছ। ওটার মাংসে রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হয়েছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে গায়ের রঙ।

যখন অনুভব করল যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে, ঘুরে গিয়ে শিকারের দিকে মুখ করল। প্রকাণ্ড চোখ দুটোয় ধরা পড়ল রূপালি ঝিলিক, চাবুকগুলো দিয়ে নাগাল পাবার চেষ্টা করল বিদ্যুৎবেগে। চাবুকের শেষ মাথা ক্রমশ-সরু মুগুরের মত, মাংসে চেপে বসল, দাঁত সদৃশ্য বৃত্তগুলো ছিঁড়ে আনছে মাংস, কাস্তে আকৃতির হুক প্রতিটি বৃত্তে খাড়া হয়ে আছে, ছিন্নভিন্ন করছে মাংসের টুকরোগুলোকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মাছটার অবশিষ্ট বলতে থাকল শুধু রক্ত আর ভাঙাচোরা হাড়।

অতিকায় দৈত্যের খিদে তবু মিটল না, বরং আরও বেড়ে গেল। আরও অনেক খাবার দরকার তার।

কিন্তু ওটার বিশাল কাঠামোর নড়াচড়ায় পানিতে বিপুল আলোড়ন উঠেছে, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে ব্লুফিন টুনার ঝাঁকটা। ফলে অনুসন্ধানরত চাবুকগুলো কিছু পেল না। শরীরের অপেক্ষাকৃত ছোট বাহুগুলো ধীরে ধীরে স্থির হলো, খোলা ঠোঁটের চোয়াল বন্ধ হলো, ফিরে গেল শরীরের গভীর ভাঁজে।

খিদেয় অস্থির, সেই সঙ্গে এখন ওটা ক্লান্তও বটে। এই মাত্র প্রচুর শক্তি ব্যয় হয়ে গেছে, অথচ শরীরের বিপুল চাহিদার তুলনায় খাবার পেয়েছে সামান্যই।

ভেসে বেড়াচ্ছে ওটা—ক্ষুধার্ত, দিশেহারা।

অনেক নিচে সাগরের তলায় উঁচু-নিচু পাহাড়ের মাথা, গভীর থেকে

উঠে আসা স্রোত ধীরে ধীরে ওটাকে ঢালের ওপর দিয়ে একটা মালভূমিতে ভাসিয়ে নিয়ে এল, সারফেস থেকে পাঁচশো ফুট নিচে। ঠাণ্ডা পানি এখানে ঘূর্ণি সৃষ্টি করছে, কাজেই আর ওপরে উঠল না।

আরেকটা ধাপে, সামনে, কিছুটা ওপরে, বড় আকারের কি যেন একটা আছে। অনুভূতি বলছে, জিনিসটা স্বাভাবিক কিছু নয়, যেন মরা। গ্রাহ্য করল না, অপেক্ষায় থাকল। হারানো শক্তি ফিরে পেতে চাইছে।

চার

না জানি আজ কি বিপদ আছে কপালে! পড়ো, বিপদে পড়ো, উচিত শিক্ষা হবে তোমার! ব্যাটা উল্লুক কোথাকার!

নিজের ওপর রেগে আছে ক্লাইটন হুপার, গালমন্দ করছে। এটা তার একটা বদঅভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, আগ বাড়িয়ে কিছু বলে বসা, তারপর অহঙ্কার আর লজ্জার কারণে পিছু হটতে না পারা। সে একজন জেলে, সৌখিন ট্যুরিস্টদের দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার কি দরকার ছিল! এই যে এখন সে ছেলে আর মেয়েটাকে গভীর সমুদ্রে ডুব দিতে নিয়ে যাচ্ছে, যদি কোন বিপদ হয়?

বেঈমানী করছে আসলে তার মুখ, আগে থেকে বোঝা যায় না কখন কি বেরিয়ে আসবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় হুপার, রোজ বিকেলে বারে যাওয়া বন্ধ করতে হবে তার।

এলি'স হারবার থেকে দূরে সরে এসে দক্ষিণ দিকে বোট ঘোরাল হুপার। ফ্লাইং ব্রিজ থেকে নিচে তাকিয়ে দেখল তার দুই আরোহী বোটের পিছনে দাঁড়িয়ে ডাইভিং গিয়ারে সজ্জিত হতে ব্যস্ত—কম্পাস, ছুরি, কমপিউটর, অক্টোপাস রেগুলেটর, বয়ান্সি ভেস্ট, স্টিল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা—কি না আছে ওদের সঙ্গে। ওরা তাকে বলেছে, দু'জনেই নাকি এক্সপার্ট ডাইভার, এমনকি অ্যাডভান্সড ওপেন-ওয়াটার কার্ডও দেখিয়েছে। কিন্তু হুপারের দৃষ্টিতে, অত সব আধুনিক মেশিন নিয়ে যারা আসে তারা ডাইভার নয়, শপার—এসব জিনিস কিনে আনন্দ পায়। সত্যিকার ডাইভাররা অল্প কয়েকটা জিনিস নিয়ে পানিতে নামে। বেদিং স্যুট দরকার, কোন মাছ যাতে টেসটিকেলে কামড় বসাতে না পারে। পানিতে পা দুটোই তোমার মোটর, কাজেই ওগুলোর জন্যে ফ্লিপার লাগবে। মাস্ক চাই সামনে কি আছে দেখার জন্যে। ট্যাঙ্ক দরকার বাতাস পাবার জন্যে। আর দরকার কয়েক পাউণ্ড সীসা, তোমাকে যাতে নিচে দাবিয়ে রাখে; একটা ডেপথ গজ, যদি তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়।

তাছাড়া, এই মেয়েটাকে দেখে তো মনে হয় কোন গিয়ারই তার দরকার নেই। হুপারের ধারণা, রুবির শরীরে এমন একজোড়া ফুসফুস আছে, এক নিঃশ্বাসে হাজার ফুট গভীরে নেমে যেতে পারবে সে। গিয়ার বরং তার সৌন্দর্য নষ্ট করে দেবে, ঢেকে দেবে তার তামাটে সোনালি চামড়া, লালচে-হলুদ একরাশ চুল। এই চুল প্রথমবার দেখে দম আটকে গিয়েছিল তার। সত্যি কথা বলতে কি, এমন নারীদেহ জীবনে বোধহয় কোনদিন কল্পনাও করেনি সে, দেখা তো দূরের কথা।

কিন্তু আজকাল যেমন দেখা যায়, ওরাও হাই-টেক পছন্দ করে। নিজেদের কাজ ইলেকট্রনিককে দিয়ে করিয়ে নিতে চায়। কমনসেন্স আর উপস্থিত বুদ্ধি অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরও হুপার আশা

করছে, ছেলেটা বা মেয়েটার মধ্যে খানিকটা হলেও কমনসেন্স আছে। তা না থাকলে, যেখানে ওরা যাচ্ছে, সেখান থেকে লাশ হয়ে ফেরারই সম্ভাবনা বেশি।

চিন্তাটা আবার রাগিয়ে দিল তাকে। তার এই মুখটা এবার সেলাই না করলেই নয় আর।

তার প্রথম ভুল ছিল ডি ডি পাব-এ যাওয়া। ফ্রন্ট স্ট্রীটের কোন ট্যুরিস্ট বারে কখনোই যায় না সে, ওখানে হুইস্কির দাম খুব বেশি রাখে। কিন্তু না গিয়েও পারেনি। সুন্দরী একটা মেয়ে মোটর বাইক থামিয়ে পথের দিশা জানতে চেয়েছিল তার কাছে। মেয়েটা কথার ছলে জানাল, ডি ডি পাবে রোজই যায় সে, ইচ্ছে করলে হুপার তার সঙ্গে ওখানে দেখা করতে পারে। কাজেই দাড়ি কামিয়ে, শার্ট পাল্টে যেতে হলো তাকে।

কিন্তু মেয়েটা আসেনি।

তার দ্বিতীয় ভুল হয়েছে, ওখানে বেশিক্ষণ থাকা। হুইস্কির পেছনে বিশ ডলার বেরিয়ে গেল। আর তৃতীয় ভুলটা হলো, যেখানে তার নাক গলানো উচিত নয় সেখানে ওটা গলিয়ে ফেলা। একজোড়া তরুণ-তরুণী নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে, তুমি তাদের চেনো না, কেন শুধু শুধু যেচে পড়ে কথা বলতে যাও!

মেয়েটাকে দেখামাত্র হুপারের মাথা ঘুরে যায়। তবে আজেবাজে কোন স্বপ্ন দেখেনি, কারণ মেয়েটার সঙ্গী ছেলেটাকেও ঈশ্বর সম্ভবত নিজের হাতেই বানিয়েছেন। দু'জনকে একসঙ্গে দেখে হুপারের ধারণা হয়, ওরা বোধহয় এক্সপেরিমেন্টাল জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর ফসল, কোন সায়েন্টিফিক ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়েছে, যে ল্যাবের কাজ হলো সুন্দর একটা জাতি পয়দা করা। দু'জনের চেহারায় এত মিল, ভাই-বোন বলে মনে হয়...।

পরে হুপার জেনেছে, ওরা তাই, যমজ ভাই-বোন। সবেমাত্র কলেজ থেকে বেরিয়েছে, মিড-ওশেন ক্লাবের পাশে বাবার কেনা বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছে। ওদের বাবা একজন ধনকুবের, মিডিয়া বিজনেসের এক সম্রাট।

পাবে বসে এক সেট ডিকমপ্রেশন টেব্‌ল নিয়ে আলোচনা করছিল ওরা। ওদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল হুপার। কাল পানির কত গভীরে নামবে, এই নিয়ে তর্ক বেধে গেল। ওদের এই তর্কই সতর্ক ও মনোযোগী করে তুলল তাকে। কারণ বারমুডার গভীর পানিতে কোন ট্যুরিস্ট কখনও নামে না। তাছাড়া, কোন সুস্থ মানুষ শখ করে কখনও ডীপ ডাইভিং-এর ঝুঁকি নেয় না।

এরপর ওদের আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। এর আগে যে-সব ডোবা জাহাজে পৌঁচেছে ওরা, সেগুলো কত গভীরে ছিল, জাহাজগুলোর নাম ইত্যাদি। সবগুলোই চেনে হুপার, কোনটাই চল্লিশ ফুটের নিচে নয়। এরপর ছেলেটা, বব, মন্তব্য করল, 'বোটের লোকটা বলছে, সবচেয়ে গভীর পানিতে রয়েছে পেলিনায়ন।'

'কোথায় সেটা?' জিজ্ঞেস করল রুবি। 'সে কি ওখানে আমাদের নিয়ে যাবে?'

পাশের টেবিল থেকে হুপার বলল, 'মাফ করবেন। জানি আমার কোন ব্যাপার না, তবু কথাটা না বলেও পারছি না: কেউ আপনাদেরকে বোকা বানাচ্ছে।'

'তাই?' চোখ বড় বড় করল রুবি। হুপারের মনে হলো, এরকম বিশাল চোখের পাতা জীবনে কখনও দেখেনি সে।

'হ্যাঁ। যদিও, আবার বলছি, আমার নাক গলানো উচিত নয়, তবে সন্দেহ নেই যে আপনাদেরকে ভুল তথ্য দিয়েছে কেউ।'

'আসল তথ্য তাহলে কোনটা?' জানতে চাইল বব। 'ডীপেস্ট

রেক?'

'বারমুডায় ডীপেস্ট শিপরেক হলো,' মৃদু হেসে বলল হুপার, 'অ্যাডমিরাল ডারহাম। সাউথ শোরের বাইরে সেটা। অত গভীরে আর কোন জাহাজ নেই।'

'কত গভীর?' ববের গলার আওয়াজই বলে দিল, হুপারের একটা শব্দও বিশ্বাস করছে না সে।

'প্রথমে ওটা একশো নব্বুই ফুট নেমে যায়, তারপর ঢাল বেয়ে গড়িয়ে প্রায় তিনশো ফুট নিচে গিয়ে থামে।'

'ওয়াউ!' চিৎকার করল রুবি।

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল বব। 'মাফ করো আমাকে!' তার গলায় স্পষ্ট ব্যঙ্গ।

ঠিক এই সময় পাব থেকে উঠে চলে আসা উচিত ছিল হুপারের।

কিন্তু রুবি হালকা একটা ঘুসি মারল ববের কাঁধে, বলল, 'বব! জীবনে অন্তত একবার মুখ বন্ধ করে শোনো কি বলা হচ্ছে।' তারমানে, মেয়েটার আগ্রহ আছে।

কাজেই বক বক করার লাইসেন্স পেয়ে-গেল হুপার। 'একটা ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে সাউথ শোর-এ গিয়ে পড়ে অ্যাডমিরাল ডারহাম। এক-দেড় দিন অচল অবস্থায় কাত হয়ে ছিল, এ-সময় তাকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এত বেশি ফুটো হয়ে গিয়েছিল, ভাল করে বেঁধে আটকাবার আগেই তলিয়ে যায়, নেমে যায় পাহাড় বেয়ে।'

'আপনি ওটাকে দেখেছেন? মানে, পানির তলায়?'

'একবার, অনেক বছর আগে। খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।'

'বলুন না, প্লীজ, কি রকম দেখতে ওটা?' প্রায় লাফ দিয়ে হুপারের টেবিলে চলে এল রুবি, খপ করে তার একটা বাহু আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাল।

মেয়েটার স্পর্শ পেয়ে নেচে উঠল হুপারের রক্ত। 'শুনলে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে। আমি ওটার নাম দিয়েছি উইডোমেকার। অনেকক্ষণ আপনি কিছু দেখতেই পাবেন না। তারপর হঠাৎ করেই গভীর পানিতে ঝুলতে দেখবেন। প্রথমে আপনার মনে হবে, গড, আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। কারণ আপনার মনে হবে বিশাল একটা আয়রন শিপ পাল তুলে সোজা আপনার দিকেই এগিয়ে আসছে। তারপর আপনি কি দেখবেন? আরও বিস্ময়কর একটা দৃশ্য অপেক্ষা করছে ওখানে আপনার জন্যে। জাহাজটার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকোমটিভ ট্রেনের প্রকাণ্ড একটা এঞ্জিন, খসে পড়েছে বো থেকে। ইতিমধ্যে মাথা আপনার ঘুরে গেছে, আর যে-ই মাত্র ওটা পরিষ্কার হতে শুরু করবে, অমনি দেখবেন ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। গভীর পানিতে আপনি পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারবেন না।'

'এ আমি বিশ্বাস করি না!' বলল বব।

আবার হুপারের হাত চেপে ধরল রুবি। বারটেণ্ডারকে ইঙ্গিতে ডেকে বিয়ারের অর্ডার দিল সে। 'আমি করি! কাজেই আপনাকে ছাড়ছি না।'

হুপার তখন ভাবছে, কোনভাবে যদি ছোকরাটাকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটাকে একা পাওয়া যায়! বিয়ার আসার পর রুবি বলল, 'এক্সকিউজ মি।' ববের হাত ধরে দূরে সরে গেল সে, পাবের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কি যেন আলাপ করল তিন-চার মিনিট। তারপর ফিরে এল ওরা, এরপর কথা যা বলার ববই বলল।

হুপার কি আবার অ্যাডমিরাল ডারহামকে খুঁজে বের করতে পারবেন?

তা পারা যাবে, বোটে যদি নতুন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি থাকে।

তাদের স্বার্থে হুপার কি একবার চেষ্টা করে দেখবেন? বারমুডায়

আসার পর ইতিমধ্যে সবই তাদের দেখা হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হবার আগে আর মাত্র একটা জিনিসই চাইছে তারা, সমুদ্রের গভীরে নেমে দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জন। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই নিউ ইয়র্ক থেকে ওদের মা-বাবা এসে পড়বেন।

হুপার বলল, সে খুব ব্যস্ত মানুষ, হাতে সময় নেই। মিছিমিছি একটা চার্টার পার্টির কথাও বলল। ওদেরকে তার ভাল লেগেছে, কিন্তু চার্টার পার্টিকে এখন ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়, বিশেষ করে অগ্রিম টাকা নেয়ার পর।

বব বলল, 'কত টাকা বলুন। চার্টার পার্টি যা দিচ্ছে আমরা আপনাকে তার দ্বিগুণ দেব।'

ঠিক হলো, পুরো একটা দিনের জন্যে দু'হাজার ডলার পাবে হুপার, তবে শিপরেক ওখানে থাকতে হবে। কিন্তু যদি জাহাজটাকে সে খুঁজে না পায়, খরচ হিসেবে মাত্র পাঁচশো ডলার পাবে।

এরপর হুপার জানতে চাইল, দুশো ফুট নিচে নামার মত দক্ষতা ওদের আছে তো? এত গভীরে আগে কখনও নেমেছে? বেণ্ড সম্পর্কে ওদের ধারণা আছে? গভীর পানিতে আরও যে-সব ঝামেলা পোহাতে হতে পারে, সে-সব সম্পর্কে সচেতন?

ভাই-বোন দু'জনেই হেসে উঠল। কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স সম্পর্কে সবই নাকি তাদের জানা। দুশো ফুট গভীরে অবশ্য নামেনি কখনও, তবে একশো ফুটের বেশি গভীরে কয়েকবারই নেমেছে।

'ঠিক আছে,' রাজি হলো হুপার। 'কিন্তু পানিতে শুধু আপনারা দু'জন নামবেন। আপনাদের সঙ্গে আমি নামতে পারব না। আমি নামলে জাহাজে কে থাকবে? আমার কোন হেলপার নেই।'

'তিনজন মানে তো ভিড়,' হেসে উঠে বলল বব। 'আমরা দু'জনই

নামব।'

এরপর আবার বিয়ারের অর্ডার দেয়া হলো। তারপর আবার। এক সময় হুপারের মনে হলো, রুবিকে প্রস্তাবটা এবার দেয়া যেতে পারে। চুপচাপ বেরিয়ে পড়লে হয় না, নিরিবিলি কোথাও বসে ডিনার খেতাম দু'জনে?

তার মুখের ওপর হাসল রুবি। কুৎসিত হাসি নয়, ওর হাসিতে প্রত্যাখ্যান ছিল না; মিষ্টি হাসিটাকে মাতৃসুলভ বলা যেতে পারে, যার ফলে রাগ করতে পারেনি সে। হেসে উঠে তার মাথার চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করে দেয় মেয়েটা, বলে কাল আবার দেখা হবে।

সাউথওয়েস্ট ব্রেকারকে অনেকটা দূর থেকে পাশ কাটাল হুপার। বাতাস খুব অল্পই বইছে, তবে সারফেসের ঠিক নিচে লুকিয়ে থাকা চূড়াগুলোর চারপাশে টগবগ করে ফুটছে পানি।

তাজা বাতাসে পরিষ্কার হয়ে গেছে হুপারের মাথা। মাছের যে আকাল দেখা দিয়েছে, দু'হাজার ডলার কামাতে দু'আড়াই মাস লেগে যেত তার। কাজেই এক দিনে এত টাকা কামাবার কাজটা নিয়ে বোকামি করেনি সে। তার দুশ্চিন্তা রুবি আর ববকে নিয়ে, ছেলেমানুষি করতে গিয়ে ওরা না কোন বিপদে পড়ে। কিন্তু না, ওদের নিয়ে উদ্বিগ্ন না হলেও বোধহয় চলে তার। ওরা যে নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক সেটা বেশ ভালই বোঝা যাচ্ছে ইকুইপমেন্টগুলো চেকিং রিচেকিং করতে দেখে। বিশেষ করে প্রতিটি হোস আর ফিটিং কয়েকবার করে পরীক্ষা করে নিচ্ছে ওরা।

ওদের চেহারা বলে দিচ্ছে, দু'জনেই খুব নার্ভাস। এটা একটা শুভ লক্ষণ। নার্ভাস থাকলে বাতাস খুব দ্রুত গ্রহণ করবে, ফলে সাগরের তলায় পৌঁছুতেই পারবে না। তবে সেটা তার মাথা ঘামানোর বিষয়

নয়।

আজকের আবহাওয়াটা বেশ ভাল। ভাগ্য বিরূপ না হলে আশা করা যায় লাঞ্চ খাবার জন্যে দুপুরেই বাড়ি ফিরতে পারবে সে। ওরা যদি অ্যাডমিরাল ডারহামকে দেখতে পায়, মানে যদি অভিযানে সফল হয়, ঘটনাটা ওদের জীবনে অক্ষয় একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। বলা যায় না, সাফল্যের আনন্দে তার প্রতি সদয় হলেও হতে পারে রুবি।

রীফ লাইন সাউথ শোর-এর কাছাকাছি। খানিক পর গভীর পানিতে চলে এল বোট। পরিচিত ল্যাণ্ডমার্ক খুঁজতে শুরু করল হুপার। সেগুলো একটা কাগজে লিখে এনেছে সে, যদিও তার কোন দরকার ছিল না। এই শিপরেক একবারই মাত্র দেখেছে সে, বছর দশেক আগে।

লাল একটা বাড়ি আছে, বাড়িটার পিছনে আছে এক জোড়া ঝাউ গাছ। দুই গাছের মাঝখানে যে ফাঁক, সেই ফাঁকের ঠিক মাঝখানে একটা বিন্দু কল্পনা করে তার নাক বরাবর একটা সরল রেখা টানতে হবে, একই সঙ্গে আঁকতে হবে একটা ত্রিভূজ, ত্রিভূজের অপর বিন্দুটা হবে পশ্চিম দিকের জিব'স হিল লাইট হাউস-এর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সাদা একটা বাড়ি।

স্রোত বইছে গভীর সাগরের দিকে, তাই খানিক দূর এগিয়ে বোট ঘুরিয়ে নিতে হলো হুপারকে, বো তাক করল তীরের দিকে, তারপর ধীর গতিতে এগিয়ে এসে ল্যাণ্ডমার্ক চিহ্নিত করল।

যদিও এরকম গভীরে শিপরেক থাকলে ল্যাণ্ডমার্ক ফুলপ্রুফ হয় না। পানির সারফেস থেকে ওটাকে তুমি দেখতে পাবে না, তারমানে ওটার কাছ থেকে সাঁতার দিয়ে উঠে এসে ল্যাণ্ডমার্ক চিহ্নিত করতে হবে তোমাকে, কিন্তু ইতিমধ্যে হয়তো তোমার বোট নোঙরের শেষ প্রান্তে চলে গেছে বা ঘুরে গেছে অন্য দিকে।

কাছাকাছি কোথাও আছে ভেবে খোঁজ করলে অ্যাডমিরাল

ডারহামকে পাওয়া যাবে না। নিচে আলো খুব কম, দৃষ্টিসীমা খুব বেশি হলে ত্রিশ কি চল্লিশ ফুট। হাতে সময় থাকে মাত্র পাঁচ মিনিট। সেকেণ্ড গোনা শুরু হয় পানির মাথা থেকে ডুব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক পাঁচ মিনিট পর সাগরের তলা ত্যাগ করতে হবে। তারমানে খোঁজাখুঁজি করার মত সময় পাওয়া যায় না। নিচে ডুবে থাকা জাহাজটায় নোঙর ফেলতে হবে হুপারকে। হুকটা ডেকে ফেলবে সে, তারপর একদিক থেকে আরেক দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যতক্ষণ না কোন রেইল বা কোন চেইনে আটকায় ওটা। ভাল হয় যদি ফোরডেকে পড়ে থাকা কমোড-এ আটকানো যায় হুকটা। ওটাতে বসে নিজের ছবি তুলেছিল সে।

ফিশ-ফাইণ্ডারের সুইচ অন করে ডেপথ সেট করল সে, তারপর হাত দিয়ে আড়াল করল স্ক্রীনটা। রিডআউটের রেখায় কিছুই দেখাচ্ছে না, সারফেস থেকে বটম পর্যন্ত পুরোটাই খালি। হুইল ঘোরাল সে, বোটটাকে পোর্টের দিকে দু'পয়েন্ট সরিয়ে আনল, তারপর আবার স্টারবোর্ডের দিকে দু'পয়েন্ট, আর তারপরই হঠাৎ স্ক্রীনে উদয় হলো ওটা। বিশাল একটা কাঠামো সাগরের তলা থেকে উঁচু হয়ে আছে।

বোটটাকে খানিক আগুপিছু করাল হুপার, কাঠামোটা যতক্ষণ না স্ক্রীনের ঠিক একেবারে মাঝখানে চলে এল। তারপর সুইচ টিপে নোঙর রিলিজ করল। মনের চোখ দিয়ে পানির তলায় নোঙরটাকে নেমে যেতে দেখল সে, আশা করল সরাসরি ইস্পাতের ডেকে গিয়ে বাড়ি খাবে।

প্রায় একটা জড়পদার্থে পরিণত হয়েছে জলদানব। ওটার শ্বাস-প্রশ্বাস—পানি গ্রহণ ও পরিত্যাগ—মন্থর হয়ে গেছে, প্রতি মিনিটে এখন পনেরো বার মাত্র। গায়ের রঙ এখন ধূসর মেটে। বাহু আর চাবুকগুলো ভেসে আছে আলগাভাবে, বিশাল সব সাপের মত।

শক্তি সঞ্চয় করছে ওটা, যেন ঠাণ্ডা আর নিস্তব্ধ অন্ধকার থেকে

খোরাক সংগ্রহ করছে।

হঠাৎ করে নিস্তব্ধতা ভাঙল শব্দের কম্পনে, কম্পনগুলো যেন ওপর থেকে ওটার অনুভূতিতে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল, লোনা পানি বাড়িয়ে দিল মাত্রা। মানুষের কানে শব্দগুলো ধাতব আর ভোঁতা লাগবে, নিরেট ইস্পাত ফাপা ইস্পাতের গায়ে সজোরে বাড়ি খেলো।

জলদানবের কাছে আওয়াজটা অচেনা, সতর্ক সঙ্কেত; ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল, মিনিটে ত্রিশবার। বাহুগুলো মোচড় খেয়ে কুণ্ডলী পাকাল, চাবুকগুলো হয়ে উঠল বাঁকা। রঙ বদলে গেল, ধীরে ধীরে বেগুনি আর লালচে হয়ে উঠছে।

আওয়াজটা ওপর থেকে আসছে, কাজেই ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল জলদানব। অস্বাভাবিক, মৃত একটা জিনিসের অস্তিত্ব আগেই অনুভব করতে পেরেছিল, সেটার দিকেই উঠছে।

আবার শুরু হলো শব্দটা, যেন কিছুর সাথে বাড়ি খাচ্ছে নিরেট ইস্পাত। তারপর থেমে গেল।

অস্বাভাবিক জিনিসটার দিকে এগিয়ে এল জলদানব, তারপর ঝুলে থাকল ওটার ওপর, শব্দের উৎস খুঁজছে। যে-কোন শব্দ, সাগরের স্বাভাবিক ছন্দে যে-কোন বিঘ্ন মানেই হলো শিকার। আর এই মুহূর্তে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে আছে ওটা।

বো-তে দাঁড়িয়ে নোঙরের রশি ছাড়ছে হুপার, পঞ্চাশ ফ্যাদম ছাড়ার পর আটকাল সেটা। রশিটা টান টান করে রাখলে নোঙরটা জাহাজ থেকে সরে যাবার ঝুঁকি আছে, আবার বেশি ঢিল দিলে অনেক বেশি দূরত্ব পেরোতে হবে ডাইভারদের, ফলে ওদের অক্সিজেনে টান পড়তে পারে।

জাহাজটা দেখার একটা সুযোগ ওদের পাওয়া উচিত, দু'হাজার

ডলার যখন প্রায় এসেই পড়েছে পকেটে। রশিটা জড়িয়ে রেখে বোটের সামনে চলে এল সে, চিৎকার করে বলল, 'ডাইভ, ডাইভ, ডাইভ!' রুবি আর ববের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

দু'জনকে দেখে কমিক বইয়ের হিরো আর হিরোইন মনে হচ্ছে। হলুদ আর নীল ওয়েটস্যুট পরেছে ওরা। পায়ের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছুরি, হাতলগুলো লাল, এত বড় যে গরু জবাই করা যাবে। ওদের ইটালিয়ান ফ্লিপারও এত লম্বা, দু'জনকে একজোড়া অতিকায় হাঁস বলে মনে হচ্ছে।

'আপনি নিশ্চিত তো, অ্যাডমিরাল ডারহামকে পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল বব।

'নিচে থেকে উঠে আসা আওয়াজটা শোনেননি আপনি? ইস্পাতের ডেকে ডং করে নোঙর পড়ল।'

হাসছে ওরা, বুঝতে পারছে না হুপারের কথা বিশ্বাস করবে কিনা। তাগাদা দিয়ে দু'জনকে স্টার্নে নিয়ে এল হুপার, দাঁড় করাল সুইম স্টেপ-এ। রুবির চেহারা একটু যেন ফ্যাকাসে দেখাল।

'আপনি সুস্থ তো?' জিজ্ঞেস করল হুপার, ওর একটা বাহু ধরল।

'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।'

'খারাপ লাগলে না নামলেও পারেন। এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই কিন্তু।'

'ধ্যেত, কি বলেন!' হেসে উঠল বব। 'ওর ভয় কি; আমি আছি না!' রুবির দিকে তাকাল হুপার। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'আপনাদের সিদ্ধান্ত, আমার কিছু বলার নেই।' হুপার সিরিয়াস হলো। 'কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। অ্যাংকার লাইনের কাছে পৌঁছুবেন সাঁতরে। ওটা ধরে প্রথমে সব কিছু চেক করে দেখে নেবেন, তারপর অপেক্ষা করবেন যতক্ষণ না পুরোপুরি শান্ত বোধ করেন। অস্থিরতা বা

উত্তেজনা থাকলে চলবে না। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো? এক হপ্তা লাগুক, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। যখন বুঝবেন মনটা একদম শান্ত, প্রথমে ডুব দেবেন একজন, তারপর অপরজন। আরেকটা কথা, সরাসরি নিচে নামবেন, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করবেন না। ভুলবেন না, সময় খুবই কম। হাতে যদি বেশি সময় থেকে যায়, সেটা ব্যয় করবেন আস্তে-ধীরে উঠে আসার কাজে।'

দু'জনেই একসঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। মাস্ক পরিষ্কার করে পরে নিল ওরা। ওদের হাতে ক্যামেরাগুলো ধরিয়ে দিল হুপার—ববকে ভিডিও ক্যামেরা, রুবিকে স্টিল ক্যামেরা। সব ঠিক আছে, এবার পানিতে নামবে ওরা।

'শুনুন,' বলল হুপার, মুখ তুলে তার দিকে তাকাল ওরা। 'শেষ একটা কথা। নিচে যদি কিছু থাকে, ভয় দেখাতে যাবেন না, কেমন?' হেসে উঠল সে, বোঝাতে চাইল কৌতুক করছে।

কিন্তু ওরা কেউ হাসল না।

পানিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল ওরা, তারপর নিজেদের ভেস্ট ফুলিয়ে নিল, চিৎ সাঁতার দিয়ে এগোল অ্যাংকার লাইনের দিকে।

বোটের সামনে চলে এল হুপার, নিচে তাকিয়ে দেখল অ্যাংকার লাইনের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। নিজেদের মধ্যে কথা বলল কিছুক্ষণ, তারপর মাউথপীস আটকাল মুখে। ভেস্ট থেকে বাতাস বের করে প্রথমে ডুব দিল বব, তারপর রুবি।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল হুপার। দশটা বেজে বাহান্ন মিনিট। এগারোটার মধ্যে হয় তার পকেটে দু'হাজার ডলার আসবে নয়তো এমন কিছু একটা ঘটবে যা নিয়ে ভাবতে চায় না সে।

অস্বাভাবিক, মৃত জিনিসটার ওপর দিয়ে দু'বার আসা-যাওয়া করল

জলদানব। শব্দের কম্পন থেমে গেছে, শিকারের অন্য কোন সঙ্কেতও আর আসছে না।

ওটার চোখে ধরা পড়ল ওপরে অস্পষ্ট আলো। এখানটায় পানি ততটা ঠাণ্ডা নয়, কাজেই অস্বাভাবিক জিনিসটার কাছ থেকে সরে এল, নেমে যেতে শুরু করল অন্ধকার গভীরে।

কিন্তু তারপরই অনুভূতিতে ধরা পড়ল নড়াচড়া। কিছু একটা কাছে চলে আসছে। শব্দের কম্পন থেকে বোঝা যাচ্ছে জ্যান্ত কিছু।

আবার অস্বাভাবিক জিনিসটার ওপর ফিরে এল জলদানব, প্রকাণ্ড শরীর বিশ্রাম নিচ্ছে ছায়ার ভেতর, অপেক্ষা করছে।

নড়াচড়ার কম্পন কাছে চলে আসছে, জ্যান্ত জিনিসের শ্বাস-প্রশ্বাস জোরালভাবে আঘাত করছে স্পর্শকাতর অনুভূতিতে। আবার বদলে যেতে শুরু করল জলদানবের রঙ।

হাত দিয়ে অ্যাংকার লাইন ধরে নিচে নামছে বব, ওয়েট বেল্টে আটকানো ভিডিও ক্যামেরা অনুসরণ করছে ওকে। অস্পষ্ট একটা ফাঁকার মধ্যে রয়েছে এই মুহূর্তে, নীল দিয়ে ঘেরা। এয়ার গজ চেক করার জন্যে থামল একবার। দুশো পঞ্চাশ পাউণ্ড—যথেষ্ট। তারপর চেক করল ডেপথ গজ। একশো বিশ ফুট। নিচে বিধ্বস্ত কোন জাহাজ চোখে পড়ল না, দেখা যাচ্ছে না সাগরের তলাও।

রোমহর্ষক, ভৌতিক একটা পরিবেশ; নিঃসঙ্গ লাগছে ওর। তবে আতঙ্ক বোধ করছে না, কারণ অ্যাংকার লাইন টান টান হয়ে আছে। নিচে যদি কোন শিপরেক থাকে, ভাল; আর যদি না থাকে, মন্দ কি, দু'হাজার ডলার তো বেঁচে যাবে।

কিন্তু রুবি কোথায়?

মুখ তুলল বব, অ্যাংকার লাইন অনুসরণ করে ওপর দিকে তাকাল।

অনেক দূরে রয়েছে রুবি, রশি ধরে পঞ্চাশ কি ষাট ফুট ওপরে ঝুলে আছে। সম্ভবত ভয় পাচ্ছে। কিংবা হয়তো কান দুটো বিরক্ত করছে।

রুবির জন্যে এই মুহূর্তে ওর কিছু করার নেই। অবশ্য যতক্ষণ সে ওর ওপরে থাকবে, তার কোন ভয় নেই। তার ওপর খেয়াল রাখবে হুপার।

মাস্ক থেকে খানিকটা শ্যাওলা সরাল বব, মাথাটা নিচের দিকে তাক করে পা ছুঁড়ল ঘন ঘন।

একশো ষাট ফুটে নেমে এসে জিনিসটা দেখতে পেল ও, সঙ্গে সঙ্গে আটকে গেল দম। ঠিক যেমন হুপার বর্ণনা করছিল—ভৌতিক একটা জাহাজ, পাল তুলে সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসছে যেন। আকারে এত বিশাল, কল্পনাকেও হার মানায়। স্টারবোর্ড বো-র পাশে, সাগরের তলায় পড়ে রয়েছে আহত একটা অতিকায় পোকার মত, লোকোমটিভ ট্রেনের এঞ্জিনটা, একচোখো একটা রাক্ষসের মত।

ফ্যানটাসটিক!

বেল্ট থেকে ভিডিও ক্যামেরা খোলার জন্য থামতে চাইল বব। আলোও জ্বালতে হবে। কিন্তু সবেগে পা ছুঁড়লেও, ফ্লিপার ব্লেডের সাহায্যে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও, উপলব্ধি করল নেমে যাচ্ছে নিচে। এই গভীরতায় ওজন বেশি হয়ে গেছে ওর। চাপ লাগায় কুঁকড়ে গেছে তার ওয়েটস্যুট, বয়াপি হারিয়ে ফেলেছে, ওর ওজনও খুব বেশি, দ্রুত নেমে যাচ্ছে। একটা বোতামে চাপ দিল, বাতাসে ভরাট হয়ে গেল ভেস্ট, ফলে পানির ভেতর প্রায় স্থির হয়ে এল শরীর। এয়ার গজ চেক করল। আঠারোশো পাউণ্ড। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার, মনে করিয়ে দিল নিজেকে।

এরপর ক্যামেরাটা জাহাজের বোর দিকে তাক করল বব, ট্রিগার টানল, ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল নিচে।

জিনিসটা যা-ই হোক না কেন, জ্যান্ত; তবে গতি খুব ধীর আর এলোমেলো।

নেমে আসছে।

জলদানব চাবুকগুলো বাঁকা করল, ঝাঁকাল টেইল ফিনগুলো। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ছায়া থেকে। এগোচ্ছে শিকারের দিকে।

জাহাজের বো-তে নেমে এল বব। এখনও দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে, হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, তবে গ্রাহ্য করছে না। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কি বিশাল আকৃতি!

পা বাধাবার জন্যে কিছু একটা পেয়েছে, নিজেকে স্থির করা দরকার। আরে, এ তো দেখা যাচ্ছে একটা টয়লেট, এত থাকতে ডেকের ওপর! ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডার মাস্কের সামনে তুলে আনল, গোটা দৃশ্যটা ফ্রেমে আটকাতে চাইছে।

ওর জগৎ খুদে একটা চৌকো ঘর হয়ে উঠল, ঘরটার এক কোণে সবুজ আলো, নিচে কিছু সংখ্যা।

অনুভব করল ওর চারদিকে পানির স্বাভাবিক প্রবাহে পরিবর্তন ঘটেছে, তবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। স্রোতের গতি কম-বেশি হতেই পারে। কিংবা হয়তো কাছাকাছি চলে আসছে রুবি।

ফ্রেমের ডান দিকের কোণে অস্পষ্ট ছায়া ছায়া একটা ভাব লক্ষ করল বব, মনে হলো সামান্য নড়ছে। ধরে নিল, চোখে রঙিন আলো লেগে থাকায় সামান্য দৃষ্টিভ্রম ঘটছে।

কি যেন একটা ছুঁলো ওকে। ঝাঁকি খেলো বব, ঘুরল, কিন্তু বেগুনি একটা ঝলক ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

আর তারপরই কি যেন পেঁচিয়ে ধরল ওর বুক। কষছে, চাপ দিচ্ছে।

ক্যামেরাটা ছেড়ে দিল বব, মোচড় খেয়ে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে চাপ। কার পাল্লায় পড়েছে জানে না, ওটা থেকে ধারাল কি যেন বেরিয়ে এসেছে, ছুরির ফলার মত। মট মট করে শব্দ হলো। ওর পাঁজর, শুকনো পাটখড়ির মত ভেঙে যাচ্ছে একটা একটা করে। মাস্কের ভেতর দিয়ে শেষ দৃশ্যটা দেখল বব—রক্তের বুদবুদ।

ওপরে বা নিচে, কোথাও কিছু দেখতে পাচ্ছে না রুবি। শান্ত থাকার চেষ্টা করছে ও, জানে ভয় পেলে বিপদ হবে। ববটা না…সব কিছুতেই শুধু তাড়াহুড়ো। ওর জন্যে কি একটু অপেক্ষা করতে পারত না? আগেই কথা হয়েছে, দু'জন ওরা একসঙ্গে নিচে যাবে। বোটম্যান হুপারের উপদেশ তারা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু না, ববের ধৈর্যে কুলায়নি। অস্থির, স্বার্থপর। চিরকাল একই রকম থেকে গেল ও।

এয়ার গজ চেক করল রুবি। এক হাজার পাঁচশো পাউণ্ড। তারপর ডেপথ্ গজ চেক করল। একশো দশ ফুট। নাহ্, জাহাজটা আর দেখা হলো না ওর। হাঁপাতে শুরু করেছে, দেখতে পাচ্ছে প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস। অনুভব করল চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাকে, চাপ লাগছে, বন্দিনী। ও এমনকি পানির ওপরও উঠতে পারবে না। আজ এখানেই তার মরণ!

শান্ত হও! নিজেকে ধমক দিল রুবি। সব ঠিক আছে। তুমি সুস্থ আছ।

অ্যাংকার লাইন জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করল রুবি, ধীরে ধীরে বড় করে শ্বাস নিতে বাধ্য করল নিজেকে। অক্সিজেন পাওয়ায় পরিষ্কার হয়ে গেল মাথা, ভয় কমল খানিকটা।

চোখ খুলে আবার এয়ার গজের দিকে তাকাল। এক হাজার চারশো পঞ্চাশ পাউণ্ড।

সিদ্ধান্ত নিল আরও পঞ্চাশ ফুট নামবে। অন্তত জাহাজটা তো দেখা দরকার, কাছাকাছি পৌঁছুতে না পারুক। পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত, তার বেশি নামবে না। ওখান থেকে জাহাজটা দেখে উঠে যাবে ওপরে।

রশি ধরে রেখেই নিজেকে খসে পড়তে দিল রুবি। একশো বিশ ফুট…একশো ত্রিশ ফুট…একশো চল্লিশ ফুট…কি ওটা? নিচে কি যেন একটা নড়ছে। কি যেন একটা উঠে আসছে ওর দিকে।

নিশ্চয়ই বব। বিধ্বস্ত জাহাজটা দেখা হয়ে গেছে ওর। ছবিও তুলেছে। নিজের শখ মিটেছে, আর চিন্তা কি। বুকভরা গর্ব নিয়ে উঠে আসছে এবার।

রুবির মনটা খারাপ হয়ে গেল। একই যাত্রায় পৃথক ফল। চিরকাল গল্পটা রসিয়ে রসিয়ে শোনাবে বব, জাহাজটার বর্ণনা দেবে, ব্যাখ্যা করবে ওটাকে দেখে কি অনুভূতি হয়েছিল। সবশেষে ওর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলবে, গভীর পানিতে ডুব দেয়া কোন মেয়ের কর্ম নয়, পুরুষদেরই মানায়।

রাগ হলো রুবির, তবে এ-ও বুঝল যে ওর কিছু করার নেই। তারপর হঠাৎ…

কি এগিয়ে আসছে ওটা? না তো, বব নয় তো! ওটার রঙ অমন বেগুনি কেন? হায় ঈশ্বর, কি ওটা! কি বিশাল একটা আকৃতি! এত বড়…নিশ্চয়ই জ্যান্ত কোন প্রাণী হওয়া সম্ভব নয়! তাহলে কি হতে পারে…।

রুবির শেষ অনুভূতি শুধুই বিস্ময়।

হাতঘড়ি দেখল হুপার। এগারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি। এখন

থেকে ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে পানির ওপর উঠে আসতে পারলে নিজেদের উপকার করবে ওরা। তা যদি না আসতে পারে, রেডিও অন করে খোঁজ নিতে হবে কাছাকাছি ডিকমপ্রেসন চেম্বার কোথায় আছে। কারণ জানা কথা বেণ্ড-এর শিকার হতে যাচ্ছে ওরা।

তবে জাহাজ পর্যন্ত নেমে না থাকলে তার প্রয়োজন হবে না। হয়তো ভয় পেয়ে একশো পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত নেমেছে, জাহাজটাকে দূর থেকে দেখেই খুশি। ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, পানির তলায় বড় জাহাজ দেখলে সবাই আতঙ্কবোধ করে।

ঘটেছেও বোধহয় তাই। সেক্ষেত্রে আরও পাঁচ মিনিট পানির তলায় থাকতে পারবে ওরা।

এগারোটা দুই।

বো-তে শুয়ে আছে হুপার, কপালে হাত রেখে রোদ ঠেকাচ্ছে, তাকিয়ে আছে অ্যাংকার লাইনের দিকে। আশা করছে যে-কোন মুহূর্তে চকচকে ওয়েটস্যুট দেখতে পাবে।

বোটের পিছন দিক থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। হায় ঈশ্বর! বোকারা অ্যাঙ্কার লাইন ধরে ওঠেনি, ভেসে উঠেছে ওটা থেকে অনেক দূরে। সম্ভবত অক্সিজেন শেষ হয়ে যাওয়ায় তাড়াহুড়ো করতে গেছে। এখন যদি ওদের শিরার ভেতর রক্ত জমাট বেঁধে না যায় তো ভাগ্য বলতে হবে।

কিংবা হয়তো দশ বা বিশ ফুট বাকি থাকতে থেমেছিল একবার, ডিকমপ্রেস করে নিয়েছে, তারপর বোটের তলায় উঠে এসেছে। নিশ্চয় তাই। পাগল আর কি!

কিন্তু ওদেরকে সে দেখতে পাচ্ছে না কেন? আওয়াজটা তো এখনও হচ্ছে। আর শব্দটা এরকম কেন? কেমন ভেজা ভেজা, পানি টানা বা শোষণ করার মত। অদ্ভুত ব্যাপার!

দাঁড়িয়ে পড়ল হুপার, বোটের পিছন দিকে এগোল।

কিসের যেন একটা গন্ধ ঢুকল তার নাকে।

অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়া? এখানে?

কেবিনের পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে হুপার, অকস্মাৎ তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে স্টারবোর্ডের দিকে খানিকটা ঘুরে গেল বোট।

যীশু! কি ব্যাপার!

এরপর কাঠ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পেল সে।

বোট কাত হয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না হুপার। লাফ দিয়ে ককপিটে ঢুকে পড়ল সে। জিন পোলটা অদৃশ্য হয়েছে, ডেক থেকে তিন ফুট ওপরে ভেঙে গেছে ওটা। উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে তাকাল সে। সামনের দৃশ্যটা পাথরে পরিণত করল তাকে, বুকের ভেতর যেন জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেল বাতাস।

একটা চোখ দেখতে পাচ্ছে হুপার। এত বড়, ঠিক যেন একটা চাঁদ। কিংবা বোধহয় আরও বড়। চোখটা রয়েছে কম্পনরত রক্ত-লাল আঠাল পদার্থের মাঝখানে।

হুপারের গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত খাড়া হয়ে গেল সে, চোখটার কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করল। ডানদিকে কাত হলো, এক পা ফেলল, এই সময় পানি ছেড়ে উঁচু হতে শুরু করল বোট। ঝাঁকি খেয়ে পিছন দিকে নিক্ষিপ্ত হলো সে। উইণ্ডস্ক্রীনের গায়ে পড়ল, সেখান থেকে বোটের বাইরে।

পাঁচ

ফুয়েল গজের দিকে তাকিয়ে টেডি ওয়াটারম্যান বুঝতে পারল, বেসে ফেরার জন্যে পনেরো কি বিশ মিনিটের মধ্যে হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিতে হবে তাকে।

দু'ঘণ্টা ধরে রুটিন পেট্রল-এ থাকলেও, আসলে আকাশ থেকে পানির তলায় শিপরেক খুঁজছে সে। দ্বীপটাকে ঘিরে চক্কর দিয়েছে, উত্তর আর উত্তর-পশ্চিমের রীফগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে এসেছে, আশা ছিল দু'একটা ব্যালাস্ট-এর স্তূপ দেখতে পাবে। পরিচিত শিপরেক ক্রিস্টোবাল কোলন আর সী উইচ দেখতে পেয়েছে, তবে নতুন কিছু চোখে পড়েনি।

শিপরেক কিভাবে খুঁজতে হয় জানা আছে ওয়াটারম্যানের, কিন্তু মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলার পর তার মনে হয়েছে সাগর সম্পর্কে এতদিন খুব কমই শিখেছে সে, যা শিখেছে তা হয় ভুল নয়তো অসম্পূর্ণ।

শিপরেক দেখতে কেমন হবে, সে-সম্পর্কে প্রচলিত একটা ধারণা আছে। সিধে হয়ে থাকবে জাহাজটা, পাল তোলা অবস্থায়, হ্যাট মাথায় বসে থাকবে কয়েকটা কঙ্কাল, জুয়া খেলতে বসা অবস্থায় মারা গেছে আরোহীরা। এই প্রচলিত ধারণা বাতিল করে দিয়ে ভদ্রলোক তাকে যা বলেছেন, মুখস্থ করে রেখেছে সে। পুরানো জাহাজগুলো ছিল কাঠের, বারমুডায় সেগুলোর বেশিরভাগই অগভীর পানিতে ডুবেছে। বিক্ষুব্ধ

সাগর ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে ওগুলোকে, আর শত শত বছর ধরে স্রোত ও পানির চাপ সাগরের মেঝের সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে টুকরোগুলোকে। তার ওপর জন্মেছে প্রবাল, আরোহীদের লাশ ঢাকা পড়ে গেছে চিরকালের জন্যে।

সাগরের তলায় শিপরেক খুঁজে পেতে হলে তিনটে লক্ষণের কথা মনে রাখতে হবে। একটা জাহাজ যখন ঝড়ের মধ্যে পড়ে রীফের ওপর দিয়ে যায়, রীফের মাথা অবশ্যই কিছুটা ভাঙবে, ভাঙবে ভঙ্গুর প্রবাল, ফলে কিছু চিহ্ন না থেকে পারে না। পানির সারফেস থেকে দুশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় চিহ্নগুলো দেখে মনে হবে ওখান দিয়ে যেন ট্রাকের অতিকায় চাকা পথ ধরে নিয়েছে।

তীক্ষ্ণ চোখে একটা বা দুটো কামানও ধরা পড়তে পারে। গায়ে প্রবাল আর শ্যাওলা জন্মেছে, তবে পানির ওপর থেকে দেখে মনে হবে মোটা আর সরল একটা রেখা। তবে কামান থাকলেই সব সময় কাছাকাছি পাওয়া যাবে জাহাজ, তা নয়। কারণ জাহাজ যখন ডুবে যাচ্ছে, ক্রুরা তখন সমস্ত ভারি জিনিস পানিতে ফেলে দেয়। এক জায়গায় হয়তো একটা কামান পাওয়া গেল, আরেক জায়গায় পাওয়া গেল একটা নোঙর, কিন্তু কোন জাহাজ পাওয়া গেল না—ঝড় আর তীব্র স্রোত হয়তো ওটাকে কয়েক মাইল দূর ঠেলে নিয়ে যাবার পর ডুবিয়ে দিয়েছে।

সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো—আকাশ থেকে দেখা গেলেও, সনাক্ত করা খুব কঠিন—ব্যালাস্ট স্তূপ। ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের যুক্তি হলো, জাহাজ যেখানে তার ব্যালাস্ট ফেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। হ্যাঁ, জাহাজের ডেক স্রোতের সঙ্গে ভেসে আরেক দিকে চলে যেতে পারে, তার সঙ্গে সমস্ত রিগিং-ও, কিন্তু জাহাজের প্রাণ ও আত্মা—কার্গো আর ট্রেজার—পড়ে থাকবে ব্যালাস্ট-এর সঙ্গে। আগেকার দিনে নাবিকরা সাধারণত

ব্যালাস্ট হিসেবে ব্যবহার করত পাথর। মসৃণ, গোল, ছোট পাথর, একজন মানুষ যাতে সহজেই তুলতে পারে। ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের কথা শোনার পর থেকে ওয়াটারম্যান গোলাকার পাথর খোঁজে, যেগুলো এক জায়গায় স্তূপ হয়ে আছে এক জোড়া গাঢ় রঙের কোরাল হেড-এর মাঝখানে সাদা বালির গহ্বরের ভেতর। ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের যুক্তি হলো, পুরানো একটা জাহাজ প্রথমে ধাক্কা খাবে কোরাল হেড-এর সঙ্গে, তারপর ওখানেই আটকে থাকবে যতক্ষণ আরেকটা জলোচ্ছ্বাস এসে ওখান থেকে ওটাকে নিচের বালিতে ফেলে না দেয়। ওই বালিতেই ঢাকা পড়বে জাহাজ।

এ-সব কথা শোনার পর থেকে যখনই হেলিকপ্টার নিয়ে টহল দিতে বেরোয়, লক্ষণগুলো খুঁজতে থাকে ওয়াটারম্যান। গত পনেরো দিনে দুটো ব্যালাস্ট স্তূপ পেয়েছে সে। তার মধ্যে একটা, ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের ধারণা, ষাট দশকের জাহাজ। দ্বিতীয়টা সাম্প্রতিক কালের। ঠিক হয়েছে, একদিন সময় করে ওগুলোয় তল্লাশি চালাবে ওরা।

ওয়াটারম্যানের আশা, তার বন্ধু বেলের জন্যে একদিন একটা ডোবা জাহাজ খুঁজে পাবে। খুব ভাল হয় যদি ষোলো শতকের স্প্যানিশ জাহাজ হয়। সোনার ইঁট আর অলঙ্কারে ভরা থাকবে ওটা, অমূল্য কিছু পাথরও পাওয়া যাবে। তবে এ-সব ছাড়া শুধু একটা পুরানো আর অনাবিষ্কৃত জাহাজ হলেও আপাতত চলে, কর্পূরের মত দ্রুত অদৃশ্য হতে থাকা বেলের উৎসাহ আর আশা ফিরিয়ে আনার জন্যে।

নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগছে ওয়াটারম্যানের। তার অনুমতি নিয়েই ভেলাটা উদ্ধার করেছিল বেল, আর এক্ষেত্রে অনুমতি দেয়া মানে ভেলাটার ওপর তার দাবি স্বীকার করে নেয়া। অথচ ড. কাইল ফ্যাদমের নির্দেশে পুলিস সেটা নিয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে দেন-দরবার করেছে সে, কিন্তু ক্যাপটেন স্টিফেন হান্টার পাল্টা যুক্তি

দেখিয়েছেন, গবেষণায় বা তদন্তে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কোন জিনিস বেল বা আর কাউকে দান করার অধিকার তার নেই। তারপর তিনি আধ ঘণ্টা লেকচার দিয়ে বুঝিয়েছেন, বিদেশী রাষ্ট্রে আমেরিকান সার্ভিসমেনদের আচরণ ঠিক কি রকম হওয়া উচিত।

এই মুহূর্তে এলবো বীচ থেকে খানিক দূরে সাউথ শোর-কে পাশ কাটাচ্ছে ওয়াটারম্যান। দেখল বেশ কিছু লোক সফেন ঢেউয়ের মাথায় খেলা করছে। সৈকত থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে কিছু স্নরকেলার, শিপরেক পলকশীল্ড খুঁজছে।

লোকগুলো হাঙরের টোপ হতে পারত, ভাবল ওয়াটারম্যান, আদৌ যদি হাঙর থাকত...।

পলকশীল্ড প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে একটা আতঙ্ক হয়ে আছে মানুষের মনে। লোহার তৈরি একটা স্টিমার, ভেতরে ঠাসা প্রথম মহাযুদ্ধের গোলা-বারুদ। বেশিরভাগ গোলা-বারুদ এখনও তাজা, তবে সেটা কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হলো লোহা। এলবো বীচ থেকে স্নরকেল নিয়ে শিপরেকটা দেখতে আসে লোকজন, স্রোতের টানে ছুটে এসে ধাক্কা খায় স্টিমারের সঙ্গে, ভেঙে যায় স্নরকেল; তীক্ষ্ণমুখ লোহার খোঁচা খেয়ে আহত হয় তারা। রক্তাক্ত অবস্থায় কয়েকশো গজ সাঁতার কেটে তীরে ফিরতে হয়। ফেরার সময় শান্ত, ঘোলাটে অগভীর পানির ওপর দিয়ে আসতে হয়। এককালে ওই জায়গা ছিল রীফ শার্কের দখলে।

পাঁচশো ফুট ওপর দিয়ে স্নরকেলারদের ঘিরে একবার চক্কর দিল ওয়াটারম্যান, নিশ্চিতভাবে জেনে নিল পানির তলায় গাঢ় কোন ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে না, তারপর রওনা হলো পশ্চিম দিকে।

হাতে সময় বেশি নেই, তবু পশ্চিম দিকটা একবার ঘুরে দেখে যেতে চায় সে। ইণ্ডিজ-এর সেভাইল-এ ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক অর্থাৎ মাসুদ রানার

এক বন্ধু আছেন, তিনি ওখানকার আর্কাইভে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন, উদ্দেশ্য: একটা স্প্যানিশ ফ্লীট সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ। পনেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে ডোমিনিকার কাছাকাছি ডুবে যায় ফ্লীটটা। সেই বন্ধুর কাছ থেকে মাসুদ রানা জানতে পেরেছেন, ঝাঁকের একটা জাহাজ অভিযানের প্রথম পর্বে বাকিগুলোর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, ডোবে বারমুডার দক্ষিণে এসে। উনি নিজেও বারমুডায় ছুটি কাটাতে আসার সময় সঙ্গে করে বেশ কিছু বই কিনে এনেছেন, সে-সব বইতেও নাকি এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্বীকৃতি আছে।

এতদিনের পুরানো জাহাজ খুঁজতে যাওয়া অন্ধকারে হাতড়ানোর মত, জানে ওয়াটারম্যান। তবু হাতে কোন কাজ নেই যখন...।

খানিক পর কো-পাইলট, লেফটেন্যান্ট জুনিয়ার গ্রেড মাইলস জানতে চাইল, 'এবার কোথায়?'

ইতিমধ্যে পশ্চিম দিকটা দেখা হয়ে গেছে, ওয়াটারম্যান বলল, 'কোন দিকে নয়, চলো ফিরে যাই।'

উত্তর-পুব দিকে ঘুরে যাচ্ছে হেলিকপ্টার, এই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও।

'ড্রাগন ওয়ান... কিণ্ডলে ...।'

'গো অ্যাহেড কিণ্ডলে।'

'এক জায়গা থেকে একটু ঘুরে আসবে নাকি, লেফটেন্যান্ট?'

'দশ মিনিটের বেশি লাগলে নয়। ফুয়েল শেষ। কি ব্যাপার?'

'এক ভদ্রমহিলা পুলিসকে ফোন করেছেন। বলছেন, সাউথ-ওয়েস্ট ব্রেকার থেকে এক মাইল দক্ষিণে তিনি একটা বোটকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখেছেন।'

'কি...টুকরো টুকরো হতে দেখেছেন? তারমানে কি বিস্ফোরিত হয়েছে?'

'না, সেটাই আশ্চর্য লাগছে। ভদ্রমহিলা বলছেন, চোখে টেলিস্কোপ নিয়ে তিমি দেখছিলেন তিনি। মাঝে মধ্যে তাঁর বাড়ি থেকে দু'একটা দেখা যায়। তখনই একটা ফিশিং বোট নজরে পড়ে। পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ ফুট লম্বা। তাকিয়ে আছেন, হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ওটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোন আগুন না, ধোঁয়া না, বিস্ফোরণের শব্দও না। স্রেফ ভেঙে গেল।'

'ধ্যেত, তাই কখনও হয় নাকি! ঠিক আছে, তবু একবার দেখছি,' বলল ওয়াটারম্যান। 'বেসে ফেরার পথেই তো পড়বে।'

স্টিকটা বাঁ দিকে ঠেলে দিল সে, দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেল হেলিকপ্টার।

মাইলস বলল, 'বেশি দেরি করলে আমি কিন্তু প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলব।'

'তলপেট শক্ত করে রাখো,' বলল ওয়াটারম্যান। 'দ্যাটস অ্যান অর্ডার।'

সাউথ-ওয়েস্ট ব্রেকারকে ডান দিকে রেখে এগোল সে, সূর্য যাতে মাথার ওপর আর তার খানিকটা পিছনে থাকে। পানির ওপর প্রতিফলিত হয়ে চোখে রোদ লাগছে না, ফলে পরিষ্কার দেখতে কোন অসুবিধে হলো না।

যদিও দেখার মত কিছু নেই।

দক্ষিণ দিকে দু'মিনিট উড়ে গেল সে, তারপর দক্ষিণ-পুব দিকে ঘুরল। কোথায় কি। না কিছু ভেসে আছে, না কেউ হাবুডুবু খাচ্ছে। দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো সাগর একদম পরিষ্কার।

'কিগুলে...ড্রাগন ওয়ান...,' রেডিওতে বলল সে। 'এবার আমাকে ফিরতে হয়। নিচে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'তাহলে ফিরে এসো, ড্রাগন ওয়ান। বোধহয় ফলস অ্যালার্ম।'

হেলিকপ্টার দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে নিল ওয়াটারম্যান।

'দেখুন দেখুন!' নিজের দিকের প্লেক্সিগ্লাসে টোকা দিল মাইলস, আঙুল তাক করে নিচেটা দেখাল।

বাঁ দিকে হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিচে তাকাল ওয়াটারম্যান। সাদা এক জোড়া রাবার ফেণ্ডার দেখল, তারপর কিছু কাঠের তক্তা, সবশেষে আধ-ডোবা কি যেন একটা...চিনতে পারল একটু পর, বোট কেবিনের গোটা একটা ছাদ। 'থাকার কোন উপায় নেই,' বলল সে। বেসের দিকে ঘুরে গেল।

রীফ পেরিয়ে এল হেলিকপ্টার, দেখল তীর ঘেঁষে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে সী কুইন। মাইক্রোফোনের 'টক' বাটনে চাপ দিল সে, বলল, 'সী কুইন...সী কুইন...সী কুইন...দিস ইজ ড্রাগন ওয়ান...।'

হুইলহাউসে বসে চা খাচ্ছে রানা, বোটের রেডিও জ্যান্ত হয়ে উঠল। হুক থেকে মাইক্রোফোন নামাল, বলল, 'সী কুইন...ড্রাগন ওয়ান।'

'শালাকে বলে দাও আমরা ব্যস্ত আছি,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল বেল।

'ভেলাটার ব্যাপারে ওকে তুমি দায়ী করতে পারো না,' বলল রানা। 'সে তো তোমার উপকার করতেই চেয়েছিল।'

'সী কুইন...ড্রাগন ওয়ান...,' বলল ওয়াটারম্যান। 'মি. রানা, আপনাদের ঠিক দু'মাইল সামনে একটা বোট ভেঙে গেছে। সৈকত থেকে দেড় মাইলটাক দূরে।'

'ভেঙে গেছে মানে?'

'বলতে পারছি না। সারফেসের তলায় এটা-সেটা ভাসতে দেখলাম। আমার ফুয়েল নেই, কেউ বেঁচে আছে কিনা খুঁজে দেখতে পারছি না। পুলিশের বোট এতক্ষণে হয়তো রওনা হয়ে গেছে, তবে কাছে আছেন আপনারাই।'

'ঠিক আছে, ওয়াটারম্যান। দেখছি আমরা।' যোগাযোগ কেটে দিতে গিয়ে থামল রানা, তারপর বলল, 'ওহে ওয়াটারম্যান, শনিবারে আমরা শিপরেক খুঁজতে বেরুব, তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকবে নাকি?'

উৎসাহ আর উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওয়াটারম্যানের। 'থাকব না মানে!'

মাইক্রোফোনটা হুকে রেখে দিয়ে বোটের গতি সামান্য বাড়াল রানা।

'টেডির কেস, তাই না?' হঠাৎ জানতে চাইল বেল, তার চেহারা থমথম করছে। 'ভেলাটা? টেডির কেসে নেভী কেন নাক গলাবে?'

'কেন আবার,' বলল রানা, 'নেভীকে নাক গলাতে বাধ্য করেছে তোমাদের ড. কাইল ফ্যাদম।'

রাগে ও ঘৃণায় গরম হয়ে উঠল বেলের মুখ। অ্যাকুয়েরিয়ামের নষ্ট গিয়ার ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিল সে, তার সঙ্গে রানাও ছিল। কি ঘটেছে, কিভাবে নষ্ট হলো নিজেরাই ভাল করে জানে না, তবু যতটুকু জানে বলার পর ডিরেক্টরকে পরামর্শ দেয় বেল, নতুন গিয়ার আরও উন্নতমানের হওয়া দরকার।

ডেপুটি ডিরেক্টর নার্ভাস টাইপের একজন কৃষ্ণকায়, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বেলকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'থাক, এ-সব শুনে আর লাভ কি।'

'লাভ কি মানে?'

'মানে...ইয়ে, আপনার সঙ্গে চুক্তিটা আমরা বাতিল করে দিচ্ছি।'

'কি! কেন?'

'ইয়ে...মানে...,' বেলের দিকে সরাসরি তাকাচ্ছেন না ডেপুটি ডিরেক্টর। '...এগুলো অত্যন্ত দামী ইকুইপমেন্ট, বুঝতেই পারছেন।'

'হাঙরও খুব বড় প্রাণী, বুঝতেই পারছেন,' চিৎকার শুরু করল

বেল। 'জেসাস, মি. বার্ড! আপনি যদি বলে দিতেন দশ ফুটের নিচে গিয়ার ফিট করা যাবে না, অবশ্যই ওগুলো অক্ষত থাকত! কিন্তু আপনি চেয়েছেন ওগুলো যেন গভীর পানিতে ফেলা হয়, যাতে বিরল কিছু ধরা পড়ে। কাজেই ঝুঁকি তো আপনাকে নিতেই হবে।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম, কিন্তু দুঃখিত, চুক্তিটা বাতিল হয়ে গেছে।'

'তাহলে বিরল প্রজাতির প্রাণী আপনাকে কে ধরে দেবে?'

'সে-ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি...।'

রানা তার হাত ধরে টান দিলেও, নড়ল না বেল। চোখ বুজল সে, বড় করে শ্বাস নিল, অর্থাৎ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। মাসে দু'হাজার ডলারের চুক্তি, অযৌক্তিকভাবে বাতিল করে দেয়া হচ্ছে।' তারপর চোখ খুলল সে, ডেপুটি ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস করল, 'এর পিছনে ড. কাইল ফ্যাদম আছে, তাই না, মি. বার্ড?'

চোখ ঘুরিয়ে নিলেন মাইকেল বার্ড, তাকালেন ফোনটার দিকে, মনে মনে যেন প্রার্থনা করছেন বেজে উঠুক ওটা। 'এ-ব্যাপারে আমি কোন...।'

'ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্ট। কাইল ফ্যাদম সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যাকুয়েরিয়ামের ব্যাপারেও নাক গলাবে, তাই না?'

'মি. বেল, আপনি কিছু না জেনেই ধরে নিচ্ছেন...।'

'তার উদ্দেশ্য আমি জানি। একটা ডিপ নেট নিয়ে যাবে সে, কিন্তু কিছু না পেয়ে ফিরে এসে বলবে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তেল ভেসে আসায় সব ভেস্তে গেছে। মাঝখান থেকে আপনারা কিছু পাবেন না, আমিও মাসিক দু'হাজার ডলার থেকে বঞ্চিত হব...।'

বেলের রাগ সম্পর্কে জানেন ডেপুটি ডিরেক্টর, ঘামতে শুরু করেছেন তিনি। 'ফর হেভেন'স সেক, মি. বেল...।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বেল বলল, 'এর সহজ সমাধান কি তা-ও আমি

জানি, মি. বার্ড। এখন যদি আমি কাইল ফ্যাদমের কাছে গিয়ে তার হাতে-পায়ে ধরি, চুক্তিটা বহাল থাকবে। ভেলাটা ভেঙেছি বলে আমার ওপর তার এই আক্রোশ।'

রানাও বুঝতে পারছে, বেলের ধারণাই ঠিক। ড. কাইল ফ্যাদম নিজের একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, বেলকে একজন বিদ্রোহী বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। হ্যাঁ, বেল আত্মসমর্পণ করলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

'কিন্তু না, আমি তার কাছে যাব না,' ডেপুটি ডিরেক্টরকে বলল বেল। 'তাকে বলে দেবেন, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করার লোক ন্যাট বেল নয়।'

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি রানা। তবে ফেরার পথে মনে মনে বেলের প্রশংসা না করে পারেনি। সৎ সাহস আর আত্মসম্মানবোধ না থাকলে কিসের মানুষ!

'ওদিকে,' বলল বেল, ভেসে থাকা একটা কাঠ দেখাল। পাঁচ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া, পেরেক দিয়ে গাঁথা খানিকটা কার্পেটও রয়েছে, দুই প্রস্থ খাটো চেইন ঝুলছে গা থেকে।

'সুইম স্টেপ,' বলল রানা। 'বোটে তোলো দেখি।'

বাইরে বেরিয়ে বোট হুক নিল বেল, সী কুইনের পিছন দিকে চলে গেল। মই বেয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে পড়ল রানা।

সারফেস থেকে বারো ফুট ওপরে রয়েছে ও, চারদিকে আবর্জনা দেখতে পাচ্ছে। কোনটা পানির এক ফুট নিচে, কোনটা বার বার ভেসে উঠছে। ফেণ্ডার, প্ল্যাঙ্ক, কুশন, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি।

পানিতে তেল ভাসছে, বোট ডোবার সময় এঞ্জিন থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'যা পাও সব তোলো বোটে,' বেলকে বলল রানা।

এক ঘণ্টা ধরে আবর্জনার ভেতর ঘোরাফেরা করল বোট। একটা একটা করে ধরে ওগুলো তুলল বেল, ছুঁড়ে দিল ককপিটে। 'ওটাও চাও?' জিজ্ঞেস করল সে, হাত বাড়িয়ে একটা জিনিস দেখাল। চৌকো একটা কাঠ, বারো ফুট চওড়া, পনেরো ফুট লম্বা, সারফেস থেকে এক কি দেড় ফুট নিচে ভাসছে।

'না, ওটা বোধহয় ছাদ,' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে বলল রানা। তারপর কি যেন চিন্তা করল। 'দাঁড়াও।' এঞ্জিন বন্ধ করল ও, স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে দিল বোটটাকে। মই বেয়ে নেমে এল নিচে। একটা রশি তুলে নিল, শেষ মাথায় চারটে কাঁটা লাগানো একটা হুক রয়েছে। হুকটা ছুঁড়ে দিল কাঠটার দিকে। তিন বার ছোঁড়ার পর কাঠের কিনারায় আটকাল সেটা। টান দিতে এগিয়ে এল, পানির ওপর ভেসে উঠল ছাদের একটা প্রান্ত। উল্টোপিঠটা সবুজ দেখাল।

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বেল।

'বোটটা ক্লাইটন হুপারের ছিল,' বলল রানা, কাঠ থেকে ছাড়িয়ে নিল হুক।

ভুরু কুঁচকে বেল জিজ্ঞেস করল, 'কি করে বুঝলে?'

'ক'দিন আগে বোটে রঙ লাগাতে দেখেছি তাকে। আমাকে বলল, কোত্থেকে যেন কয়েক টিন সবুজ রঙ সস্তায় পেয়ে গেছে...।'

'কিন্তু এখানে কি করছিল সে?'

'আমার চেয়ে ভাল চেন তুমি ওকে,' বলল রানা। 'সেদিনই তো বলছিলে, সহজে দু'পয়সা কামাবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না সে।'

ক্লাইটন হুপার আর তার সমস্যা একই, ভাবল বেল। বোটের খরচ তোলার জন্যে যথেষ্ট ফিশ ট্র্যাপ যোগাড় করার মত টাকাও হুপারের ছিল না কোনদিন। ট্র্যাপ নিষিদ্ধ করার পর প্রায় বেকার হয়ে যায় লোকটা।

টাকার জন্যে যে-কোন কাজ করতে রাজি সে, অথচ মাছ ধরা ছাড়া আর কোন কাজ তার জানা নেই। 'কিন্তু এখানে দু'পয়সা কিভাবে কামাবে সে? এখানে তো কিছুই নেই।'

'না, নেই,' একমত হলো রানা। 'শুধু ডারহাম রয়েছে।'

'ডারহামে কেউ নামে না··· অন্তত যার একটু সেন্স আছে।'

'এসো, নেড়েচেড়ে দেখা যাক,' বলল রানা। একটা রাবার ফেণ্ডার তুলে নিল ও। কোন দাগ বা আঁচড়, কিছুই নেই। পোড়েওনি।

'বোটটা কি বিস্ফোরিত হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল বেল। 'প্রোপেন স্টোভ?'

'কি জানি। না, সেরকম কিছু ঘটলে সেই সেন্ট জর্জ থেকে আওয়াজ শোনা যেত।' এক টুকরো কাঠ তুলে নিল রানা। কাঠের গায়ে পেতলের একটা স্ক্রু আঁটা রয়েছে।

'তাহলে কি ঘটতে পারে? হুপার কি বোটে বিস্ফোরক রেখেছিল?'

রানা বলল, 'কিছুই ফাটেনি।' কাঠের টুকরোটা শুঁকল ও। 'পোড়ার কোন দাগ নেই, ধোঁয়ার গন্ধ নেই।' টুকরোটা ডেকে ফেলে দিল ও।

'তাহলে?'

'যেভাবে হোক ভেঙে গেছে বোটটা···কিভাবে বলা মুশকিল।'

'কিন্তু এখানে এমন কিছু নেই যে ধাক্কা লেগে ভেঙে যেতে পারে একটা বোট।' বেল নাছোড়বান্দা।

'কিলার হোয়েল হতে পারে?' রানা উত্তর দিচ্ছে না, প্রশ্ন করছে। 'হুপারের বোটটা কাঠের। কাঠের একটা বোট কিলার হোয়েলের পক্ষে ভেঙে ফেলা সম্ভব।'

'কিলার হোয়েল? সৈকতের এত কাছে?'

রহস্যটা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে রানাকে, নিজেই কোন জবাব পাচ্ছে না। রেগে গেল ও, বলল, 'তাহলে তুমিই বলো, কি ঘটেছে? ইউএফও?

অন্য কোন গ্রহের বাসিন্দা?' প্রথমে কি দেখল ওরা? ট্র্যাপগুলো গায়েব হয়ে গেছে, আটচল্লিশ প্রস্থ তার দিয়ে বানানো কেবল কাটা। তারপর উদ্ধার করা ভেলায় পেল অ্যামোনিয়ার গন্ধ। ভেলা থেকেই পাওয়া পেল অদ্ভুত একটা জিনিস—দাঁতও হতে পারে, আবার কিছুর নখও হতে পারে, এরকম জিনিস আগে কখনও দেখেনি ওরা। আজ আবার দেখা যাচ্ছে ক্লাইটন হুপারের বোটটা টুকরো টুকরো হয়ে পানিতে ভাসছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মনে, বারমুডার সাগরে অদ্ভুত কোন প্রাণী চলে এসেছে নাকি? অদ্ভুত প্রাণী? কী অদ্ভুত প্রাণী?

রানা শুধু একা ভাবছে না, বেলও ভাবছে, এবং ভয় পাচ্ছে সে। রানার কাছ থেকে সন্তোষজনক কোন জবাব আসছে না দেখে অসহায় বোধ করল লোকটা, কষে লাথি মারল একটা লাইফ জ্যাকেটে।

তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল রানা, তা না হলে পানিতে পড়ে যেত ওটা। এক পাশে সেটা সরিয়ে রাখতে যাবে, হঠাৎ কি যেন দেখতে পেল। 'কি এটা?' জ্যাকেটের কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে, বেরিয়ে পড়েছে ভেতরের বয়্যান্ট মেটেরিয়াল। ওটার গায়ে দুটো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—এক জোড়া বৃত্ত, ডায়ামিটারে ছ'ইঞ্চি হবে। প্রতিটি বৃত্তের কিনারা এবড়োখেবড়ো, যেন কর্কশ ফাইল দিয়ে কাটা হয়েছে, মাঝখানে গভীর ক্ষত। 'বেল, ফর গড'স সেক, দেখে মনে হচ্ছে অক্টোপাসের কাণ্ড!'

বেল হেসে উঠল, বেসুরো শব্দে। 'অক্টোপাস? অক্টোপাসের বাহুতে আবার দাঁত থাকে নাকি?'

'না,' বিড়বিড় করল রানা। অক্টোপাসের বাহুতে যে সাকার বা শোষক থাকে সেটা নরম, যে-কোন মানুষ ব্যাণ্ডেজ খোলার মত সহজে বাহু থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু তাহলে জিনিসটা কি হতে পারে? কোনও প্রাণী, সন্দেহ নেই। বোটটা বিস্ফোরিত হয়নি, কোন

কিছুর সঙ্গে ধাক্কাও খায়নি, বজ্রপাতের শিকার নয়। কোন কারণ নেই, টুকরো টুকরো হয়ে গেল, এমন তো হতে পারে না।

লাইফ জ্যাকেটটা ডেকে ফেলে দিয়ে এটা-সেটা পা দিয়ে সরাল রানা। কাঠের একটা তক্তা ইস্পাতের বুলওয়ার্কে ধাক্কা খেলো, আবার ডেকে পড়ার সময় ওটা থেকে কি যেন একটা খসল।

একটা নখ বা দাঁত, আগেরটার মতই, কাস্তে আকৃতির—দু'ইঞ্চি লম্বা, ক্ষুরের মত ধারাল।

বোটের বাইরে, শান্ত পানির দিকে তাকাল রানা। যদিও সাগরকে ঠিক শান্ত বলা যায় না, একটা ঢেউ এসে উঁচু করে তুলল বোটকে। আবার যখন সোজা হলো বোট, ওটার তলা থেকে কি যেন একটা বেরিয়ে এল। রাবার, নীল, দু'ধারে হলুদ বর্ডার।

ওয়েটস্যুট হুড।

বোট হুকের সাহায্যে হুডটা পানি থেকে তুলে আনল রানা। একটা কাপের মত উঠে এল, পানিতে ভরা, সাঁতার কাটছে হলুদ ডোরাকাটা এক জোড়া মাছ—সার্জেন্ট মেজর। কি যেন খাচ্ছে ওরা।

হুডটা ধরে রয়েছে রানা। কিসের একটা গন্ধ ছুটছে ওটা থেকে। অ্যামোনিয়া?

হুডের ওপর ওর ছায়া পড়েছে, সূর্যের দিকে মুখ করল রানা। এবার হুডের ভেতর পানিতে রোদ পড়ল।

মাছগুলো কি খাচ্ছে? দেখে মনে হলো বড় একটা মার্বেল।

এগিয়ে এল বেল, রানার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। 'কি পেয়েছ যে এত মনোযোগ দিয়ে দেখছ?' পরমুহূর্তে শিউরে উঠল। 'হোলি সুইট জেসাস!' হাঁপিয়ে উঠল। 'ওটা কি মানুষের···?' শেষ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে সাগরে বমি করার

জায়গা করে দিল বেলকে।

টেলিস্কোপে চোখ রেখে তাকিয়ে আছেন তো আছেনই। মহিলার ঘাড় ব্যথা করছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। ইউএস নেভীর হেলিকপ্টারকে আসতে এবং চলে যেতে দেখলেন তিনি, দেখলেন ন্যাট বেলের অগোছাল বোট সী কুইন উদয় হলো। কিন্তু পুলিস কোথায়? ঘটনাটা রিপোর্ট করে তিনি তাঁর নাগরিক দায়িত্ব পালন করেছেন, এবার পুলিসকে তৎপর হতে হবে।

সী কুইনে বেল ছাড়াও একজন ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক রয়েছেন। ভদ্রলোককে তাঁর মত বারমুডার অনেকেই ইতিমধ্যে চিনে ফেলেছেন। শ্বেতাঙ্গ নন, সেটাই বোধহয় কারণ। দূর থেকে বেলকেও চিনতে পারলেন তিনি। বোটের কিনারায় ঝুঁকে সম্ভবত বমি করছে। নিশ্চয়ই হ্যাঙ্গওভারের শিকার। মাছ শিকারীরা সবাই এক রকম—সারাদিন মাছ ধরবে, রাত কাটাবে মদ খেয়ে।

পুলিস যদি তৎপর না হয়, তাঁর বোধহয় খবরের কাগজে রিপোর্ট করা উচিত। মাঝে মধ্যে পুলিসের চেয়ে সাংবাদিকরাই বেশি দায়িত্বসচেতনতার পরিচয় দেন। আরও আগে খবরের কাগজের অফিসে ফোন করেননি তিনি একটা মাত্র কারণে। মনে আশঙ্কা ছিল হয়তো তাঁর প্রিয় তিমিগুলোই বোটটাকে ভেঙে ফেলেছে। না বুঝে, কিংবা খেয়াল বশত। সাংবাদিকরা তো এত সব তলিয়ে দেখবেন না, তাঁরা হয়তো তিমির বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাই লিখে বসবেন। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাকিয়েও কোথাও কোন তিমি দেখতে পাননি তিনি। কাজেই এখন নির্ভয়ে খবরের কাগজে ফোন করতে পারেন।

এক হাতে ফোনের রিসিভার, অপর হাত দিয়ে দেরাজ থেকে নোটপ্যাড

বের করল তরুণ রিপোর্টার, মনে মনে ধন্যবাদ দিল নিজের ভাগ্যকে। গত এক ঘণ্টা ধরে এই ভদ্রমহিলাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল সে, নিউজরূমের পুলিস ব্যাণ্ড রেডিওতে খবরটা শোনার পর থেকে। কিন্তু হারবার রেডিও মহিলার নাম জানাতে রাজি হয়নি।

বারমুডার সাগরে রহস্যময় মৃত্যু, নিঃসন্দেহে ডিনামাইট বিশেষ। রঙ মাখিয়ে ভালভাবে পরিবেশন করতে পারলে প্রথম সারির সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে সে। গত তিন বছর ধরে কাগজে কাজ করছে, কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি করার মত কোন রিপোর্ট আজও দিতে পারেনি। বিতর্কিত ফিশ ট্র্যাপ নিয়ে কত আর লেখা যায়। বারমুডাকে নিয়ে সমস্যা হলো, অনেকদিন হলো এখানে কিছু ঘটছে না, অন্তত এমন কিছু ঘটছে না যা টেলিভিশন নেটওঅর্ক বা নিউজ ম্যাগাজিন লুফে নেবে।

তবে এটা অন্যরকম। এর সঙ্গে হয়তো বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গেলও জুড়ে দেয়া যেতে পারে। তা যদি দেয়া যায়, ব্যস, কেল্লা ফতে। পাঠকরা একেবারে গ্রোগ্রাসে গিলবে।

মহিলার ঠিকানা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল সে, হোটেল গোল্ডেন ইন-এ যাবার জন্যে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এই সময় মহিলা নিজেই টেলিফোন করলেন। হোটেল গোল্ডেন ইনে ক'দিন আগে এক ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার, নাম মাসুদ রানা। হোটেলের বুক-স্টল থেকে বই কিনছিলেন ভদ্রলোক, সে-ই যেচে পড়ে আলাপ করে। আটলান্টিক, আটলান্টিকের আজব প্রাণী, এ-সব বই বাছছিলেন তিনি, দেখে তার কৌতূহল জাগে। কথা বলে, ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরন দেখে, বিস্মিত হয় সে। ভদ্রলোক তাকে পরিষ্কার করে কিছু বলেননি, তবে আভাসে যেন বলতে চাইলেন বারমুডায় আবার কিছু একটা, ভীতিকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। সে-

সময় তেমন গুরুত্ব দেয়নি সে, ধরে নিয়েছিল ভদ্রলোক কল্পনাপ্রবণ, এটা-সেটা কি সব দেখে একটা বিপদ আসছে বলে আন্দাজ করছেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক বোধহয় নিরেট কিছু জানেন, কাজেই তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

ফোনের রিসিভারে সে বলল, 'রিপ উইনচেস্টার, মিসেস হপকিন্স। ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ।'

কয়েক মিনিট অপরপ্রান্তের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল সে, তারপর জানতে চাইল, 'আপনি ঠিক জানেন, বোটটা বিস্ফোরিত হয়নি?'

আবার কয়েক মিনিট কথা বলে গেলেন মহিলা। তাঁর কথা শেষ হবার পর দেখা গেল তরুণ সাংবাদিক চার পৃষ্ঠা নোট নিয়েছে। যদিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগই তিমি সম্পর্কে মজার মজার তথ্যে ঠাসা।

তবে, যতই বক বক করুন মহিলা, মূল্যবান কিছু শব্দও তিনি উচ্চারণ করেছেন। সে লক্ষ করল, একটা শব্দ বেশ কয়েকবার লিখেছে সে। শব্দটা হলো—জলদানব।

ছয়

নোভা স্কটিয়ায় শীত-গ্রীষ্মে তেমন কোন পার্থক্য নেই, শীতকালে শুধু গাছে পাতা থাকে না। তুষার ঝড় বইছে, দেখে মনে হতে পারে এখানে এখন শীত। ডক্টর আলফ্রেড ফেরেল ডাক-বাক্স থেকে প্যাকেটগুলো

সংগ্রহ করলেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন নিজের অফিসে। আবহাওয়ার যা অবস্থা, আজও তাঁর জগিং করতে যাওয়া হবে না। এভাবে দিনের পর দিন ঘরে বসে সময় কাটালে, শরীরে মরচে না ধরে যায়। সিদ্ধান্ত নিলেন, কাল তুষার ঝড় হোক বা না হোক, ঠিকই দু'মাইল দৌড়ে আসবেন। পঞ্চাশ বছর বয়েসে সত্তর বছরের বুড়ো হতে চান না তিনি।

এই বিরূপ আবহাওয়ার কারণে আজ তাঁর ছাত্ররাও সবাই পড়তে আসেনি। সেফালোপড-এর ওপর লেকচার দিলেন তিনি, শুনল মাত্র ছ'জন ছাত্র। সবাই উপস্থিত থাকলেও যে খুব খুশি হতেন তিনি, তা নয়। ছাত্র হিসেবে সবাই ওরা বাজে। ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেবে, কিন্তু বিজ্ঞানে ভাল নয় বলে অনুমতি দেয়া হয়নি, কিছু শেখাবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁর কাছে। ওদেরকে বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলার জন্যে সাধ্যমত সব চেষ্টাই চালাচ্ছেন তিনি, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না। আবহাওয়া খারাপ বলে বেশিরভাগ ছাত্র তাঁর লেকচার শুনতে আসেনি, এ থেকেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। সেফালোপড সম্পর্কে দুনিয়ার প্রথম শ্রেণীর একজন বিশেষজ্ঞ বিস্ময়কর হেড-ফুটস প্রাণী সম্পর্কে ওদেরকে কৌতূহলী করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন, এরচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে। তবে এই ব্যর্থতার জন্য তিনিই বোধহয় দায়ী। শিক্ষক হিসেবে তিনি অসহিষ্ণু, উপদেশ দেয়ার চেয়ে চাক্ষুষ দেখাতে পছন্দ করেন, বলার চেয়ে করে দেখাতে ভালবাসেন। শিক্ষা সফরে চলো, জাদু দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষা সফরের আয়োজন খুব কম হয়, পশ্চিমা দুনিয়া শিক্ষার চেয়ে বিলাস ব্যসনে খরচ করতে বেশি ভালবাসে।

ড. আলফ্রেড ফেরেলের অফিস কামরায় একটা ডেস্ক, একটা চেয়ার, রিডিং ল্যাম্প, বুক-কেস আর রেডিও ছাড়া কিছু নেই।

একদিকের পুরোটা দেয়াল জুড়ে পৃথিবীর মানচিত্র। মানচিত্রের গায়ে রঙিন পিন গাঁথা আছে অনেকগুলো, প্রতিটি পিন ম্যালাকোলজি সংক্রান্ত কোন না কোন ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করছে। কোথাও কেউ অভিযানে গেলে, তাঁর কাছে খবর আসে; কেউ কোথাও বিরল প্রজাতির কিছু দেখতে পেলে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করেন তিনি। যেমন লাল ঢেউ, কবে কোথায় দেখা গেছে মানচিত্রের দিকে একবার তাকালেই বলে দিতে পারবেন। উল্টোদিকের দেয়ালে রয়েছে ফ্রেমে বাঁধানো অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট, পুরস্কার, পদক, তাঁর মত অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ফটোগ্রাফ, অক্টোপাস থেকে শুরু করে স্কুইড আর কিলার তিমির ছবি।

দরজার পিছনে হ্যাট আর কোট ঝুলিয়ে রেখে রেডিওটা অন করলেন আলফ্রেড ফেরেল, চায়ের পানি গরম করার জন্যে ইলেকট্রিক কেটলির প্লাগ ঢোকালেন সকেটে, তারপর প্যাকেট খুলে বের করলেন দা বোস্টন গ্লোব-এর একটা কপি। এই একটা পত্রিকাই নিয়মিত পান তিনি।

নোভা স্কটিয়ার মত দুর্গম এলাকায় একজন ম্যালাকোলজিস্টকে উত্তেজিত করতে পারে এমন কোন খবর কাগজটায় নেই।

চা খেলেন তিনি। চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছেন, কোলের ওপর পড়ে রয়েছে কাগজটা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ঝট করে খুলে গেল চোখ দুটো। কোলের ওপর পত্রিকা, পত্রিকায় হাজার হাজার শব্দ। তার মধ্যে একটা শব্দ...একটা শব্দ কি? শব্দটা তিনি দেখেছেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে অন্যমনস্ক ছিলেন বলে গুরুত্ব দেননি। সত্যি কি দেখেছেন, নাকি ধারণা করছেন দেখেছেন? সত্যি না দেখলে শব্দটা তিনি জানলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই দেখেছেন, এবং তা এই পত্রিকাতেই।

জলদানব।

জলদানব সম্পর্কে কি?

পত্রিকার প্রথম পাতার সবগুলো খবরে আবার চোখ বুলালেন তিনি। পেলেন, পৃষ্ঠার একেবারে শেষ কোণে, নিচের দিকে। কাগজটা চোখের সামনে তুলে এনে পড়তে শুরু করলেন ড. ফেরেল।

বারমুডায় আবার রহস্যময় ঘটনা

তিনজন নিহত। দু'জন নিখোঁজ

বারমুডা (এপি)—আটলান্টিক সমুদ্রের এই দ্বীপ কলোনিতে কাল এক বোটডুবিতে তিন ব্যক্তি মারা গেছেন। বোটডুবির কারণ অজ্ঞাত ও রহস্যময়। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মিডিয়া ম্যাগনেট জেরি হ্যাসটনের এক ছেলে ও এক মেয়ে।

বিস্ফোরণ বা আগুন ধরার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, এমন কি বোটটা যেখানে ডুবেছে সেখানে কোন জলমগ্ন চূড়ার অস্তিত্বও নেই। তবে স্থানীয় কিছু লোক বলাবলি করছে, বোটটা সম্ভবত বজ্রপাতের শিকার হয়েছিল, যদিও গতকাল এলাকায় কোন মেঘ দেখা যায়নি। আবার অনেকে বলছে, ঘটনাটার সঙ্গে বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গেল রহস্য জড়িত, বোটটা ডোবার পিছনে দায়ী আসলে একটা জলদানব। সূত্র বলতে পুলিস শুধু কাঠের তক্তায় কিছু আঁচড়ের দাগ দেখতে পেয়েছে, আর কিছু আবর্জনা থেকে পাওয়া গেছে অ্যামোনিয়ার গন্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কয়েকদিন আগে বিলি ম্যাক এবং তাঁর স্ত্রী লুসি বারমুডার কাছাকাছি নিখোঁজ হয়েছেন...।'

দম বন্ধ করলেন ফেরেল, খবরটা আরেকবার পড়লেন, তারপর আবার। চেয়ার ছেড়ে ওয়াল ম্যাপের সামনে চলে এলেন তিনি, শুধু লাল পিনগুলো খুঁজছেন।

মাত্র দুটো লাল পিন পাওয়া গেল, দুটোই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে, সময় লেখা আছে উনিশ শো ষাট সাল। বারমুডার কাছাকাছি কিছুই

নেই।

এতদিন ছিল না, এখন আছে।

বোঝাই যাচ্ছে, রিপোর্টার জানেই না কি নিয়ে লিখছে সে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে, জোড়া লাগিয়েছে সেগুলো, উপলব্ধি করেনি নিজের অজ্ঞাতে একটা রহস্যময় ধাঁধার চাবি তৈরি করে ফেলেছে।

অ্যামোনিয়া। সেই চাবি হলো অ্যামোনিয়া। আবিষ্কারের উত্তেজনা বোধ করছেন ড. ফেরেল, যেন হঠাৎ করে তিনি একটা নতুন প্রজাতি দেখতে পেয়েছেন।

না, নতুন কোন প্রজাতি নয়। ওটা আসলে ড. ফেরেলের একটা সাধনা। তাঁর রহস্যময় শিকার, কোনমতে ধরা দেবে না। এই অদ্ভুত প্রাণীর খোঁজে তিনি তাঁর পেশাগত জীবনের বিরাট একটা সময় ব্যয় করেছেন। এই প্রাণী সম্পর্কে বই লিখেছেন—একটা নয়, কয়েকটা।

পত্রিকা থেকে খবরটা ছিঁড়ে নিয়ে আবার একবার পড়লেন তিনি। 'এ কি সত্যি?' বিড়বিড় করছেন আপন মনে। 'হে দয়াময় ঈশ্বর, এ যেন সত্যি হয়। উফ্, এত বছর পর। হ্যাঁ, সময়ও তো হয়েছে!'

এ সত্যি না হয়ে যায় না। ওটা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বেশি দূরেও নয়, মাত্র এক হাজার মাইল। প্লেনে দু'ঘণ্টার পথ। তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছে ওটা।

কিন্তু যত তাড়াতাড়ি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, তত তাড়াতাড়িই আবার হতাশ হয়ে পড়লেন। বারমুডায় যেতে হবে তাঁকে, কিন্তু কিভাবে? দানবটাকে মারা চলবে না, জ্যান্ত ধরতে হবে, কিন্তু লোকজনকে তিনি ঠেকাবেন কিভাবে? ওটাকে ধরতে হলে সাহসী লোক দরকার, সার্চ পার্টি গঠন করতে হবে, সেজন্যে প্রচুর টাকা লাগবে—কোথায় পাবেন? ইউনিভার্সিটি আজকাল এ-সবের পিছনে

টাকা খরচ করে না। তাঁর নিজের কাছে কোন টাকা নেই, এমন কোন আত্মীয় বা বন্ধুও নেই যে ধার পাবেন। তাহলে?

এই সুযোগ হারালে দুঃখেই মারা যাবেন তিনি। শুধু তাই নয়, সুযোগটা হারালে মানুষ মনে করবে সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট অ্যাকাডেমিক ফ্রড তিনি, অন্য মানুষের সংগ্রহ করা তথ্য মুখস্থ বলে খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছেন।

সমাধানটা সহজ—টাকা। দুনিয়ায় আর যা কিছুর অভাব থাকুক, টাকার কোন অভাব নেই। বলা যায় টাকার পাহাড় আছে। সেই পাহাড় থেকে সামান্য কিছু কিভাবে হাতে পাওয়া যায়?

রেডিওটা খোলা, বিরক্ত করছে। গান হচ্ছে, ঘুম পাড়ানি গান। আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা···

দম বন্ধ করলেন ড. ফেরেল। ছেলেমেয়ে! পেয়েছেন, পেয়ে গেছেন তিনি। পকেট থেকে পত্রিকার ছেঁড়া কাগজটা বের করলেন, ডেস্কের ওপর রেখে পড়লেন, 'জেরি হ্যাসটন···মিডিয়া ম্যাগনেট জেরি হ্যাসটন।'

টেলিফোনের রিসিভার তুললেন ড. ফেরেল, নিউ ইয়র্ক সিটির 'ডাইরেক্টরি অ্যাসিস্ট্যান্স' চাইলেন অপারেটরের কাছে।

অফিসে বসে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের রিপোর্ট পড়ছেন জেরি হ্যাসটন। ভাল একটা খবর। অর্থনৈতিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, লোকজন এখন আর সাত ডলার দিয়ে সিনেমা বা পঞ্চাশ ডলার দিয়ে থিয়েটার দেখতে ইচ্ছুক নয়। তারা এখন সস্তায় আমোদ-ফূর্তি করতে চায়, যেটা তিনি দিতে পারছেন—কেবল টেলিভিশন। সেজন্যেই বেশিরভাগ বড় ব্যবসায়ীর মত ব্যাংকে তাঁর কোন লোন নেই। বিপদ যে একটা আসছে, তা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল নব্বুই দশকে

সে-ই রাজা হবে যার কাছে নগদ টাকা থাকবে। সাতাশি-অষ্টাশি সালেই তিনি তাঁর বেশিরভাগ অলাভজনক কোম্পানি বিক্রি করে দেন, আঁকড়ে ধরেন কেবল টেলিভিশনকে। ফলে তাঁর হাতে এখন নগদ এত বেশি টাকা রয়েছে, সদ্য স্বাধীন একটা রাষ্ট্রেরও বোধহয় তা নেই।

তো কি হলো? টাকা কি তাঁর ছেলেমেয়েকে ফিরিয়ে আনবে? টাকা কি তাঁর স্ত্রীকে আবার সুস্থ করে তুলবে? পরিবার যে তাঁর কতখানি জুড়ে, হারাবার আগে সেটা উপলব্ধি করতে পারেননি। টাকা কি একটা পরিবারকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারে?

টাকা থাকলে এমন কি প্রতিশোধ নেয়াও যায় না। অথচ প্রতিশোধ নিতে পারলে আর কিছু চাইতেন না তিনি। রুবি আর ববের বাবা তিনি ছিলেন বটে, তবে দূরত্বটা ছিল বড় বেশি। বলা যায়, এটাই তাঁর পাপ। ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি হতে পারেননি। সেই পাপমোচনের জন্যে হলেও প্রতিশোধ নেয়া দরকার তাঁর।

এভাবে মারা না গিয়ে তাঁর ছেলেমেয়েরা যদি কারও হাতে খুন হত, অনায়াসে প্রতিশোধ নিতে পারতেন তিনি। হয় নিজের হাতে মারতেন লোকটাকে, নয়তো ভাড়াটে খুনীর সাহায্য নিতেন। কিন্তু প্রতিশোধ নেবেন কি, তাঁর তো এমন কি এ-ও জানা নেই যে রুবি আর ববের মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী। তিনি জানেন না, কেউ জানে না। দুর্ঘটনা? তাই কি?

রিপোর্টটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন হ্যাসটন, চেয়ারে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে সেন্ট্রাল পার্কে তাকালেন। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে ফিফথ এভিনিউ। দৃশ্যটা তাঁর ভাল লাগে, কিংবা বলা যায়, এক সময় ভাল লাগত। এখন আর গ্রাহ্য করেন না।

ডেস্কের ইন্টারকম বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ

দিলেন তিনি। 'কেন বিরক্ত করছ, হেলেনা! তোমাকে না আমি বলেছি...।'

'মি. হ্যাসটন, ব্যাপারটা ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে...।'

'তাদের সম্পর্কে আবার কি?' বলার পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেন হ্যাসটন, গলা নামিয়ে বললেন, 'তারা মারা গেছে, হেলেনা।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে আছে প্রাইভেট সেক্রেটারি, ঢোক গিলছে। তারপর সে বলল, 'ইয়েস, স্যার। কিন্তু এখানে একজন ক্যানাডিয়ান বিজ্ঞানী ফোন করেছেন...।'

'কে?'

'এক ভদ্রলোক, বলছেন যে তিনি জানেন ওদের মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী।'

হঠাৎ শীত অনুভব করলেন হ্যাসটন। কথা বলতে পারছেন না।

'মি. হ্যাসটন...?'

ফোনের রিসিভার তোলার জন্যে হাত বাড়ালেন হ্যাসটন, লক্ষ করলেন হাতটা কাঁপছে।

ঝাঁকটার সঙ্গে সাগরের সারফেসে বিশ্রাম নিল মা ও শিশু। ইতিমধ্যে পশ্চিমে অস্ত গেছে সূর্য, পুবে সরু এক ফালি চাঁদও উঠেছে।

এখানে রোজই তারা মিলিত হয়, পূরণ হয় সামাজিকভাবে মেলামেশার প্রয়োজন। দিনের বেলা যেখানে বা যত দূরেই থাকুক, সন্ধে হলেই একত্রিত হয় ঝাঁকটা, আহার গ্রহণ বা প্রসব করার জন্যে নয়, শুধুই একত্রিত হবার আনন্দ উপভোগের জন্যে।

অতীতে, ঝাঁকের মধ্যে যার বয়েস সবচেয়ে বেশি তার মনে আছে, সংখ্যায় তারা ছিল অনেক। সংখ্যা নিয়ে তাদের মনে কোন প্রশ্ন জাগে

না, কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকৃতির মস্তিষ্কের অধিকারী এই তিমিরা বিনা প্রশ্নে সবকিছু মেনে নেয়। সংখ্যায় কমে গেছে, এটা তারা মেনে নিয়েছে, মেনে নেবে ঝাঁকটা আরও ছোট হয়ে গেলেও।

তবে এই সফিসটিকেটেড ব্রেন, প্রাণীকুলে যে ব্রেনের তুলনা নেই, ক্ষতি বা লোকসান বুঝতে পারে; বিষণ্ন হতে জানে, পারে অনুভব করতে। আর যতই মেনে নিক, বিলাপ করে তারা।

এই মুহূর্তে, অন্ধকার যখন গাঢ় হচ্ছে, ঝাঁকটা ভেঙে গেল। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে তারা—একটা, একজোড়া, তিনটে করে। মাথার ওপর দিয়ে শ্বাস টানল তারা, বিশাল ফুসফুস ভরে নিল, তারপর ডুব দিল অন্ধকারে। উত্তর দিকটা টানে তাদেরকে, যায়ও সেদিকে। কয়েক মাস পর গ্রহের ছন্দে একটা পরিবর্তন দেখা দেবে, তখন আবার দক্ষিণে এগোবে তারা।

মা আর শিশু এক সঙ্গে ডুব দিল। কয়েক মাস আগে এভাবে ডুব দেয়া সম্ভব ছিল না। আরও ছোট ছিল শিশু, ফুসফুস তখনও যথেষ্ট বড় হয়নি, গভীর পানিতে এক ঘণ্টা মেয়াদী ডুব দেয়ার সাধ্য তার ছিল না। তবে শিশুর বয়েস এখন দু'বছর পুরো হয়েছে, লম্বায় এখন সে পঁচিশ ফুট, ওজন বিশ টনেরও বেশি। তার নিচের চোয়ালের দাঁতগুলো এখন চোখা, কামড়ে ধরে ছেঁড়ার কাজ করতে পারে। শিশু এখন আর অসহায় বা নির্ভরশীল নয়, এখন সে জ্যান্ত শিকার ধরে খেতে পারবে।

কালো পানিতে ডুব দিয়ে নেমে যাবার সময় ভোঁতা কপাল থেকে সোনার ইমপালস্ পাঠাচ্ছে তারা, ফিরে আসবে শিকারের সঙ্কেত নিয়ে।

অন্ধকারে ঝুলে আছে জলদানব। কিছুই করছে না, কিছুই আশা করছে না, ভয়ও পাচ্ছে না; গা ছেড়ে দিয়ে শুধু ভেসে চলেছে স্রোতের সঙ্গে। ওটার বাহু আর চাবুক শিথিলভাবে ভাসছে, সাপের মত; ফিনগুলো প্রায়

নড়ছেই না, তবে অন্ধকার গভীরে ঝুলে থাকতে সাহায্য করছে ঠিকমতই।

হঠাৎ করে একটা আঘাত পেল জলদানব, তারপর আরেকটা। আঘাতটা শুধুই অনুভবে, তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। বাহুগুলো গুটিয়ে নিল, কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল চাবুকগুলো।

আসছে জলদানবের শত্রুরা।

ফিরে আসা সোনার সঙ্কেত নিয়ে এল—শিকার। লেজের ধাক্কায় নিচের দিকে গতি আরও দ্রুত করল মা, শিশুর কাছ থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছে।

মায়ের সঙ্গে থাকার জন্যে গতি বাড়াল শিশুও, যদিও জরুরী কোন তাগাদা অনুভব করল না। অতি দ্রুত অক্সিজেন হজম করছে তার ফুসফুস।

শিকারের উপস্থিতি পরিষ্কার জানা গেছে, শিকার পালিয়েও যাচ্ছে না, তবু বারবার সোনার মিসাইল পাঠাল মায়ের ব্রেন, কারণ তার ইচ্ছে এই পরিণত শিকারকেই প্রথম হত্যা করুক শিশু। শিকারটা খুব বড় বটে, তবে ইতিমধ্যে সোনার মিসাইলের আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করা শিশুর জন্যে কঠিন হবে না।

শক্ত, আড়ষ্ট, সাবধান হয়ে গেছে জলদানব। ভেতরের কেমিক্যাল ট্রিগারে টান পড়ল; শরীর থেকে বেরিয়ে এল আলোর একটা আভা। দেহ-গহবরের ভেতর খুলে গেল একটা থলি, কালো পানিতে ছড়িয়ে পড়ল কালো রঙের মেঘ।

একের পর এক আঘাত অনুভব করছে জলদানব, প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর, খুদে মস্তিষ্কে দিশেহারা ভাব জাগছে। আত্মরক্ষার প্রবণতা আক্রমণের প্রবণতায় পরিণত হলো। হামলা করার

জন্যে রুখে দাঁড়াল ওটা।

শিকারের কাছাকাছি এসে গতি কমাল মা, শিশুকে পাশে আসার সুযোগ করে দিল, তারপর উৎসাহ দিল পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার। এবার একসঙ্গে অনেকগুলো সোনার মিসাইল ছুঁড়ল সে, তারপর দিক বদলে শিকারকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল।

নিচের দিকে ঝাঁপ দিল শিশু, হত্যা করার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় ভয়ানক উত্তেজিত, লক্ষ লক্ষ বছরের অভিজ্ঞতার ছাপ মুদ্রিত রয়েছে তার ব্রেনে, উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

মুখ খুলল শিশু।

প্রেশার ওয়েভ অনুভব করল জলদানব, সেটার সঙ্গে পিছিয়ে এল খানিকটা। প্রায় গায়ের ওপর উঠে এসেছে শত্রু।

চাবুক দিয়ে ছোঁ মারল। শুধু আছাড় খেলো, কোন কিছুর স্পর্শ পেল না, তারপর আঘাত করল মাংসে—শক্ত আর পিচ্ছিল। আপনা থেকেই চাবুকগুলো ঘিরে ফেলল ওটাকে, মাংসের গায়ে এঁটে বসল বৃত্তগুলো, বৃত্তের মাঝখানের হুকগুলো ডেবে গেল ভেতরে।

চাবুকগুলোর পেশীতে টান পড়ল, শিশুকে নিজের দিকে টেনে নিল জলদানব।

খোলা মুখ বন্ধ করল শিশু, কিন্তু মুখের ভেতর কিছু পেল না। হতভম্ব হয়ে পড়ল সে। কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে। মাথার পিছনে চাপ অনুভব করল, আটকে ফেলছে তাকে, থামিয়ে দিচ্ছে নড়াচড়া।

ধস্তাধস্তি শুরু করল শিশু, লেজ দিয়ে বাড়ি মারল ঘন ঘন, শরীরটা মুচড়ে আর কুঁকড়ে ছাড়াবার চেষ্টা করল নিজেকে। ইতিমধ্যে তার

ফুসফুস চাহিদার কথা জানিয়ে সঙ্কেত পাঠাতে শুরু করেছে।

চক্কর দিচ্ছে মা, সতর্ক; বুঝতে পারছে বিপদে পড়েছে তার বাচ্চা, অথচ সাহায্য করার সামর্থ্য নেই। আক্রমণ করতে জানে সে, জানে আত্মরক্ষা করতে, কিন্তু তার ব্রেন এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যে অন্য কেউ হুমকির সম্মুখীন হলে সাড়া দেয়ার কোড নেই সেখানে, এমন কি নিজের সন্তানকে রক্ষা করার বেলায়ও। চেঁচামেচি করল সে—তীক্ষ্ণ, বেপরোয়া, ব্যর্থ চিৎকার।

আঁকড়ে ধরে ঝুলে রয়েছে জলদানব, গেঁথে ফেলেছে শত্রুকে। শত্রু মোচড় দিচ্ছে, তার এই নড়াচড়া থেকে জলদানব বুঝতে পারল যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেছে। শত্রু এখন আর আক্রমণকারী নয়, পালাবার চেষ্টা করছে।

আলোর অনুপস্থিতিতে এখানে যদিও কোন রঙ নেই, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবার বদলে গেল জলদানবের গায়ের রঙ। এই রঙ শুধু ফোটে যখন ওটা আক্রমণে যায়।

শত্রু যতই ধস্তাধস্তি করল, শরীরে ততই পানি ভরে ছাড়তে শুরু করল জলদানব, শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত সাগরের অতল গভীরে নেমে যাচ্ছে।

শিশু ডুবে মারা যাচ্ছে। অক্সিজেনের অভাবে টিস্যুগুলোর পেশী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এক এক করে। অচেনা এক যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল ফুসফুসে। মারা যেতে শুরু করল তার ব্রেন।

ধীরে ধীরে থেমে গেল শিশুর ধস্তাধস্তি।

জলদানব অনুভব করল, শত্রু নড়াচড়া করছে না, নিজে থেকেই খসে পড়ছে নিচে। মাংস খামচে ধরে ছিল, ধীরে ধীরে ঢিল দিল বাহু আর চাবুকে। শত্রুর সঙ্গে নেমে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে বাহু আর চাবুকগুলো। তারপর জোড়া চাবুকের সাহায্যে ছিঁড়ে নিল এক তাল চর্বি, ধরিয়ে দিল বাহুতে, বাহুগুলো তুলে দিল হাঁ করে থাকা ঠোঁটে।

এখনও চক্কর দিচ্ছে মা, নিজের শিশুর উদ্দেশে সোনার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। হতাশাব্যঞ্জক কত রকম আওয়াজই না করল, তারপর করুণ শিস বাজিয়ে নিজের অসহায়ত্বও প্রকাশ করল। এক সময় তার ফুসফুসও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। শেষে একসঙ্গে অনেকগুলো সোনিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল, যেখানে জীবন ধারণের জন্যে অক্সিজেন আছে।

সাত

রোদে পুড়ে যাচ্ছে গা, তবু সৈকত ছেড়ে নড়ছে না রানা। সকাল ন'টা, এরইমধ্যে অসংখ্য পিকনিক পার্টি এসে পাম গাছগুলোর ছায়া দখল করে নিয়েছে। সৈকতে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা, পানিতেও সাঁতার কাটছে বহু নারী-পুরুষ। যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও

বেমানান কিছু চোখে পড়ে না। সবাই নিরুদ্বিগ্ন, হাসিখুশি। পরিবেশ পুরোপুরি স্বাভাবিক।

খুব সকালে নাস্তা খেয়েই চলে এসেছে রানা। কেন এসেছে নিজেও ঠিক বলতে পারবে না। আজ শনিবার, কথা ছিল ওয়াটারম্যানকে নিয়ে শিপরেক খুঁজতে যাবে ওরা। কিন্তু কাল রাতে বেল সিদ্ধান্ত নেয়, বোটের কিছু কিছু জায়গায় রঙ লাগাবে সে। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি রানার; কয়েকটা বই নাড়াচাড়া করতেই রাত দুটো বেজে যায়, তারপর শুয়েও ঘণ্টা দুয়েক চোখের পাতা এক করতে পারেনি, আবার ছ'টা বাজতে না বাজতে ভেঙে গেছে ঘুম। সৈকতে আসার পথে বেল আর ওয়াটারম্যানকে দেখে এসেছে ও, বোটে রঙ লাগাচ্ছে ওরা। শিপরেক খুঁজতে যাবে বলে আজ ছুটি নিয়েছে ওয়াটারম্যান।

একের পর এক বেশ কয়েকটা লক্ষণ দেখে চিন্তিত হয়ে উঠেছে রানা। ভয় ভয় লাগছে ওর। ভয়ঙ্কর কি যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে বারমুডায়। কিন্তু কি?

কাল রাতে কয়েকটা বই উল্টেপাল্টে দেখে ভয়টা আরও বেড়েছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, এখানকার লোকজনকে এখুনি সাবধান করার দরকার। কিন্তু কি বলবে ও? বিপদের কথা বললেই তো আর মানুষ শুনবে না, প্রমাণ দেখাতে হবে। একটা বা দুটো নখ, দু'একটা আঁচড়ের দাগ, অ্যামোনিয়ার গন্ধ, মানুষের একটা চোখ, এগুলো প্রমাণ বটে, তবে যথেষ্ট নয়—কারণ এগুলো অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাছাড়া, নিজেই যেখানে বিপদের স্বরূপ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানে না, লোককে বোঝাবে কিভাবে? এমনকি শুধু প্রমাণও যথেষ্ট নয়, সেগুলো কার কাছ থেকে আসছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার মানুষ ক'জন ওকে চেনে, ওর কথা বিশ্বাস করবে কেন?

কাজেই প্রথমে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে, তারপর উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সাবধান করতে হবে মানুষজনকে। ঠিক সচেতনভাবে এ-সব চিন্তা করেনি রানা, তবে এরকম একটা মনোভাব নিয়েই আজ সকালে সৈকতে চলে এসেছে ও।

দুটো মেয়ের ওপর চোখ আটকে গেল রানার। আমেরিকান ট্যুরিস্ট, দেখেই বোঝা যায়। সুশ্রী চেহারা, অসম্ভব লম্বা; শুধু বিকিনি ব্রিফ পরে থাকায় ভারি আকর্ষণীয় লাগছে। একজনের চুল লাল, পরিপাটি; দ্বিতীয় মেয়েটার গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মাথায় একরাশ এলোমেলো কালো চুল। সৈকতে ওর পরে এসেছে ওরা, কিছুক্ষণ ওর পাশে বসেও ছিল। যেচে পড়ে ওর সঙ্গে দু'চারটে কথাও বলেছে। হ্যামিলটনের কোন রেস্তোরাঁ গলা কাটে না? সাগরে নামা নিরাপদ তো, হাঙর-টাঙর নেই? রেস্তোরাঁর নাম বলার পর রানা জানিয়েছে, সাগরকে কখনোই নিরাপদ বলে মনে করতে নেই। ওর কথা শুনে হেসেছে মেয়ে দুটো। তাহলে এত মানুষ যে পানিতে সাঁতার কাটছে! রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দেয়নি ওরা, পরস্পরকে ধাওয়া করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পানিতে।

মেয়েগুলোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে একজন উইণ্ড-সার্ফারের দিকে তাকাল রানা। সৈকত থেকে একশো গজ দূরে পালে বাতাস পাবার চেষ্টা করছে লোকটা। বাতাস নেই, ফলে পিছন দিকে ঢলে পড়ছে সে, সেইলটা নেমে এসে ঢেকে দিচ্ছে তাকে।

রানা ভাবল, পানি ওখানে কতটা গভীর? ক্লাইটন হুপারের বোট যেই ভাঙুক, ডাইভারদের মৃত্যুর জন্যে যে বা যা-ই দায়ী হোক, গভীর জলের বাসিন্দা সে।

না, ও সাবধান করলেও কেউ শুনবে বলে মনে হয় না। আশ্চর্যই বলতে হবে, বারমুডায় কেউই ভয় পায়নি। মহিলা যা দেখেছেন সব বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়েছে কাগজে। বারবার একটা বিশেষ শব্দ

ব্যবহার করেছেন তিনি—জলদানব। অথচ মানুষ আজও সৈকতে এসে দলে দলে পানিতে নামছে—সাঁতার কাটছে, সেইলিং করছে, উইণ্ডসার্ফিং করছে।

অজ্ঞতাই বোধহয় আতঙ্কিত না হবার কারণ। কেউ জানে না ঠিক কি ধরনের বিপদ ওত পেতে আছে পানিতে। তবে ওটা হাঙর বা তিমি না হলে বিশ্বাসযোগ্য গুজব ছড়ানোও কঠিন। জলদানব বলে ভয় দেখানো সম্ভব নয়, কারণ এর আগে বহুবার জলদানবের ভয় বারমুডার লোকজনকে দেখানো হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে সেসব।

বিপদটা কি হতে পারে, মনে মনে কিছুটা ধারণা করতে পারছে রানা। কিন্তু সে-কথা এখুনি কাউকে বলতে ইচ্ছে করছে না ওর। আগে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে ওকে।

সৈকতের ওপর আবার চোখ বুলাল রানা। সৈকতে বা পানিতে, কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। উঠে দাঁড়াল ও, পা বাড়াল কনসেশন স্ট্যাণ্ডের দিকে। গাছপালার ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, এই সময় কি মনে করে ঘাড় ফেরাতে সেই আমেরিকান মেয়ে দুটোর ওপর চোখ পড়ল। সৈকত থেকে ত্রিশ কি চল্লিশ গজ দূরে রয়েছে ওরা, ওকে থামতে দেখে হাত নাড়ল। পানিতে স্থির হয়ে রয়েছে দু'জনই, সাঁতার কাটছে না। দুটো মাথার মাঝখানে তিন কি চার ফুট ব্যবধান। হাসছে ওরা, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তারপর আবার রানার দিকে ফিরে হাত নাড়ল। হাতছানি দিচ্ছে, তারমানে ডাকছে ওকে।

ধীর পায়ে সৈকতের কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা। ওদের হাত নাড়ার উত্তরে সে-ও একবার হাত নাড়ল।

তারপর হঠাৎ একটা মেয়ে পানির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অপর মেয়েটা এখন হাত নাড়ছে, গলা ছেড়ে ডাকছে রানাকে। না, ডাকছে

না, উপলব্ধি করল রানা। চিৎকার করছে।

'ও মাই গড!' আঁতকে উঠল রানা, ছুটে নেমে পড়ল পানিতে, তারপর সাঁতার দিয়ে এগোল ওদের দিকে। খুব দ্রুত সাঁতরাচ্ছে রানা, তিন-চারটে স্ট্রোক-এর পর একবার শ্বাস নিচ্ছে। মুখ তুলে একবার দেখে নিল, প্রায় পৌঁছে গেছে ওদের কাছে। দেখল লাল চুলো মেয়েটা আর্তনাদ করছে, হাত দিয়ে এলোপাতাড়ি বাড়ি মারছে পানিতে। বারবার ডুবে যাচ্ছে সে, পানির ওপর মাথা তুলে রাখতে পারছে না। অপর মেয়েটা তার কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করছে, দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছে সঙ্গিনীকে।

লাল চুলোর পিছনে গেল রানা। হাত দুটো ধরে শরীরের দু'পাশে শক্তভাবে আটকাল, তারপর হেলান দিল পিছন দিকে, পানিতে ঘন ঘন পা ছুঁড়ে মেয়েটার মাথাটাকে ভাসিয়ে রাখল। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে চারদিকে, ভয় পাচ্ছে হয় একটা হাঙর নয়তো ব্যারাকুডা দেখতে পাবে। তবে লক্ষ করল, পানিতে কোথাও রক্ত নেই।

'কোন ভয় নেই,' মেয়েটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল রানা। 'কোন বিপদ হবে না। শান্ত হও, সব ঠিক আছে।'

আর্তনাদ থেমেছে, মেয়েটা এখন ফোঁপাচ্ছে।

'তুমি কি আহত? কোথাও লেগেছে? কি ঘটেছে বলো আমাকে।'

অপর মেয়েটা বলল; 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ চিৎকার করে হাত ছুঁড়তে শুরু করল ও।'

লাল চুলো মেয়েটার পেশীতে ঢিল পড়ল, অনুভব করল রানা। কব্জি ছেড়ে দিয়ে তার পিছনে একটা হাত রাখল ও, ভাসিয়ে রাখার জন্যে।

'কি যেন একটা...,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটা।

'কামড়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'...ভয়ঙ্কর আর পিচ্ছিল, সাংঘাতিক বড়...।'

'কি? কিছু দিয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছিল?'

'না...ওটা...,' চিৎ হলো মেয়েটা, দু'হাত তুলে জড়িয়ে ধরল রানাকে, প্রায় ডুবিয়ে দিল ওকে।

রানা বলল, 'চলো আগে সৈকতে উঠি।' মেয়েটার একটা হাত ধরল ও, তার সঙ্গিনীকে অপর হাতটা ধরার ইঙ্গিত দিল। লাল চুলোকে মাঝখানে নিয়ে সৈকতে ফিরে আসছে ওরা। খানিক পরই পায়ের তলায় বালি পাওয়া গেল।

মেয়েটা বলল, 'এখন আমি ঠিক আছি। আমি...ওটা...,' রানার দিকে তাকাল সে, হাসার চেষ্টা করল, বলল, 'ধন্যবাদ।'

'এখুনি ফিরে আসছি,' বলল রানা, তারপর গভীর পানির দিকে ঘুরে সাঁতরাতে শুরু করল। অনায়াস, সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল ও, ঠিক যেখানে মেয়ে দুটো ছিল। সাঁতার বন্ধ করে শুধু ভেসে থাকল, ভাসতে ভাসতে ঘুরে যাচ্ছে, ছোট একটা বৃত্ত তৈরি করছে। ঠিক জানে না কি খুঁজছে। বক্স জেলিফিশ বারমুডায় নেই। পর্তুগীজ মেন-অ'ওঅর আছে বটে, তবে তাদের চেনা যায়—নীল-বেগুনি ব্লাডার পানির ওপর ভাসে। ক্ষতি করে না বা বিপজ্জনক নয় এমন জেলিফিশ হতে পারে, যদিও সারফেসের ঠিক নিচেই থাকে ওগুলো, অর্থাৎ মেয়েটার দেখতে পাবার কথা।

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিছুর স্পর্শও অনুভব করল না। ফেরার জন্যে ঘুরে গেল ও। ঠিক এই সময় ওর হাতে কি যেন একটা ঠেকল। একটা ঝাঁকি খেলো শরীর, চিৎ সাঁতার দিয়ে পিছিয়ে এল খানিকটা। পানির যেখানটায় হাত ছিল সেখানে তাকাল ও।

ওখানে, এক ফুট পানির তলায়, চকচকে সাদা আর গোল মত কি যেন রয়েছে, আকারে মাঝারি একটা তরমুজের চেয়ে ছোট নয়। খুব সাবধানে, ভয়ে ভয়ে, হাত বাড়াল রানা। ছুঁলো জিনিসটা। আঠাল,

নরম, যদিও কিনারাগুলো উঁচু-নিচু। মনে হলো পচা মাংস হতে পারে। জিনিসটার তলায় হাত দিল ও। তলার দিকটা শক্ত আর পিচ্ছিল। ধরল ভাল করে, পানির ওপর তুলল। যে-ই মাত্র বাতাসের সংস্পর্শে এল ওটা, তীব্র একটা দুর্গন্ধে দম আটকে গেল ওর, পানি বেরিয়ে এল চোখে।

মাংস নয়, চর্বি। লালচে সাদা, ক্ষতবিক্ষত।

টুকরোটা উল্টো করল রানা। ত্বকের দিকটা নীলচে-কালো, মাঝামাঝি জায়গায় একটা বৃত্তসহ নতুন দাগ, পাঁচ থেকে ছ'ইঞ্চি বড়, দেখে মনে হলো কাটা হয়েছে। বৃত্তের মাঝখানে গভীর একটা ক্ষত, চামড়া ভেদ করে চর্বিতে ঢুকে গেছে। কিনারায় আরেকটা বৃত্তের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

'কী সাংঘাতিক...,' বিড়বিড় করল রানা। ওটাকে সামনে ঠেলে সাঁতার কাটছে ও, ফিরে আসছে তীরে।

ঢেউয়ের সঙ্গে বালির ওপর উঠে এসেছে কি যেন, সেটাকে ঘিরে হৈ-চৈ করছে একদল ছেলেমেয়ে। কারও কারও হাতে লম্বা কাঠি, ওগুলোর সাহায্যে পরস্পরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে জিনিসটা, চিৎকার করছে, 'ওয়াক, থু!'

ভিড় ঠেলে সামনে এগোল রানা, দেখল ওটাও এক টুকরো ব্লাবার, তবে প্রথমটার চেয়ে আকারে ছোট, দুই প্রান্তে একটা করে অর্ধবৃত্ত।

ঘুরে হাঁটা দিল রানা, ছেলেমেয়েগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালেন এক প্রৌঢ় লোক। জিনিসটা দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি। 'এই, রিনা, দেখে যাও... কি বলো তো!'

মুখের সামনে থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছে রানা ওর পাওয়া ব্লাবারটা। মেয়ে দুটো পাশাপাশি বসে আছে বালির ওপর; লাল চুলোর গা একটা তোয়ালে দিয়ে জড়ানো, তার দুই কাঁধে বান্ধবীর

একটা হাত।

'ও এখন ভাল আছে,' লাল চুলোর সঙ্গিনী বলল, রানার দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'তোমাকে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই। তুমি কি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে, মিস্টার...,' বাতাসে ভর করে দুর্গন্ধটা আঘাত করল তার নাকে। '...কি ওটা?'

'শোনো,' বলল রানা, বালির ওপর থেকে নিজের তোয়ালেটা তুলে নিয়ে ব্লাবারটা জড়াল। 'তোমরা কেউ পানিতে নেমো না আর।' কথাটা কিভাবে বলবে চিন্তা করল এক সেকেণ্ড। 'এখানে যারা রয়েছে তাদের ডেকে বলো, পানিতে নামলে বিপদ হতে পারে...।'

'বিপদ হতে পারে? কি বিপদ?' লাল চুলো শিউরে উঠে সঙ্গিনীর আরও গা ঘেঁষে বসল।

'সেটা এখুনি ঠিক বলা যাচ্ছে না।' একটা দম্পতিকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল রানা। 'শুনুন, প্লীজ।' দাঁড়াল তারা। 'আপনারা কাল ও আজকের কাগজে দেখেছেন তো, এক মহিলা বলেছেন যে বারমুডার পানিতে একটা জলদানব এসেছে?' মাথা ঝাঁকাল তারা, হাসছে। 'কথাটা বোধহয় সত্যি। মানে, বলতে চাইছি, নিশ্চিতভাবে কিছু না জেনে পানিতে নামা উচিত হবে না...।'

'কোথাকার কে ভাই আপনি?' পুরুষটার বয়েস হবে ত্রিশ কি বত্রিশ, সে তার সঙ্গিনীর নগ্ন কোমরে হাত রেখে হেসে উঠল। 'এসব গাঁজাখুরি গল্প অনেক শুনেছি। বিদঘুটে একটা গুজব ছড়িয়ে দিয়ে মাল কামাবার তাল।'

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন লোক জমেছে ওদের চারপাশে। একজন বলল, 'এ-সব বারমুডার শত্রুরা রটায়, ভয় পাইয়ে দিয়ে ট্যুরিস্ট বিজনেসের বারোটা বাজাতে চায়।'

রানা আগেই যা সন্দেহ করেছিল, তাই—একজন মানুষের মুখের

কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। অনেকে অনেক বিরূপ মন্তব্য করছে, অপমানে গা জ্বালা করে উঠলেও নিজেকে সামলে রাখল ও, সৈকত থেকে দ্রুত পায়ে উঠে এল রাস্তার ওপর, বেলের মোটরসাইকেলটা যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

সী কুইনের পিছনের একটা হোল্ডে ওয়াটারম্যানকে নিয়ে কাজ করছে বেল। ছ'বছর হলো বোটটা কিনেছে সে, হোল্ডের ভেতর এই প্রথম রঙ লাগাচ্ছে। কাজটা ডক ইয়ার্ডকে দিলে ঘণ্টা প্রতি চল্লিশ ডলার নেবে, সেজন্যেই এতদিন রঙ না করে চালিয়ে দিয়েছে সে। হোল্ডে যদিও কোন লিক দেখা যায়নি, তবে রঙ না করলে মরচে ধরবে, তারপর এক সময় ফুটোও দেখা দেবে।

ওপরের ডেকে পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলল সে, দেখল খোলা হ্যাচের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। 'কি হে, রানা, এত দেরি করলে যে?'

'কাজ ফেলে উঠে এসো তোমরা,' বলল রানা। 'কথা আছে।'

মাস্ক আর গগলস খুলে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল বেল। তার পিছু নিল ওয়াটারম্যানও। সে বলল, 'একটু আগে দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন বেলের কাছে...।'

তার পাঁজরে খোঁচা মারল বেল; নিচু গলায় বলল, চুপ!'

'দেখে বলো তো, কি এটা?' তোয়ালে দিয়ে জড়ানো ব্লাবারটা কাটিং টেবিলের মাঝখানে রাখল রানা, গন্ধটা এড়াবার জন্যে পিছিয়ে এল দু'পা।

এগিয়ে আসছে ওরা, ধাক্কা খেলো নাকে। 'ওয়াক! রানা, মরা কিছু তুলে এনেছ নাকি?'

'শোনো,' বলল রানা, তারপর হর্সশু বে-র সৈকতে কি ঘটেছে

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল।

তোয়ালের একটা প্রান্ত ধরে থাকল ওয়াটারম্যান, ভাঁজ খুলল বেল। কোত্থেকে এরইমধ্যে এক ঝাঁক মাছি এসে হাজির হয়েছে, মাথার ওপর চক্কর দিতে শুরু করেছে এক জোড়া সী'গাল।

'তিমি,' বলল বেল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অল্প বয়েসী।'

'কি করে বুঝলেন, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'ব্লাবারটা পাতলা,' বলল রানা। 'লক্ষ করো, কয়েক ইঞ্চি পরই কেমন হালকা লালচে হয়ে গেছে রঙ।'

বেল জিজ্ঞেস করল, 'স্পার্ম হোয়েল?'

'বাজি রেখে বলতে পারি।'

'প্রপেলারের ধাক্কা খেয়ে এই অবস্থা?'

'না,' বলল রানা। 'উল্টে দেখো।'

ছুরির ডগা দিয়ে ব্লাবারটা উল্টো করল বেল। সরাসরি রোদ লাগায় বৃত্তাকার দাগগুলো নেকলেসের মত চকচক করে উঠল, মাঝখানের গর্ত থেকে পচা-গলা মাংস বেরিয়ে আসছে গড়িয়ে।

বেল আর ওয়াটারম্যান পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর একযোগে রানার দিকে।

'সান অব আ বীচ...,' বলে কেবিনের দিকে এগোল রানা। একটু পরই বেরিয়ে এল, হাতে হলদেটে, কাস্তে আকৃতির নখর বা দাঁত। নীলচে-কালো চামড়ার ওপর ফুটে থাকা দাগের গায়ে ফেলল সেটা। মাপটা মিলে গেল। 'সান অব আ বীচ,' আবার বিড়বিড় করল ও।

'কি ব্যাপার, মি. রানা? কে দায়ী এর জন্যে?'

'বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না। আমি নিজেও বিশ্বাস করতে চাইছি না,' বলল রানা। 'জিনিসটা...,' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল

ও।

'কি?'

ব্লাবারের দিকে আঙুল তুলল রানা, বেলকে বলল, 'পানিতে ফেলে দাও ওটা, মাছের খোরাক হবে।' তারপর ওয়াটারম্যানের দিকে ফিরল। 'দু'জনেই তোমরা আমার সঙ্গে এসো।'

'কোথায়?'

'আমার হোটেলে। কয়েকটা বই খুলে দেখতে হবে।'

তেল আর রঙ মাখা নিজের কাপড়চোপড়ের দিকে তাকাল বেল। 'কি বলছ! এই অবস্থায় যাব কিভাবে!'

'সময় নেই, বেল,' তাগাদা দিল রানা। 'প্রথমে নিজেরা নিশ্চিত হয়ে নিই, তারপর দেরি না করে কর্তৃপক্ষকে সাবধান করতে হবে। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, বারমুডায় সাংঘাতিক একটা বিপদ দেখা দিয়েছে।'

'কিন্তু...।'

'আরে এসো তো, তোমরা আমার গেস্ট, কেউ কিছু বলবে না।'

তর্ক করে লাভ নেই বুঝতে পেরে বোট থেকে নেমে এল ওরা, রানার পিছনে মোটরবাইকে চেপে বসল। লাঞ্চের সময় হয়নি এখনও, বোর্ডাররা সব সৈকতে, হোটেলের লাউঞ্জ ফাঁকা দেখল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায়, রানার স্যুইটে উঠে এল তিনজন। বেল আর ওয়াটারম্যানকে নিয়ে ছোট একটা কামরায় ঢুকল রানা, তার আগে টেলিফোনে বিয়ারের অর্ডার দিল।

কামরাটায় একটা বুক-কেস রয়েছে, বেশিরভাগ বই-ই সমুদ্র আর সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে লেখা। তিনটে চেয়ার টেনে বুক-কেসটার সামনে বসল ওরা, সবার হাতে বিয়ারের গ্লাস। ওয়াটারম্যান দেখল, শেলফে র‍্যাচেল কার্লসন থেকে শুরু করে স্যামুয়েল এলিয়ট মরিসন, মেনডেল

পিটারসন, পিটার ম্যাথিসেন পর্যন্ত নামকরা সব লেখকেরই বই রয়েছে। সে জানে, এরা শুধু লেখক নন, গবেষক, অর্থাৎ বিজ্ঞানীও। শুধু যে সমুদ্র সম্পর্কিত বই রয়েছে তা নয়। কয়েন, শিপরেক, সিরামিক, গ্লাসওয়্যার, ট্রেজার ইত্যাদির ওপর লেখা বইও আছে।

'এবার দেখা যাক,' হাতের গ্লাস নিচু টেবিলে রেখে শেলফ থেকে মোটা একটা বই নামাল রানা। 'মিসট্রিজ অভ দা সী,' শিরোনামটা পড়ল ও। তারপর খুলল বইটা।

পাতা ওল্টাচ্ছে, সেই সঙ্গে কথা বলছে রানা, 'কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন কোর্টেজ সীতে, একটা বোটে রয়েছি, আমার সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাকুয়েরিয়ামের কয়েকজন লোকও ছিল—বিরল প্রাণী সংগ্রহে সাহায্য করছিলাম ওদেরকে।'

এক রাতের কাহিনী। ওরা দেখল, একদল মেক্সিকান জেলে আলো জ্বেলে কি যেন ধরছে। দেখার জন্যে বোট নিয়ে তাদের কাছে চলে এল ওরা। লোকগুলো বড় আকৃতির স্কুইড সাঁড়াশির সাহায্যে ধরার চেষ্টা করছিল। একেকটা চার কি পাঁচ ফুট লম্বা, পঞ্চাশ বা ষাট পাউণ্ড ওজন। আগে কখনও বড় স্কুইড দেখেনি রানা, তাই ঠিক করল পানিতে নামবে।

নামার পর যে-ই মাত্র ওর মাস্ক পরিষ্কার হয়েছে, একটা স্কুইড ছুটে এল ওর দিকে। হাত দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ওটার একটা চাবুক ওর কব্জি ধরে ফেলল। রানার মনে হলো, অন্তত একশো সুচ একসঙ্গে বিঁধে গেল হাতে। ওটার চোখে ঘুসি মারল ও, ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। পানির সারফেসে উঠে আসছে, বুঝতে পারছে এখানে থাকা নিরাপদ নয়। এই সময় অকস্মাৎ অনুভব করল টেনে নিচে নামানো হচ্ছে ওকে। একটা নয়, দুটো নয়, তিন-তিনটে স্কুইড চাবুক দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে পানির তলায় নামাতে চাইছে

ওকে।

বোকা মাসুদ রানার জন্যে সৃষ্টিকর্তার মনে কোমল একটু জায়গা আছে, স্বীকার করল রানা। ওর এ-কথা বলার কারণ, স্কুইডগুলো সেদিন যা-ই ধরল, সবই খসে গেল—একটা ফ্লিপার, ডেপথ গজ, কালেকটিং ব্যাগ।

আবার সারফেসের দিকে রওনা হলো রানা। কি কারণে কে জানে, ওগুলো আর ধাওয়া করেনি। নিরাপদেই বোটে ফিরে আসতে পারল ও। তবে এরপর প্রায় এক মাস রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

'জেসাস!' বলল বেল।

বইয়ের একটা পাতা ওল্টাল রানা। 'এই দেখো, পেয়েছি।' বেল আর ওয়াটারম্যানের দিকে বইটা বাড়িয়ে ধরল।

'কি ওটা?' ছবিটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল বেল।

উনিশ শতকে কাঠে খোদাই করা অতি কুৎসিত একটা প্রাণী ওটা, দেখে মনে হবে প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তু, শিকড়সর্বস্ব কাঠামো, শেষ দিকটা লেজের আকৃতি পেয়েছে, ঠিক যেন একটা তীরের মাথা। পাক খাওয়া আটটা বাহু, শরীরের দ্বিগুণ লম্বা দুটো চাবুক, একজোড়া বিশাল চোখ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে জন্তুটা পানি থেকে মাথাচাড়া দিয়ে একটা পাল তোলা জাহাজকে ধ্বংস করছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে লোকজন, একটা মেয়েলোককে দেখা গেল জন্তুটার ঠোঁট থেকে ঝুলছে, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো।

'এটা হলো,' বলল রানা, 'আমাকে যারা ধরেছিল তাদের দাদা। ওশেনিক জায়ান্ট স্কুইড, আর্কিটিউথিস ডাক্স।'

'এ-ধরনের স্কুইডের কথা আমিও শুনেছি,' খানিক ইতস্তত করে বলল বেল, 'তবে এ-সব বোধহয় অতিরঞ্জিত, তাই না? উদ্ভট কল্পনা, বাস্তবে কি সত্যি এর অস্তিত্ব আছে?'

'আছে,' বলল রানা। 'দুর্লভ, তবে আছে।' একটু থেমে বড় করে শ্বাস নিল। 'সত্যি কথা বলতে কি, বেল, শুধু আছে নয়, এখানে আছে—এই বারমুডায়।'

'মি. রানা...' মুখ তুলে তাকাল ওয়াটারম্যান, তার চেহারায় অবিশ্বাস।

'আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করছ না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ঠিক আছে। কিন্তু হারমান মেলভিল-এর কথা বিশ্বাস করবে তো?' শেলফ থেকে এক কপি মবি-ডিক নামাল ও, পাতা ওল্টাল দ্রুত। তারপর পড়তে শুরু করল। বাংলা করলে দাঁড়ায়, '...রহস্যময় সাগর আজ পর্যন্ত মানুষের সামনে যে-সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিস্ময় উন্মোচিত করেছে, তার মধ্যে সবেচেয়ে ভীতিকর যেটি, আমরা এই মুহূর্তে সেটির দিকে তাকিয়ে রয়েছি। নরম মাংসের বিশাল স্তূপ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কয়েক ফার্লং, চকচকে ক্রীম কালার, ভেসে আছে পানিতে, অসংখ্য দীর্ঘ বাহু বেরিয়ে এসেছে কাঠামোর মাঝখান থেকে, অবিরত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে আর মোচড় খাচ্ছে জড়াজড়ি করে থাকা অসংখ্য সামুদ্রিক সাপের মত, যেন অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে নাগালের মধ্যে যে-কোন জিনিস ধরার জন্যে।'

বইটা বন্ধ করল রানা, বেল বলল, 'রানা, মবি-ডিক তো একটা গল্প।'

'সবটুকু নয়। তিমিটা বাস্তব, এসেক্স নামে একটা জাহাজের ভাগ্যে সত্যি যা ঘটেছিল তার ওপর ভিত্তি করে...।'

'তবু...।'

'তোমরা তাহলে ফ্যাক্টস চাও, কেমন?' শেলফ থেকে আরেকটা বই নামাল রানা। বইটার মেরুদণ্ডের লেখাগুলো পড়ল, ঝাপসা হয়ে গেছে হরফগুলো। 'দা লাস্ট ড্রাগন,' বলল ও। 'লিখেছেন আলফ্রেড ফেরেল, পিএইচ.ডি.। এঁর কথা বিশ্বাস করবে তো?' কাল রাতেই

বইটায় কিছু চিহ্ন দিয়ে রেখেছে ও, নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। 'অতিকায় স্কুইডের কথা লেখা হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে, এমন কি হয়তো তারও আগে থেকে। ক্র্যাকেন শব্দটা শুনেছ তোমরা? সুইডিশ শব্দ, ইংরেজিতে অনুবাদ করলে হয়—আপরুটেড ট্রি। জলদানব অর্থাৎ অতিকায় স্কুইড এই রকম দেখতে বলে মনে করত মানুষ, মাথার ওপর শিকড়সহ একটা গাছ। টেনট্যাকল বলো, বাহু বলো, চাবুক বলো, শরীরটাকে সাপের মত পেঁচিয়ে রাখে। আজকাল অবশ্য বিজ্ঞানীরা "আপরুটেড ট্রি" বলেন না, তাঁরা ব্যবহার করেন সেফালোপড শব্দটা।'

'কেন? কি মানে ওটার?' ওয়াটারম্যান জিজ্ঞেস করল।

'মানে হলো, হেড-ফুটেড,' বলল রানা। 'কারণ হলো, মানুষ যেগুলোকে ওদের পা বলে মনে করে সেগুলো আসলে ওদের বাহু, বেরিয়ে এসেছে সরাসরি মাথা থেকে।' পাতা উল্টে বইয়ের আরেক পৃষ্ঠায় আঙুল রাখল ও। 'কি লিখছেন এখানে?' নিঃশব্দে পড়ল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'এরকম একটা দৈত্য ভারত মহাসাগরে উদয় হয়, টেনে পানির তলায় নামিয়ে নিয়ে যায় একটা স্কুনারকে। ওই কাঠ খোদাই-এ যেমন দেখলাম, ঠিক সেরকম দেখতে ছিল ওটা। স্কুনারে যারা ছিল সবাইকে খুন করে। প্রত্যক্ষদর্শী ছিল একশোর বেশি।' বইটা বন্ধ করল ও। 'আমি একটা বোকা,' নিজেকে তিরস্কার করল। 'ব্যাপারটা আরও আগে আন্দাজ করতে পারা উচিত ছিল আমার। আর কিছুর পক্ষে আমাদের গিয়ার ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব নয়। ভেবে দেখো না, আটত্রিশ ফুট লম্বা একটা বোটকে কোন হাঙর ভেঙে টুকরো টুকরো করতে পারবে? হাঙর হিংস্র বটে, তবে অত শক্তিশালী নয়।'

বেল বলল, 'কিন্তু রানা, তারিখটার দিকে তাকাও। আঠারোশো চুয়াত্তর সালের ঘটনা। আজকের কথা নয়।'

'তিমির গায়ে দাগগুলো? নিজেরাই তো দেখেছ।' পকেট থেকে

একটা নখ বের করল রানা। 'আর কি ধরনের প্রাণীর এরকম ছুরি আছে, বলো?' হঠাৎ জরুরী একটা তাগাদা অনুভব করল ও। সবাইকে এখুনি সাবধান করা দরকার, তা না হলে অনেক লোক মারা পড়বে। কিন্তু সত্যি যদি বারমুডার পানিতে একটা অতিকায় স্কুইড এসে থাকে, কিভাবে সেটাকে তাড়ানো সম্ভব? তাড়াবার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সে কৌশল কারও জানা নেই। তাহলে কি ধরতে হবে ওটাকে? না, তা আরও অসম্ভব। মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু কিভাবে? সমস্যা না হয় চিহ্নিত করা গেল, কিন্তু সমাধান কি?

শেলফ থেকে আরও বই নামাল রানা, কয়েকটা ধরিয়ে দিল ওয়াটারম্যানের হাতে, তারপর নিজে একটা খুলল। 'পড়ো,' বলল ও। 'স্কুইড সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সব আমাদের জানতে হবে।'

দু'ঘণ্টা পর একবার উঠল রানা, ফোনে রুম-সার্ভিসকে তিনজনের লাঞ্চ দিতে বলল। ইতিমধ্যে প্রায় সবগুলো বই উল্টেপাল্টে দেখা শেষ করেছে ওরা।

দৈত্যাকার স্কুইড সম্পর্কে রেফারেন্স যা পাওয়া গেল সবই হয় অস্পষ্ট, না হয় পরস্পর বিরোধী। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলছেন, পঞ্চাশ বা ষাট ফুটের বেশি লম্বা হয় না ওগুলো। আবার একদল বলছেন, কোন কোনটা একশো ফুটও হয়, কিংবা আরও বড়, ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর মহাসমুদ্রগুলোতে। কেউ বলছেন, অতিকায় স্কুইডের সাকার ডিস্ক-এ দাঁত আর হুক আছে। কেউ বলছেন, দুটোর একটা আছে। আবার কারও কারও ধারণা, কোনটাই নেই। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের ধারণা, ওগুলোর গা থেকে আলোর আভা ছড়ায়। আবার একদল বলছেন, না, কোন আলো নেই।

খেতে বসে আলোচনা করল ওরা।

'কোন ব্যাপারেই কেউ একমত নন,' বলল ওয়াটারম্যান। 'এটাকে

দুঃসংবাদই বলতে হবে। আর সুসংবাদ হলো, মানুষের ওপর আক্রমণের সবগুলো ঘটনা ঘটেছে গত শতাব্দীতে।'

'না,' বলল রানা, ড. ফেরেলের বইটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এ এমন একটা প্রাণী, এর সম্পর্কে বোধহয় ভাল কোন খবরই নেই।'

খোলা পাতায় চোখ বুলাল ওয়াটারম্যান। 'সর্বনাশ!' বলল সে। 'উনিশশো একচল্লিশ!'

'এখান থেকে খুব বেশি দূরেও নয়। টর্পেডোর আঘাতে জাহাজটা ডুবে যায়, বারোজন লোক আশ্রয় নেয় লাইফবোটে। লোক বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'জন কিনারা ধরে ঝুলছিল। প্রথম রাত, গাঢ় অন্ধকার, হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হলো একজন লোক। দ্বিতীয় রাতেও সেই একই ঘটনা। কাজেই এরপর তারা গায়ে গা ঠেকিয়ে বোটের ভেতর থাকছে। তৃতীয় রাত, খোলের গায়ে আঁচড়ের আওয়াজ শোনা গেল, সেই সঙ্গে কিসের যেন একটা গন্ধ। হ্যাঁ, মনে হলো জায়্যান্ট স্কুইড অনুসরণ করছে ওদেরকে—দিনে দূরে সরে থাকে, রাতে কাছে চলে আসে। একটা চাবুক দিয়ে লাইফবোটের গা অনুভব করে। পরের রাতে একজন লোককে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল চাবুকটা। বিদ্যুৎবেগে পেঁচিয়ে ধরে টান দিয়ে নিয়ে চলে গেল। এখন ওরা জানে জিনিসটা কি। পরের রাতে তৈরি থাকল সবাই। সে-রাতেও লাইফবোটে উঠে এল একটা চাবুক, স্পর্শ পাবার জন্যে নড়াচড়া করছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল ওটা। তবে একজন লোক মারাত্মক আহত হলো। সেই যে গেল স্কুইড, আর এল না। যে লোকটা আহত হয়েছে, দেখা গেল তার শরীরের অনেক জায়গা থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে মাংস। ছোট ছোট টুকরো, আমেরিকান সিকি ডলারের মত। ওদের হিসাবে প্রাণীটির আকার ছিল...আন্দাজ করতে পারো?' বলে মুখ তুলল রানা।

বইটার ওপর চোখ রেখে পড়ল ওয়াটারম্যান, 'তেইশ ফুট। আকারে একটা স্টেশন ওয়াগন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তিমির চামড়ায় যে দাগগুলো আমরা দেখলাম, কত বড় হবে একেকটা?'

'পাঁচ ইঞ্চি?'

'কী সাংঘাতিক,' খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এই স্কুইডটা তাহলে ব্লু হোয়েলের মত বিরাট হবে।'

'ব্লু হোয়েল! কি বলছেন!' বেলের দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান, তারপর আবার রানার দিকে। 'একটা ব্লু হোয়েল সী কুইনের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। ব্লু হোয়েল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রাণী...।'

'শারীরিক আকৃতিতে, হ্যাঁ, তবে বোধহয় লম্বায় নয়।'

এরপর আলোচনা হলো, কর্তৃপক্ষকে কিভাবে সচেতন করা যায় তা নিয়ে। এ-ব্যাপারে বেলের কোনই আগ্রহ নেই, তার যুক্তি হলো ওদের কথা কর্তৃপক্ষ কানে তুলবে না। তাছাড়া, সে খুব ভয় পেয়েছে, এ-ব্যাপারে বেশি কৌতূহল দেখাতেও রাজি নয়। রানা তাকে ধমক দেয়ায় অবশ্য চুপ করে গেল সে। আর ওয়াটারম্যান বলল, 'কর্তৃপক্ষ মানে ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্ট, আর ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্ট মানে ড. কাইল ফ্যাদম। তার কাছে কে যায়! তাছাড়া, গিয়ে লাভই বা কি!'

'লাভ হোক বা না হোক, আমাদের কর্তব্য আমরা করব,' বলল রানা। 'ফ্যাদম যদি গুরুত্ব না দেন, কোন মিনিস্টারের কাছে যাব আমরা। মোট কথা যেভাবে হোক এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কি করার কথা ভাবছ তুমি? ধরবে ওটাকে?' ভারি গলায় জানতে চাইল বেল। 'নাকি খুন করবে?'

'ধরার প্রশ্ন ওঠে না,' বলল রানা। 'বাঁচতে হলে মারতে হবে

ওটাকে।' মাথা চুলকাল রানা। 'স্বীকার করছি, কিভাবে ওটাকে মারা সম্ভব এই মুহূর্তে তা বলা যাচ্ছে না। তবে এখুনি যেতে চাই আমি, দেরি করলে ঝুঁকি নেয়া হবে।'

'কোথায় যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করল বেল।

'ড. কাইল ফ্যাদমের সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমি এর মধ্যে নেই,' হাত তুলে মাফ চাওয়ার ভঙ্গি করল বেল।

'ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না,' বলল রানা। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি। তোমার বাড়ির সামনে দিয়েই তো যাব, নামিয়ে দেব তোমাকে।'

বেলের বাড়ির সামনে মোটরবাইক থামতেই ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল মোনা। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। 'আপনারা কিছু শুনেছেন? জায়্যান্ট স্কুইড সম্পর্কে?'

'স্কুইড? তুমি সাইকিক নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এইমাত্র রেডিওতে বলল। কে যেন সৈকতে কি পেয়েছে, অ্যাকুয়েরিয়ামের একজন বিজ্ঞানী বলছেন...।'

'ঠিকই বলেছেন তিনি,' বলল রানা। 'বারমুডার পানিতে বড় একটা স্কুইড...।'

'কাল রাতে ওয়াইল্ডলাইফ ম্যানেজমেন্ট বিরাট একটা মীটিঙ ডেকেছে,' বলল মোনা। 'লজ হলে, ঠিক সাতটায় শুরু হবে। ফিশারম্যান, ডাইভার, বোট মালিক, সবাইকে যোগ দিতে বলা হয়েছে। গোটা দ্বীপে মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেছে।'

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

এবার বাড়ির ভেতর থেকে এনাও বেরিয়ে এল, 'বেল, কত বড় ওটা?'

রানাকে দেখিয়ে বেল বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো, এ-ব্যাপারে ও

একজন এক্সপার্ট।'

'চা খাবে না, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল এনা। 'এসো, ভেতরে এসো সবাই।'

বেল রানাকে বলল, 'কাল যখন মীটিং ডাকা হয়েছে, আজ তোমার ফ্যাতরা মিয়ার কাছে না গেলেও চলে, কি বলো?'

সায় দিল ওয়াটারম্যানও। 'কর্তৃপক্ষ যে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে।'

বাড়ির ভেতর ঢুকছে ওরা, এনা বলল, 'রেডিওতে উনি নিজেই তো কথা বললেন—ড. কাইল ফ্যাদম।'

তার দিকে তাকাল রানা। 'কি বললেন তিনি?'

'বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, স্কুইডটাকে ধরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বললেন, ওটাকে কিভাবে ধরতে হবে তা তিনি আর তাঁর দফতরের লোকজন জানেন।'

'ভদ্রলোক গাধা নাকি!' বিড়বিড় করল রানা। 'এত বড় একটা স্কুইডকে কি করে ধরবেন উনি!'

'ধরতে না পারলে আরও ভাল,' বলল বেল। 'এক্ষেত্রে ব্যর্থতা মানে স্কুইডের পেটে চির আতিথ্য গ্রহণ, তাই না? তারচেয়ে ভাল আর কি হতে পারে?'

মোনা বলল, 'আরও খবর আছে। বিশ্ব বিখ্যাত এক বিজ্ঞানী, ড. ফেরেল না টেরেল কি যেন নাম, খবর পেয়ে বারমুডায় চলে এসেছেন। তার সঙ্গে সেই ছেলেমেয়ে দুটোর বাবাও... ।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'ড. আলফ্রেড ফেরেল নিজে চলে এসেছেন? তাহলে তো এখুনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয় আমাকে... ।'

'ঠিক আছে, করবেন দেখা,' ওর হাত ধরে টান দিল মোনা। 'তার আগে সবাই মিলে আসুন চা খাই। আপনার সঙ্গে আমিও না হয় যাব...।

আট

একেই বলে আমলাতান্ত্রিক প্রহসন, লজ হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভাবল রানা। মীটিঙে কেবিনেট মিনিস্টাররা তো উপস্থিত হয়েছেনই, প্রিমিয়ার নিজে সভাপতিত্ব করছেন। বলা হয়েছে, পাবলিক ফোরাম। প্রচুর লোক হয়েছে, হলে তিল ধারণের জায়গা নেই, কথাও বলতে দেয়া হয়েছে সবাইকে, কিন্তু কারও কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বিবেচনা করা হয়নি। কি করা হবে তা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মন্ত্রীরা, মীটিংটা ডাকা হয়েছে লোক-দেখানো।

সবাই একযোগে কথা বললে যা হয়, প্রথম এক ঘণ্টা শুধু হৈ-চৈ শোনা গেছে। অতিকায় স্কুইড সম্পর্কে খুব কম লোকই জানে, দেখেনি তো কেউই, অথচ এক-একজনের কথা শুনে মনে হলো প্রত্যেকে তারা স্কুইড বিশেষজ্ঞ। সবাইকে এভাবে কথা বলতে দেয়ার কারণ হলো, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে বা জলদানব সত্যিকার বিপদ হয়ে দেখা দিলে সরকার বলতে পারবে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিয়ে রানা সিদ্ধান্ত নিল, ড.

আলফ্রেড ফেরেলের সঙ্গে তাঁর হোটেলে দেখা করবে ও। মাত্র মাইল খানেক হাঁটতে হবে, দু'ঘণ্টা বসে থাকার পর মন্দ লাগবে না। কাল রাতে ভদ্রলোককে টেলিফোন করে পায়নি ও। মীটিং বোধহয় আরও ঘণ্টাখানেক চলবে। সাধারণ মানুষকে কিভাবে সতর্ক করা যায়, এ-নিয়ে বিতর্কটা এখনও শেষ হয়নি। দুঃখে হাসি পেল রানার—একটা করে প্রসঙ্গ ওঠে, সবাইকে কথা বলতে দেয়া হয়, তারপর কারও প্রস্তাব গ্রহণ না করে মন্ত্রীরা নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন।

রানা ভাবল, ওর অবশ্য উদ্বিগ্ন না হলেও চলে। অন্তত এই একবার কাইল ফ্যাদমের নিজের নাম ফাটাবার তীব্র ঝোঁকটা শুভ একটা ফল বয়ে এনেছে। আজ সকালের সবগুলো কাগজে বেরিয়েছে খবরটা, একটা কাগজে হেডিং ছিল, 'জলদানব আসলে অতিকায় এক স্কুইড, ড. কাইল ফ্যাদম নিশ্চিত করেছেন'। সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে এই খবরটাই যথেষ্ট।

অনেকেই অবশ্য আশা করছে যে নিউপোর্ট-টু-বারমুডা রেস জলদানবের কারণে বিঘ্নিত হবে না। তবে মাশুল দেয়া শুরু হয়ে গেছে বারমুডার। ট্যুরিস্টরা দলে দলে হোটেল ছেড়ে দিচ্ছে, আরোহী না পেয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা অলস সময় কাটাচ্ছে স্ট্যাণ্ডে। জেলেরাও মাছ ধরতে যাচ্ছে না।

এক ঘণ্টা একটানা গোলযোগের পর মন্ত্রীদের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন কাইল ফ্যাদম, চার ফুট পাঁচ ইঞ্চি হলেও অনেক বেশি লম্বা দেখাল মাথায় হেলমেট পরে থাকায়। কথা শুনে মনে হলো বিনয়ের অবতার তিনি। জানালেন, তিনি একটা পরিকল্পনা করেছেন, জনসাধারণের সমর্থন চান।

দু'লাইনের একটা প্ল্যান। জলদানবকে মেরে ফেলা হবে। তিনি নিজেই ওটাকে মারবেন, সাহায্য করবে ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্টে

তাঁর সহকারীরা।

এই সময় বেল আর ওয়াটারম্যানের সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আবার চিৎকার শুরু করল। তাদের কথা হলো, যেহেতু জলদানব সম্পর্কে মাসুদ রানা ছাড়া আর কেউ তেমন কিছু জানে না, কাজেই ওকে কথা বলতে দেয়া হোক। এবার নিয়ে প্রস্তাবটা পাঁচবার তুলল তারা। এর আগে প্রতিবারই তাদেরকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে এই বলে যে বিদেশী কোন লোকের সাহায্য বারমুডার দরকার নেই। এবারও তাই বলা হলো। কাইল ফ্যাদম গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিজেদের লোকবল ও নিজস্ব পদ্ধতির সাহায্যে জলদানবকে মারা হবে, বাইরের কাউকে নাক গলাতে দেয়া হবে না।

দেখা গেল বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ সরকারী সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করছে। ঠিক অপমান নয়, খানিকটা হতাশ হলো রানা। মনে একটা সংশয় আর ভয়ও জাগল। কাইল ফ্যাদমের কথা শুনে ওর মনে হয়েছে, বড় আকারের স্কুইড সম্পর্কে কিছুই তাঁর জানা নেই। অথচ বলছেন, তিনি নিজে ওটাকে মারবেন। কিভাবে তা সম্ভব? রানার পরামর্শে বেল আর ওয়াটারম্যান এরপর জানতে চায়, পরিকল্পনাটা কি? উত্তরে কাইল ফ্যাদম রেগে গিয়ে বলেছেন, 'সেটা গোপন ব্যাপার। মারার সময়ই দেখতে পাবেন।'

এরপর আর ওখানে থাকেনি রানা। বেল আর ওয়াটারম্যানকে রেখে বেরিয়ে এসেছে একা।

ড. আলফ্রেড ফেরেল আর জেরি হ্যাসটন হোটেল রক্সিতে উঠেছেন। রক্সির লাউঞ্জ থেকে টেলিফোনে কথা বলল রানা। প্রথমে অচেনা কারও সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন না আলফ্রেড ফেরেল। রানা বলল, 'ব্যাপারটা খুব জরুরী। আপনার সঙ্গে আলোচনা না করলেই নয়।'

'কি নিয়ে আলোচনা করতে চান আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন ফেরেল।

'আপনি তো ম্যালাকোলজিতে ডক্টরেট করেছেন,' বলল রানা। 'আমি আপনার সঙ্গে আর্কিটিউথিস সম্পর্কে কথা বলতে চাই।'

আগ্রহ বোধ করলেন ভদ্রলোক, জানতে চাইলেন, 'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি, মি.…?'

নিজের নাম বলল রানা, তারপর জানাল, 'আমি নুমার একজন অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্টর।' মনে হলো, ওর এই পরিচয়টাকে গুরুত্ব দেবেন বিজ্ঞানী ভদ্রলোক।

'আপনি, মাসুদ রানা…তার মানে আপনিই সীকুইন ভাড়া করেছেন! চলে আসুন, চলে আসুন!'

তিনতলার একটা স্যুইটে আছেন ওঁরা। বেল বাজাতে ফেরেল দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে এলেন রানাকে। করমর্দনের পর সিটিংরূমে বসল ওরা। 'কাল রাতেই আপনার লেখা বইটি পড়ছিলাম,' শুরু করল রানা।

'কোন বইটা?' ভুরু একটু বাঁকা করে জিজ্ঞেস করলেন ফেরেল। 'আমি তো অনেকগুলো বই লিখেছি।'

'সর্বশেষ, দা লাস্ট ড্রাগন। প্রচুর ফ্যাক্টস আছে…অন্তত আমি ওগুলোকে ফ্যাক্টস বলেই ধরে নিয়েছি।'

'ধন্যবাদ। মি. রানা, আমাদের হাতে সময় খুব কম। ড. কাইল ফ্যাদমের সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এইবার বেরুতে হবে। দয়া করে আপনি বলবেন কি…?'

এই সময় পাশের কামরা থেকে সিটিংরূমে ঢুকলেন প্রৌঢ় আরেক ভদ্রলোক। ফেরেল পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি মি. জেরি হ্যাসটন, রুবি আর ববের বাবা…।'

সোফা ছেড়ে উঠে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'জ্বী, আমি জানি। সরি...।'

'আপনার জন্যে কি বলব, মি. রানা?' পরিচয় ও কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন হ্যাসটন, হাতে ফোনের রিসিভার। 'রাম না জিন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জিন।'

'মি. রানা,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বললেন ফেরেল।

রানা বলল, 'এই মাত্র আমি লজ হলের মীটিঙ থেকে এলাম, মি. ফেরেল। ড. ফ্যাদমের কথা শুনে মনে হলো, স্কুইড সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বললেন, ওটাকে মারার জন্যে তিনি একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন, কিন্তু সেটা নাকি গোপন ব্যাপার, কাউকে বলা যাবে না। আপনি একজন ম্যালাকোলিজস্ট, কাজেই আপনার কাছে আমি জানতে চাই, ওটাকে মারা কি সম্ভব?'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বললেন হ্যাসটন। 'আজ বিকেলে ড. ফ্যাদমের সঙ্গে এক দফা বৈঠক হয়ে গেছে আমাদের। ভদ্রলোককে ভাঁড় বলে মনে হয়েছে আমার। স্কুইড সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। জানেন তো নাই-ই, আবার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতেও রাজি নন।'

'আপনি শান্ত হোন, মি. হ্যাসটন,' বললেন ড. ফেরেল। 'আমাদের সাহায্য না নিয়ে তাঁর উপায় নেই। এবার আমি তাঁকে বোঝাতে পারব বলে আশা রাখি।'

রানা জানতে চাইল, 'আপনারা তাহলে তাঁর প্ল্যানটা কি জানেন?'

'না, জানি না,' বললেন ড. ফেরেল। 'জানব বলেই তো যাচ্ছি আবার। উনি বলবেন বলে কথা দিয়েছেন। তা আপনার কোন সাজেশন আছে, মি. রানা?'

'আপনাকে আর কি সাজেশন দেব আমি,' সবিনয়ে বলল রানা। 'তবে কার কি প্ল্যান জানতে পারলে হয়তো বুঝতে পারতাম আমি

কারও কোনও সাহায্যে আসব কিনা।'

'ড. ফ্যাদমের প্ল্যান, তিনি ওটাকে মারবেন,' বললেন ড. ফেরেল। 'আমি তাঁর এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী।'

বিস্মিত হলো রানা। 'আপনি ওটাকে মারতে চান না? তাহলে কি...?'

রুম-সার্ভিস ওদের জন্য ড্রিঙ্ক নিয়ে এল। লোকটা চলে যাবার পর ড. ফেরেল বললেন, 'স্কুইডটাকে আমি ধরতে চাই, মি. রানা।'

'ধরতে চান!' রীতিমত একটা ধাক্কা খেলো রানা, ভাবল ভদ্রলোক পাগল নাকি। 'কি বলছেন! কিভাবে ধরতে চান?'

'শুনুন, আমি একজন ম্যালাকোলজিস্ট হলেও, টিউথোলজিতে আমি একজন অথরিটি...স্কুইড, বিশেষ করে আর্কিটিউথিস, সারাটা জীবন আমি ওগুলোর ওপর পড়াশোনা করেছি। কমপিউটার ব্যবহার করেছি, গ্রাফ তৈরি করেছি, টিস্যু পরীক্ষা করেছি, গন্ধ শুঁকেছি, স্বাদ নিয়েছি...।'

'স্বাদ নিয়েছেন? স্বাদটা কি রকম?'

'অ্যামোনিয়া।'

'জ্যান্ত একটা দেখেছেন কখনও?'

'না। আপনি?'

মাথা নাড়ল রানা।

'পড়াশোনা করার পর উপলব্ধি করেছি বড় আকৃতির স্কুইড সম্পর্কে মানুষ কত কম জানে। কেউ জানে না কত বড় হয় ওগুলো, কতদিন বাঁচে, মাঝে-মধ্যে কেন তারা উঠে আসে তীরে...এমন কি জানে না কত ধরনের স্কুইড আছে। কেউ বলে তিন, কেউ বলে উনিশ।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্লাসে চুমুক দিলেন ড. ফেরেল।

'আমার একটা থিয়ারি আছে,' প্রিয় বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা সম্ভবত ভুলে গেছেন ভদ্রলোক। এমন আগ্রহী

শ্রোতাও সচরাচর মেলে না। 'গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জায়্যান্ট স্কুইড বা আর্কিটিউথিস-এর অস্তিত্ব আছে, এ-কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করত না কেউ। দু'একটা চাক্ষুষ করার ঘটনাকে নাবিকদের পাগলামি বা দৃষ্টিভ্রম বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আঠারোশো সাতাশি সালে হঠাৎ করে ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল, কয়েকটা বোটে হামলাও হলো, তারপর...।'

'এ-সব আমি পড়েছি,' বলল রানা।

'বলতে চাইছি, এবার এত বেশি প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেল যে ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। তারপর আবার দেখা নেই। নতুন করে উদয় হলো উনিশশো নব্বুইয়ে—এবারও ঘন ঘন, তীরেও উঠে এল। আমি ভাবলাম, কোন প্যাটার্ন আছে কিনা। কাজেই প্রতিটি ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করতে হলো আমাকে। তারপর কমপ্লিউটারে সমস্ত তথ্য ঢোকালাম—আবহাওয়ার অবস্থা, স্রোতের মতিগতি ইত্যাদিসহ। কমপিউটারকে বললাম, এ-সব থেকে কারণটা বের করো।

'কমপিউটার জবাব দিল, ওগুলোর পানির ওপর ভেসে ওঠার সঙ্গে লাব্রাডর কারেন্ট-এর সাইক্লিক্যাল ফ্লাকচুয়েশনের সম্পর্ক আছে—বিশাল ঠাণ্ডা পানির প্রবাহ, গোটা আটলান্টিক উপকূল জুড়ে। বেশির ভাগ সাইক্লে ওগুলোকে দেখা যায় না, জীবিত হোক বা মৃত। তবে কয়েক বছর পর পর পানির তাপমাত্রা ও খোরাক সরবরাহে পরিবর্তন ঘটে, কারণটা আমার জানা নেই, তখন ওগুলোকে দেখা যায়।'

'কত দিন পর পর?'

'ত্রিশ বছর।'

'শেষ সাইকেলটা শুরু হয়েছে...,' মুখ থেকে শব্দগুলো বেরুবার আগেই উত্তরটা পেয়ে গেল রানা।

'উনিশশো ষাট থেকে উনিশ শো বাষট্টি··· ।'

'আই সী।'

'হ্যাঁ, সময় হয়েছে বলেই আবার ওগুলোকে দেখা যাচ্ছে,' বললেন ড. ফেরেল। 'তবে, কি জানেন, অসংখ্য ঘটনার কথা বলতে পারি আপনাকে, দিতে পারি প্রচুর ডকুমেন্ট, অথচ ব্যাখ্যা করে বলতে পারি না স্রোত পরিবর্তনের সঙ্গে কেন ওরা আসে বা কেনই বা মরে ভেসে ওঠে। কেউ কেউ বলেন, গরম পানির স্রোতে আটকা পড়ে যায় ওগুলো, অক্সিজেনের অভাবে মরে ভেসে ওঠে। আবার কারও কারও ধারণা, কারণটা ঠাণ্ডা পানি, গরম পানি নয়—মাইনাস টেন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নিচে। আসলে কেউ জানে না।'

'সবই খুব ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা, 'কিন্তু এ-সব থেকে জানা যাচ্ছে না হঠাৎ একটা স্কুইড মানুষ খেতে শুরু করল কেন।'

'জানা যাচ্ছে না মানে? অবশ্যই জানা যাচ্ছে!' রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন ড. ফেরেল। 'আর্কিটিউথিসকে অ্যাডভেনটিশাস ফিডার বলা হয়। অকস্মাৎ খাদ্য গ্রহণ করে সে, যা পাওয়া যায় তাই খায়। তার স্বাভাবিক খাবার—আমি ওগুলোর পেটে দেখেছি—হাঙর, রে, বড় মাছ। তবে খায় সবই। আসুন ধরা যাক, সাইক্লিক্যাল কারেন্ট তাকে দুই তিন হাজার ফুট পানির নিচে থেকে ওপরে তুলে আনল, সে দেখল নিজের গভীরতা ছেড়ে আসায় খাদ্যের স্বাভাবিক উৎস হারিয়ে গেছে। ব্যাপারটা আপনিও জানেন, মি. রানা। বারমুডা প্রায় মাছশূন্য হয়ে পড়েছে। কাজেই ধরা যাক, এখানে খাবার বলতে সে শুধু পাচ্ছে··· ।'

বিকট একটা শব্দ হলো। মনে হলো গুলি ছুঁড়েছে কেউ। কি যেন একটা ছুটে গেল রানার মুখের সামনে দিয়ে।

নিজের প্লাস্টিক সুইজেল স্টিকটা এত জোরে চেপে ধরেছিলেন হ্যাসটন, ভেঙে গেছে সেটা। 'সরি,' বললেন তিনি। 'এক্সকিউজ মি।'

'না,' ড. ফেরেল বললেন, 'আমি দুঃখিত। আপনার সামনে...।'

'মি. ফেরেল,' বলল রানা, 'একটা ব্যাপারে এখনও কিছু বলেননি আপনি। প্রকৃতির এক নম্বর নিয়ম—ভারসাম্য। সী লায়নের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে ওগুলোকে মেরে ফেলার জন্যে হোয়াইট শার্কের সংখ্যাও বাড়ে। মানুষ বেশি হয়ে গেলে ব্ল্যাক ডেথের মত প্লেগ দেখা দেয়। স্কুইডটাকে এখানে দেখে মনে হচ্ছে প্রকৃতি তার নিয়ম ভঙ্গ করছে। কেন?'

'প্রকৃতি নিয়ম ভঙ্গ করছে না, মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ম ভঙ্গ করতে বাধ্য করছে। আর্কিটিউথিসকে শিকার করতে পারে এমন প্রাণী সাগরে মাত্র একটাই আছে, স্পার্ম হোয়েল। মেরে শেষ করে ফেলছে মানুষ স্পার্ম হোয়েলকে, বলা যায় ওগুলো প্রায় অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। কাজেই এটা সম্ভব যে ক্রমশ আরও বেশি জায়্যান্ট স্কুইড বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে, এবং এবার তারা দেখা দিতে শুরু করেছে। এখানে।'

'আপনি বলতে চাইছেন একটা নয়?'

'জানি না। বোধহয় একটাই, কারণ এখানে যে খাবার আছে তাতে একটার বেশি টিকবে না। তবে আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।'

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে রানার মনে। 'এবার আপনার কথায় আসা যাক। আপনি বলছেন, ওটাকে ধরবেন।' মাথা নাড়ল ও। 'আপনার জানামতে, কেউ কোন দিন এত বড় স্কুইড ধরেছে?'

'না, তা ধরেনি। সত্যিকার আর্কিটিউথিস একটাও ধরা পড়েনি। অন্তত জ্যান্ত নয়।'

'তাহলে কেন ভাবছেন, আপনি ধরতে পারবেন?'

'জানি পারব।'

'তাছাড়া, ধরবেনই বা কেন?'

রানার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ড. ফেরেল। তারপর

বললেন, 'কেন ধরব? কেন ধরব না? ইট'স ইউনিক! ইট'স...।'

এতক্ষণে মুখ খুললেন হ্যাসটন। 'মি. রানা, এই...এই জন্তুটা... আমার ছেলেমেয়েকে খুন করেছে। শেষ করে দিয়েছে আমার জীবন... আমাদের জীবন। ঘটনাটার পর থেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে আমার স্ত্রীকে...তিনি আত্মহত্যা করার...।'

'মি. হ্যাসটন,' বলল রানা, 'ওটা স্রেফ একটা জানোয়ার। ওটা...।'

'স্কুইড সচেতন প্রাণী, মি. রানা। ড. ফেরেল আমাকে বলেছেন... আমি বিশ্বাস করেছি...স্কুইড রাগতে জানে, প্রতিশোধ নেয়। জ্বী, আমিও তাই। বিশ্বাস করুন, আমিও তাই।'

'তবু ওটা স্রেফ একটা পশু। একটা পশুর ওপর আপনি প্রতিশোধ নিতে পারেন না।'

'কেন পারি না, অবশ্যই পারি।'

'কিন্তু কেন? কি লাভ হবে তাতে?'

'আমার কিছু করার আছে, এটা প্রমাণ করতে পারাটাই লাভ। হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে বলব, ভাগ্যে ছিল, কি আর করা? না, তা আমি বলব না। আমি এই শয়তানটাকে খুন করব।'

'কিন্তু ড. ফেরেল বলছেন তিনি ওটাকে ধরতে চান, আর আপনি বলছেন খুন করবেন...।'

'প্রথমে জ্যান্ত ধরা হবে,' তাড়াতাড়ি বললেন ড. ফেরেল। 'ধরতেই হবে, কারণ এরকম সুযোগ অনেক দিন আর পাওয়া না-ও যেতে পারে। অতিকায় একটা জ্যান্ত স্কুইড, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অমূল্য তথ্যের ভাণ্ডার খুলে দেবে মানুষের সামনে। ওটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করার পর, যখন আর কিছু জানার বাকি থাকবে না, তখন মি. হ্যাসটনের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। মারতে চাইলে মারবেন উনি।'

'হ্যাঁ,' বললেন হ্যাসটন। 'আমরা আলোচনা করে তাই ঠিক

করেছি। এখন, মি. রানা, বলুন আপনি আমাদেরকে কি সাহায্য করতে পারেন।'

'প্রথম সাহায্য করতে পারি, আপনাদেরকে বাধা দিয়ে,' বলল রানা। 'কারণ, আমার বিশ্বাস, ওটাকে ধরা অসম্ভব। ধরতে গেলে মারা পড়বেন আপনারা।'

ড. ফেরেল ও হ্যাসটন দু'জনেই হেসে উঠলেন। তারপর ড. ফেরেল বললেন, 'ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না, মি. রানা। আমরা ওটাকে ধরবই। অন্তত চেষ্টা তো করবই।'

'আপনি বরং বাধা না দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করুন,' বললেন হ্যাসটন। 'কাল আমরা সী কুইনের মালিক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু উনি আমাদের কথা ভাল করে শুনতে পর্যন্ত রাজি হলেন না। বললেন, সী কুইন ভাড়া খাটছে।

'আপনারা ন্যাট বেলের সঙ্গে কথা বলেছেন?' অবাক হলো রানা। 'কেন? তাকে কেন দরকার হলো আপনাদের?'

'তাকে নয়, তার বোটটা দরকার আমাদের,' বললেন হ্যাসটন। 'গোটা বারমুডায় সী কুইনের মত মজবুত বোট আর একটাও নেই। বুঝতেই পারছেন, এ-কাজে সী কুইন ছাড়া আমাদের চলবে না।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বোটটা আপনারা কেড়ে নেবেন…।'

'সরি। আমার বলার ভুল, আপনার বোঝার ভুল। শুনুন, মি. রানা। বারমুডায় নেই তো কি হয়েছে, ভাল একটা বোট যে-কোন জায়গা থেকে চার্টার করে আনতে পারি আমরা। লোকও লাগবে আমাদের, স্থানীয় লোকজন সাহায্য না করলে তা-ও আমরা বাইরে থেকে ভাড়া করে আনতে পারি। কিন্তু মুশকিল হলো, অযোগ্য বারমুডা সরকার এত সব বাধা-নিষেধ আর নিয়ম-কানুন তৈরি করে রেখেছে, লাইসেন্স আর

পারমিটের এত রকম ঝামেলা, ফি আর ডিউটি দিতে হলে এত বেশি ফর্ম পূরণ করতে হয়, সব কাজ শেষ করতে কয়েক মাস লেগে যাবে।'

'সব সমস্যার সমাধান করে দেয় টাকা,' বললেন ড. ফেরেল।

'আর টাকার কোন অভাব নেই আমাদের,' তাঁর সুরে সুর মেলালেন হ্যাসটন। 'যত টাকা চায় দেব, আপনি দয়া করে মি. বেলকে বলুন বোটটা যেন আমাদেরকে দিন কয়েকের জন্যে দেন। হয় ভাড়া দিন, না হয় বেচে দিন।'

'বেলকে আমি বললেই রাজি হবে সে—সী কুইন আপনারা পাবেন,' বলল রানা। 'কিন্তু দুটো শর্ত পূরণ করতে হবে আপনাদের।'

আগ্রহের সঙ্গে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন দু'জনেই। হ্যাসটন জানতে চাইলেন, 'কি শর্ত বলুন।'

'আপনাদের অপারেশনটা হতে হবে স্কুইডটাকে মারার, ধরার নয়। আর, আপনাদের সঙ্গে আমরাও থাকব।'

'আমরা মানে?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যাসটন।

'আমি, ন্যাট বেল,' বলল রানা। 'আরও হয়তো দু'একজন।'

মাথা নাড়লেন ড. ফেরেল। 'দুঃখিত, আপনার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। স্কুইড আমার সারা জীবনের সাধনা। আজ হঠাৎ পেয়েছি, পরে কখনও পাব কিনা জানি না। কাজেই এটাকে আমি মারতে রাজি নই। প্রথমে জ্যান্ত ধরব, মারার প্রশ্ন পরে।' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, অর্থাৎ রানাকে এবার যেতে হবে।

হুইলটা বিরাট, সামলাতে দুই হাত আর সমস্ত মনোযোগ দরকার হয়। স্টেনলেস স্টীলের একটা বৃত্ত, একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত চার ফুট। এমন আচরণ করে, ওটার যেন নিজস্ব প্রাণ আছে, মেয়ে বলে দয়া করে না। হুইলটা বেয়াড়া ঘোড়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে সুসিকে।

সমাধান হলো, কে কর্তৃত্বে রয়েছে তা দেখিয়ে দেয়া, তাহলেই নরম আচরণ করবে।

তিন দিন তিন রাত অপেক্ষা করার পর হেল্‌ম্‌ হাতে পেয়েছে সুসি, কাজেই তার কোন ভুল করা চলবে না। ওর বাবার কথা হলো, সাগরে একটা বোটকে ঠিকমত চালানো অত্যন্ত কঠিন, মনোযোগ তো লাগেই, প্রচুর শারীরিক শক্তিও দরকার হয়। সুসির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাঁকে সমর্থন করেছে পিয়ার্স আর মাইকেল, বাকি সবাইও মুখ টিপে হেসেছে। ভাবটা যেন, কাজটা মেয়েদের নয় বলতে পেরে সবাই গর্বিত।

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে সুসি, হাঁটু দুটো দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে হুইল পোস্ট, আর এত জোরে ধরে আছে হুইলটা যে ব্যথা শুরু হয়েছে আঙুলগুলোয়। টন টন করছে বাহুর পেশী।

ওর পাশে কুশনের ওপর বসে রয়েছে পিয়ার্স, সামনে, ডেকের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে এমারসন আর টমাস। ওদের কারও কোন কাজ নেই এখন, পালাবদলের সময় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

'হুইল একটু ঘোরাও,' বলল পিয়ার্স।

'কেন?'

'কারণ মেইন সেইলে লাফ পতপত করছে।' হাত তুলে মেইন সেইলের মাথাটা দেখাল পিয়ার্স। 'আশ্চর্য, আবার জিজ্ঞেস করে—কেন!'

মুখ তুলল সুসি, নীল আকাশের গায়ে সাদা পালটা ধাঁধিয়ে দিল চোখ। ঠিক বলেছে পিয়ার্স। অস্বস্তি বোধ করল সে, ব্যাপারটা তার নিজেরই দেখতে পাওয়া উচিত ছিল। কিংবা শুনতে পাওয়া। আসলে লাফটা এত ছোট, এত তাৎপর্যহীন, কিছু আসে যায় বলে একবারও মনে হয়নি তার।

হুইলটা ডান দিকে ঘোরাল সুসি, দেখল সেইলের ঝুলে থাকা কিনারা কাঁপুনি বন্ধ করেছে। স্টারবোর্ডের দিকে কাত হয়ে পড়ল বোট, হুইল পোস্টে পা বাধাতে হলো তাকে।

'এই তো হয়েছে,' বলল পিয়ার্স।

'ধন্যবাদ। তুমি দেখতে পাওয়ায় সত্যি আমি দারুণ খুশি। কোন সন্দেহ নেই, এবার আমরা জিতবই জিতব।'

'কী আশ্চর্য, এটা একটা রেস, সুসি!'

'তাই তো!'

দৃষ্টিসীমার ভেতর আর কোন বোট দেখা যাচ্ছে না। ক'টা যেন অংশগ্রহণ করছে? পঞ্চাশটা, নাকি একশোটা? ঠিক জানা নেই সুসির। তবে অনেকগুলো। স্টার্টিং লাইন দেখে মনে হচ্ছিল দাঙ্গা বেধে গেছে—আগুপিছু করছে বোটগুলো, লোকজন গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে, চারদিকে হর্ন বাজছে। তবে সময় যত পেরিয়েছে ততই কমে গেছে সংখ্যাটা। সাগর যেন একটা একটা করে গিলে ফেলছে ওগুলোকে। আসলে কি ঘটছে জানে সুসি। প্রত্যেক ক্যাপটেন তাঁর নিজ স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করছেন, ইচ্ছে করেই সরে যাচ্ছেন নিজের পথ থেকে, অভিজ্ঞতা ও অনুমানের সঙ্গে কাজে লাগাচ্ছেন কমপিউটার— একটাই উদ্দেশ্য, স্রোত আর ঢেউয়ের সঙ্গে বাতাসের সহায়তা পাওয়া, তাহলেই সবার চেয়ে এগিয়ে থাকা সম্ভব হবে।

তবে এরকম একটা সমুদ্রে একা থাকতে কেমন যেন একটা ভয় ভয় লাগে। বোটটা প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা, নিচের অংশটাকে একটা বাড়ি বলে মনে হবে। কিন্তু ওপর থেকে…দু'পাশে ঢেউ, দিগন্তরেখা প্রতি মুহূর্তে যেন আরও দূরে সরে যাচ্ছে, একদম খালি আকাশ। ওরা যেন অলৌকিক একটা অভিযানে বেরিয়েছে, যেখানে কেউ কোনদিন যেতে সাহস পায় না।

সুসির বাবা হ্যাচের ফাঁক দিয়ে মাথা তুললেন। 'কেমন চলছে, সুসি?'

'ফাইন, ড্যাডি।'

'কেমন করছে ও, পিয়ার্স?'

ভাল কিছু বলো, মনে মনে অনুরোধ করল সুসি। সাধারণ ভাইদের মত স্বার্থপর হয়ো না।

'বেশ ভালই তো…,' বলল পিয়ার্স।

ধন্যবাদ!

'…মাঝে মধ্যে একটু শুধু অন্যমনস্ক।'

ওরে পাজি!

'রাডারে এইমাত্র বারমুডাকে পেয়েছি আমরা। ফিফটি-মাইল রিঙের কোণে।'

'গ্রেট!' বলল সুসি, মনে হলো ঠিক এই কথাটাই বলা উচিত।

'শিওর ইজ। এর মানে হলো, সারারাত বোট চালাতে পারব আমরা, আর ভাগ্য ভাল হলে ভোরের দিকে চ্যানেলে পৌঁছে যাব। কাজটা আমরা রাতে করতে চাই না।'

'গড, নো,' বলল পিয়ার্স। 'গত বছরের কথা মনে আছে?'

'আর মনে করিয়ে দিয়ো না।'

হ্যাঁ, সুসি ভাবল, গত বছর। যখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। সমস্ত আনন্দ আর উত্তেজনা তখনই তো ঘটে, আমি যখন সেখানে থাকি না।

তার বাবা হ্যাচের ভেতর মাথা গলিয়ে নেবেন, তারপর কি ভেবে বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার…বারমুডা হারবার রেডিও একটা নোটিশ প্রচার করছে, জেলে আর নাবিকদের জন্যে। কি একটা জন্তু নাকি হামলা করছে বোটে।'

'তিমি?' জিজ্ঞেস করল সুসি। 'হয়তো পাগলামি শুরু করেছে।'

'কি জানি। ওরা হয়তো ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করতে চাইছে, মানুষকে আবার বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গেলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে। যাই হোক, ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। যখনই কেউ নড়াচড়া করবে, সঙ্গে যেন লাইফলাইন থাকে।'

'ড্যাডি,' হেসে উঠে বলল সুসি, 'সাগর একেবারে শান্ত!'

'জানি, সুসি, তবে সাবধানের মার নেই।' হাসলেন তিনি। 'তোমার মাকে কথা দিয়েছি, তোমার জন্যে তিনগুণ সতর্ক থাকব আমি।' পিয়ার্সকে ইঙ্গিতে কিছু বলে নিচের কেবিনে নেমে গেলেন তিনি।

সুসির লাইফ জ্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল পিয়ার্স, সেটা থেকে লাইফলাইন খুলল, তারপর ইস্পাতের রিঙটা আটকে দিল হুইল পোস্টে।

'আর তোমারটা? তুমি তো এমন কি লাইফ জ্যাকেটও পরোনি।'

'এই রেসে এবার নিয়ে তিনবার অংশ নিচ্ছি আমি,' বলল পিয়ার্স। 'একটা বোটে কিভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়, আমি জানি।'

'আমিও জানি!'

'যাও, ড্যাডির সঙ্গে তর্ক করো, আমার সঙ্গে নয়। আমি শুধু নির্দেশ পালন করছি।' বোনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল পিয়ার্স, তারপর কুশনের ওপর শুয়ে পড়ল।

নাড়াচাড়া করে আঙুলের আড়ষ্ট ভাব দূর করার চেষ্টা করল সুসি, কাঁধ দুটো বার কয়েক উঁচু-নিচু করল। কব্জিতে কোন ঘড়ি নেই, জানে না আরও কতক্ষণ এই বেয়াড়া হুইলের সঙ্গে লড়তে হবে তাকে। খুব বেশিক্ষণ বোধহয় নয়, আশা করল সে। আর কিছুক্ষণ দেখবে, তারপর না হয় পিয়ার্সকে হুইল ধরতে বলবে। কিন্তু না, পিয়ার্স তাহলে কৌতুক করতে ছাড়বে না।

সহজে হার মানার পাত্রী সে নয়। এবারের ট্রিপে আসার জন্যে জেদ

তো ধরেই ছিল, আগেভাগে বলেও রেখেছে যে সবার মত তাকে দিয়েও কাজ করাতে হবে। সুসি জানে, তার ভায়েরা কেউ তাকে নিয়ে আসতে চায়নি। তার হয়ে বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে মা—সমান অধিকারের প্রশ্ন তুলেছে। মা সমর্থন না করলে ফার হিল-এ ফিরে যেতে হত তাকে, বাচ্চা মেয়েদের টেনিস শেখাবার কাজে। সে বোঝা নয়, বরং সম্পদ, এটা প্রমাণ করার সুযোগ করে দেয়ায় মায়ের প্রতি ঋণী সুসি।

তবে রেসটা শেষ হবার অপেক্ষায় থাকতে এখন সত্যি ভাল লাগছে না তার। রেস শেষ করে বারমুডায় দু'দিন থাকবে ওরা, সৈকতে শুয়ে রোদ পোহাবে সুসি, একটা মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরে-ফিরে দেখবে দ্বীপটা। বাবা আর ভায়েরা ইয়ট ক্লাবে বসে সেইলিং নিয়ে আলোচনা করবে। তারপর প্লেনে করে বাড়ি ফিরে যাবে সুসি। সেরকমই কথা হয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

তীর ঘেঁষে, দিনের বেলা, পাল তোলা বোট নিয়ে ঘোরার অভ্যাস আছে তার। এক দু'ঘণ্টা পানিতে কাটানোর মধ্যে মজা আছে, বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ আছে, মাঝে মধ্যে বোট উল্টে গেলেও ভাল লাগে। কিন্তু এই ব্যাপারটা, দিনের পর দিন কষ্ট করা, এরচেয়ে একঘেয়ে ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। কেউ তারা চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমাচ্ছে না। কেউ গোসল করছে না। একবার শাওয়ারের নিচে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল সুসি, দু'বার পড়ে যায়, সোপ ডিশে বাড়ি খেয়ে কেটে যায় খুলির চামড়া। কাজেই সময় সুযোগ পেলে স্পঞ্জ দিয়ে শরীর মুছে নিতে হয় তাকে। কিন্তু তাতে কি আর ঘামের গন্ধ যায়। শুধু ঘামের গন্ধ না, গোটা বোট থেকে ভেজা কম্বলের মত গন্ধ আসছে। টয়লেটগুলো ব্যবহার করা শিখতে হলে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী দরকার হবে। দুটোই দিনে অন্তত একবার আটকে যাবে। আর প্রতিবারই দোষ চাপবে

সুসি ও মাইকেলের গার্লফ্রেণ্ড নিভিয়ার ওপর, মেয়েরা যেন মেরিন স্যানিটেশনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। সুসিঁকে একটা পদ ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে—'অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ কুক অ্যাণ্ড বটল ওয়াশার'। বাজে একটা কৌতুক ছাড়া কিছু নয়, কারণ বোট যখন তখন কাত হয়ে পড়ায় কেউ যেখানে সিধে হয় দাঁড়াতেই পারছে না সেখানে ভাল কিছু রাঁধবে কিভাবে? সব বাদ দিয়ে একটা কাজই ঠিকমত করতে পারছে সে, রাত দিন যার যখন সুপ বা গরম কফি দরকার হয়, যোগান দিয়ে যাচ্ছে। আরও যদি কারও কিছু দরকার হয়, একটা ডিশে একগাদা স্যাণ্ডউইচ রাখা আছে।

ক্ষতিপূরণের জন্যে ভাল কিছু থাকলে খারাপগুলো মেনে নিতে পারত সুসি। কিন্তু কই! ওশেন রেসিং মানে হলো, বিশেষ করে ভাল আবহাওয়ায়, চুপচাপ বসে থাকা আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু গল্প করা। সারাদিনে খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টার জন্যে উত্তেজনা দেখা দেয়, ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই, কিন্তু সে ব্যস্ততায় তার অবদান হলো দূরে সরে থাকা।

হাত আর কাঁধ এবার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কোন উপায় নেই, পিয়ার্সকে দিতেই হবে হুইল। কিন্তু কি ভাগ্য, হঠাৎ করেই পালাবদলের সময় হয়ে গেল। তার বাবা আর চাচা হ্যাচ বেয়ে উঠে এলেন তাকে আর পিয়ার্সকে রেহাই দিতে, চাচাতো দুই ভাই বোটের সামনে চলে গেল মাইকেল আর টমাসের কাছ থেকে দায়িত্ব নিতে।

'গুড জব, সুইটহার্ট,' হুইলের পিছনে বসে বললেন তার বাবা। 'রাইট অন কোর্স।'

'ঠিক কি রকম করছি আমরা, বুঝতে পারছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল পিয়ার্স।

'বলা কঠিন। আমাদের শ্রেণীর আরও দু'চারটে বোট এগিয়ে

আছে, আমরা সম্ভবত তৃতীয় অবস্থানে আছি। রাডারে বোটের কোন অভাব নেই, তবে সেগুলো কি বলতে পারছি না।'

ইস্পাতের রিঙ থেকে লাইফলাইন খুলে নিয়ে নিচে চলে এল সুসি। লাইফ জ্যাকেট খুলে ছুঁড়ে দিল বাঙ্কের ওপর। তাকে পাশ কাটিয়ে ফোকাসেল-এ চলে গেল পিয়ার্স, আছড়ে পড়ল একটা বাঙ্কে, পা থেকে জুতো পর্যন্ত খুলল না। এখানে দুর্গন্ধ থাকবে না তো কি থাকবে।

সুসি ঠিক করল এক কাপ সুপ খেয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে বই পড়বে। আর তো কিছু করার নেই।

বাবার চিৎকার শুনতে পেল সে। 'রেডি অ্যাবাউট!' মাথার ওপর ফাইবারগ্লাসে পায়ের শব্দ হচ্ছে। টপ বাঙ্কের রেইলিং আঁকড়ে ধরল সে, ওখানে ঘুমের মধ্যে করাতের অনুকরণে নাক ডাকছে নিভিয়া।

কাত হলো বোট, আবার সিধে হলো। নতুন পাল তোলা হচ্ছে, বুঝতে পারল সুসি। বাতাস পেয়ে সেটা ফুলে ওঠার সময় হুস করে একটা জোরাল শব্দ হলো, আবার কাত হয়ে গেল বোট। সিঙ্ক থেকে আওয়াজ ভেসে এল, নোংরা কাপগুলো পরস্পরের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে।

কাপগুলো ধুয়ে রাখা উচিত ছিল। কাজটা তার। তবে কাজটা নিভিয়ারও, কিন্তু সে এড়িয়ে গেছে। ঠিক আছে, পরে ধোবে সে। একটা কাপ ধুয়ে সুপ ভরল, ঘন ঘন চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল।

বাঙ্কে ফেরার পথে রাডার স্ক্রীনের ওপর চোখ বুলাল সুসি। সবুজ ভিডিও গেমের মত আভা ছড়াচ্ছে। হলুদ রেখা ঘড়ির কাঁটার মত একটা বৃত্ত জুড়ে ঘুরছে, ঘোরার পথে সোনালি ব্লিপ দেখাচ্ছে। সুসি জানে, প্রতিটি ব্লিপ একটা করে বোটের প্রতিনিধিত্ব করছে। স্ক্রীনের মাথার দিকে এবড়োখেবড়ো একটা দাগ। হ্যালো, বারমুডা, মনে মনে বলল সুসি। আমার জন্যে খানিকটা রোদ রেখো। আর, যদি সম্ভব হয়, সুদর্শন একজন লাইফগার্ড। সেইলবোটকে অপছন্দ করে, এমন একজন।

স্ক্রীনের দিকে তাকিয়েছে বলে খুশি হলো নিজের ওপর। এখন আর আগের মত একা লাগছে না ওর।

বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে রোমান্টিক উপন্যাস পড়ছে সুসি। হঠাৎ অনুভব করল, তাকে টয়লেটে যেতে হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাঙ্ক থেকে নামল সে, বোটের পিছন দিকে যাচ্ছে। চার্ট টেবিলকে পাশ কাটিয়ে টয়লেটের দরজা খুলল। গন্ধটা নাকে যেন ঘুসি মারল। তাকাবার দরকার ছিল না, তবু তাকাল, আর যা দেখবে বলে ভয় করেছিল তাই দেখল—আবার আটকে গেছে। ফ্লাশ পেডালে পায়ের চাপ দিল, পাম্প হ্যাণ্ডেলও টানাটানি করল, কিন্তু ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনে বুঝল চেষ্টা করতে নিষেধ করা হচ্ছে।

সামনে চলে এসে দ্বিতীয় টয়লেটের সামনে দাঁড়াল সুসি। দরজা বন্ধ, কবাটের গায়ে মার্কিং পেন দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে, 'আউট অব অর্ডার'।

চমৎকার।

নিজের বাঙ্কে ফিরে এসে দেরাজ থেকে নিজের ইমার্জেন্সী ল্যাভাটোরি বের করল সুসি—খালি একটা জার, এক কোয়ার্ট পানি ধরবে।

পিছনের টয়লেটে চলে এল সে, জারে প্রস্রাব করার সময় দম আটকে রাখল, মনে মনে শুধু ভাবছে, প্লীজ, ভোর তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। ঘুম থেকে উঠে যেন দেখি ডকে পৌঁছে গেছি আমরা…।

কাজ শেষ করে জারের স্ক্রুটা শক্ত করে বন্ধ করল সে, হ্যাচ বেয়ে উঠে এল ওপরে।

'লাইফ জ্যাকেট,' তার বাবা বললেন।

'আমি তো শুধু…' হাতের জারটা দেখাল সুসি।

'তারমানে দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, আবার।'

'লর্ড…ঠিক আছে, পালাবদলের পর অন্তত একটা পরিষ্কার করব।'

নাক টানলেন চাচা ম্যাকফারসন, বললেন, 'লেডিস… ।'

'আঙ্কেল ম্যাকফারসন,' বলল সুসি, 'বায়োলজিতে আমি খুব ভাল না, তবে আমার ধারণা পুরুষরাও বাথরূমে যায়…মাঝে মধ্যে।'

'আমার ভুল হয়েছে,' বললেন চাচা, হাসছেন।

'দাও,' বলে হাত বাড়ালেন তার বাবা, জারটা নিতে চাইছেন।

'না, আমিই পারব,' বলল সুসি।

'তাহলে আগে লাইফ জ্যাকেট পরো।'

'ড্যাডি…আচ্ছা, ঠিক আছে।' মই বেয়ে পিছিয়ে এল সুসি, নিজের বাঙ্কে ফিরে এসে লাইফ জ্যাকেট পরল। রেগে গেছে সে, বিব্রত বোধ করছে। আর কেউই তো লাইফ জ্যাকেট পরেনি, অথচ ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বানরের মত। তিন পা এগিয়ে বোটের কিনারা থেকে জারটা খালি করবে, তবু বলে কিনা লাইফ জ্যাকেট পরো।

লাইফ জ্যাকেট পরে নিল সুসি। ভাবছে, কিন্তু বোকা তুমি কাকে বলো? কাজটা তুমি বাবাকে করতে দিলে না কেন? কারণ… । কারণ, কি? কারণ ব্যাপারটা ব্যক্তিগত, প্রাইভেট। ঘোড়ার ডিম! বাবা তোমার ডাইপার বদলে দিত! যাক গে, এখন আর এ-সব ভেবে লাভ কি।

হ্যাচ বেয়ে ওপরে উঠে এল সে, হুইল ঘুরে বোটের লীওয়ার্ড সাইডে যাচ্ছে। পশ্চিম দিগন্তের একেবারে কাছাকাছি নেমে গেছে সূর্য, ঢেউগুলো উঁচু হলে আড়ালে পড়ে যাচ্ছে, আর বড় সেইলটার ছায়ার ভেতর এই জায়গাটা আবছা অন্ধকার হয়ে আছে।

'লাইন আটকাও,' তার বাবা বললেন।

'জ্বী, হুজুর।' দুটো পোল-এর মাঝখানে টান টান হয়ে থাকা সিকি ইঞ্চি কেবলে লাইফ লাইন আটকাল সুসি।

'জানি, ব্যাপারটা তোমার কাছে হাস্যকর লাগছে, কিন্তু তোমার ব্যাপারে আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'জানি, কারণ আমি তোমার একমাত্র পুতুল।' একটু বোধহয় ব্যঙ্গ বা কৌতুকই করা হলো, তবু না বলে পারল না সুসি।

জারের ক্যাপ খুলল সে, পোল-এর সঙ্গে চেপে ধরল একটা হাঁটু, জারটা খালি করার জন্যে ঝুঁকল বোটের বাইরে। তার হাতের তুলনায় জারটা বড়, উল্টো করতে গিয়ে পিছলে গেল। স্বাভাবিক প্রবণতায় অপর হাত দিয়ে ওটাকে ধরার চেষ্টা করল সে, সেই সঙ্গে ক্যাপটা মুঠো থেকে খসে পড়ল, ফলে সেটাকেও খপ করে ধরতে গেল, আর ঠিক তখনই হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে লাগল বোটে। ধাক্কা খেয়ে গতি বেড়ে গেল বোটের। সুসি অনুভব করল, পোল থেকে ছুটে গেছে তার পা। শরীরটা যেহেতু বোটের বাইরে ঝুলে ছিল, ভারসাম্য না থাকায় পতন শুরু হলো, ডিগবাজি খেয়ে নেমে যাচ্ছে।

সেই এক পলকে সুসি জানত লাইফলাইন তাকে ধরে রাখবে, দোল দিয়ে ফিরিয়ে আনবে বোটের গায়ে। শরীরটা শক্ত করল সে, হাত দুটো মাথায় তুলল। লাইফলাইনে টান পড়তে একটা ঝাঁকি খেলো সে। শুনতে পেল তার গলা থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসছে, শব্দটার সঙ্গে আরও কিসের একটা আওয়াজ ঢুকল কানে, কি যেন ছিঁড়ে গেল। আর তারপর, যেখানে বোটের গায়ে ধাক্কা খাবার কথা তার, তা না খেয়ে পড়ে গেল...পানিতে।

পানির তলায় তলিয়ে গেল সুসি, নিচের দিকে মাথা ওপর দিকে পা। অবশ্য লাইফ জ্যাকেট সিধে করল তাকে, পানির ওপর মাথা তুলল সে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, চোখে চুল। হাত ঝাপটা দিয়ে সরাল ওগুলো, তারপরও পানি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকে নীলচে-কালো পানি আর বড় বড় ঢেউ শুধু।

এ হতে পারে না! ঘটনাটা কি? লাইফ জ্যাকেটের দিকে তাকাল সুসি, লাইফলাইন যেখান থেকে ছিঁড়ে গেছে সেখানে এবড়োখেবড়ো একটা গর্ত দেখতে পেল।

বাবার চিৎকার শুনতে পাচ্ছে সুসি, আরও অনেকে চিৎকার করছে, যদিও দুর্বোধ লাগছে শব্দগুলো। পানিতে হাত ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ঘোরাল সে। ওই তো, অস্তগামী সূর্যের গায়ে আঁকা ছবির মত টপ মাস্টটা দেখা যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। পতপত করে উড়ছে সেইল, চিৎকার-চেঁচামেচি অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

তার নিচে থেকে ফুলে উঠল একটা ঢেউ, তুলে নিয়ে এল মাথায়। এবার পুরো মাস্তুল আর কেবিনটাও দেখতে পেল সে। চিৎকার করল সে, কিন্তু অনুভব করল—না, সে জানে— বাতাস তার চিৎকার ছিনিয়ে নিচ্ছে, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুবদিকে, অন্ধকারের ভেতর।

ঢেউটা চলে গেল, এখন সে নিচের পানিতে। বোটটা দেখতে পাচ্ছে না, এমনকি মাস্তুলটাও না।

পানিতে কি যেন একটা অনুভব করল সুসি, ঘিরে ধরছে তাকে—একটা কাঁপুনি, অত্যন্ত অস্পষ্ট, তবে অনুভব করা যায়।

এঞ্জিন! ওরা এঞ্জিন চালু করেছে! চিন্তার কিছু নেই, এবার ওরা দিক বদলে দ্রুত তার কাছে চলে আসতে পারবে চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবার আগেই।

আরেকটা ঢেউ ছুটে এল, সেটার মাথা থেকে আবার মাস্তুলটা দেখতে পেল সুসি, মনে হলো আরও অনেক দূরে সরে গেছে। তবে মাস্তুলের মাথায় সবগুলো আলো জ্বলছে এখন—মাস্টহেড লাইট, রানিং লাইট, অ্যাঙ্কার লাইট—সে যাতে বোটটাকে দেখতে পায়।

আবার চিৎকার করল সুসি, হাত নাড়ল, যদিও এখন ওরা তার চিৎকার শুনতে পাবে না। কি করে পাবে, এঞ্জিন চালু রয়েছে না!

কিন্তু ওরা তার কাছ থেকে এখনও দূরে সরে যাচ্ছে কেন? বোটটা ঘুরিয়ে নিচ্ছে না কেন?

তারপর বোট ঘুরতে শুরু করল। ডান দিকে ফিরছে বো। প্রায় একটা বৃত্ত রচনা করে ফিরে আসছে তার দিকে। এবার ওরা তাকে খুঁজে পাবে।

ঢেউয়ের মাথা থেকে নিচে নামল সুসি, পানি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

সে যদি ওদেরকে দেখতে না পায়, ওরা তাহলে কিভাবে তাকে দেখতে পাবে? ওরা তাকে পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে দেখতে পাবে। সে কতটা উঁচু হতে পারবে? দু'ফুট?

শক্তি বাঁচাও, নিজেকে বলল সুসি। চিৎকার কোরো না। ঢেউয়ের মাথায় না উঠে হাত নেড়ো না।

একটা ঢেউ এসে মাথায় তুলে নিল তাকে, আবার বোটটাকে দেখতে পেল সে, প্রায় পুরোটাই···কিন্তু ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অন্য একদিকে। চিৎকার করল সে।

আবার ঢেউ তাকে নিচে নামিয়ে দিল, মাথা ঘুরিয়ে পশ্চিম দিকে তাকাল সুসি। সূর্য ডুবে গেছে, দিগন্তে রেখে গেছে শুধু গোলাপী আভা। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের গায়ে লালচে কিনারা সহ মেঘ দেখা যাচ্ছে। সরাসরি মাথার ওপর তারা দেখতে পাচ্ছে সে।

একটু পরই অন্ধকার হয়ে যাবে। যেভাবে হোক তাকে ওদের খুঁজে পেতে হবে, তা না হলে···।

সে-কথা এমন কি চিন্তাও কোরো না।

মেরি, কি ঠাণ্ডা! ওহ্ গড, এত তাড়াতাড়ি শীত করছে কেন তার! মাত্র তো কয়েক মিনিট পানিতে রয়েছে, অথচ হাত আর পা কাঁপতে শুরু করেছে, পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে দাঁতগুলো, ঠাণ্ডায় বন্ধ হয়ে

আসছে শ্বাস-প্রশ্বাস।

সমুদ্রের ঠাণ্ডা গভীরে ঝুলে আছে জলদানব। কোন হুমকি সম্পর্কে সচেতন নয়। শান্ত ও স্বাভাবিক। ভেসে যাচ্ছে।

বেশিক্ষণ হয়নি খেয়েছে ওটা, কাজেই শিকার করার কোন তাগাদা অনুভব করছে না।

কিন্তু হঠাৎ, দূর কোথাও থেকে, একটা স্পন্দন বা কাঁপুনি পানির ভেতর দিয়ে এসে টোকা মারল ওটার দেহে।

উদ্বেগে নয়, কৌতূহলে টেইল ফিন নেড়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল জলদানব।

পথে যদি গরম পানি পেত, এগোত না আর, কারণ এখন আরামই তার একমাত্র কাম্য। কিন্তু ঠাণ্ডা পানির স্রোত ওপরেও বইছে, ফলে উঠে আসছে ওটা।

এবার আলো অনুভব করতে পারছে। কাঁপুনিটাও কাছে চলে এসেছে। স্পন্দন ছাড়াও অন্য কি যেন একটা আছে ওপরে, আলোড়িত করছে পানিকে।

জ্যান্ত কিছু একটা।

[আগামী খণ্ডে সমাপ্য]

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও ১৬পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৮-৫-৯৫ বড় ক্ষুধা ২ রানা ২২৮ কাজী আনোয়ার হোসেন

বিষয়: ড. আলবার্ট ফেরেল মই বেয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে আসছেন, তাঁকে দেখে ফেলল জলদানব। দুটো চাবুকের একটা কুণ্ডলী পাকাল, এলোপাতাড়ি উড়ছে, একটা কিছুর স্পর্শ পেলেই পেঁচিয়ে ধরছে সেটাকে—ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে সাগরে। হঠাৎ স্থির—এবার দেখতে পেয়েছে রানাকে।

২২-৫-৯৫ বিষের ভয় (তিন গোয়েন্দা) রকিব হাসান

বিষয়: কল্পনাই করতে পারেনি তিন গোয়েন্দা সাধারণ চোর পাহারা দেয়ার ঘটনা তাদেরকে নিয়ে যাবে ভয়াবহ ফ্লোরিডা এভারগ্লেডের গভীরে। সাপের কামড় খেলো মুসা। আটকা পড়ল কিশোর আর রবিন। উদ্ধারের কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

আরও আসছে

১৫-৫-৯৫	কিশোরপত্রিকা	(৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২)
২৮-৫-৯৫	রহস্যপত্রিকা	(১১ বর্ষ ৮ সংখ্যা জুন, ১৯৯৫)

মাসুদ রানা
বড় ক্ষুধা
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনা

বড় ক্ষুধা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ড. আলবার্ট ফেরেল মই বেয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে আসছেন, এই সময় তাঁকে দেখে ফেলল জলদানব। দুটো চাবুকের একটা কুণ্ডলী পাকাল, পরমুহূর্তে সেটা ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লম্বা হলো শূন্যে, তারপর লাফ দিল সামনের দিকে। ওটাকে আসতে দেখে এড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি, মই থেকে পিছলে খসে পড়ল পা দুটো, একটা ধাপ ধরে ঝুলে পড়লেন। মইটাকে ঘিরে ফেলল চাবুক, পেঁচাল, তারপর এক টানে মট করে বোটের বাল্কহেড থেকে ভেঙে ফেলল। ফ্লাইং ব্রিজের মাথার ওপর তুলে ফেলছে, এখনও সেটা ধরে ঝুলছেন ড. ফেরেল।

তারপর বোটটাকে ভাঙতে শুরু করল জলদানব। চাবুক দুটো চারদিকে এলোপাতাড়ি উড়ছে, একটা কিছুর স্পর্শ পেলেই পেঁচিয়ে ধরছে সেটাকে—মোটা রশির কুণ্ডলী পাকানো স্তূপ, হ্যাচ কাভার, অ্যান্টেনা মাস্ট— আছাড় মেরে ভাঙছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে সাগরে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল, এবার দেখতে পেয়েছে মাসুদ রানাকে।

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ২২৮

বড় ক্ষুধা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সাতাশ টাকা

ISBN 984 16 7228 6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আবদুল আলীম

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-228
BODO KHUDHA
Part-2
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত : *এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না*

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা *বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা
মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয়
শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ
কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা
কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত
ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ
জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ
অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা।

এক

একটা ঢেউ এসে মাথার ওপর তুলে নিল সুসিকে, বোটটাকে দেখতে পেল সে, পুরোটা—কাছাকাছি! প্রায় অন্ধকার আকাশের গায়ে গাঢ় একটা আকৃতি, মাস্তুলে জ্বলছে সাদা, লাল আর সবুজ বাতি।

চিৎকার করে হাত নাড়ল সে, তারপর পানির ঢাল বেয়ে ঢেউয়ের মাথা থেকে আবার নেমে এল নিচে।

ওরা তাকে দেখতে পায়নি, চিৎকারও শুনতে পায়নি। কেন! এত কাছে ওরা! ওদের আওয়াজ তো শুনতে পেল সে—এঞ্জিনের শব্দ, এমন কি বোধহয় একটা গলাও শোনা গেল।

বাতাসের উল্টোদিকে রয়েছে, তাই। শব্দগুলো ওদের দিক থেকে তার কাছে ভেসে আসছে, কিন্তু তার কাছ থেকে ওদের দিকে ভেসে যাচ্ছে না।

অন্ধকার। অন্ধকার হয়ে গেছে, প্রায় রাতই বলা যায়। আর ঠাণ্ডা। সমুদ্র এখানে কত গভীর? বোধহয় কোন সীমা নেই। গভীর পানিতে ডুবে যাবে সে? হ্যাঁ, আজ এখানেই তার মরণ। কি আছে গভীর পানিতে? সে কি ডুবে মারা যাবে, নাকি মরার আগে তাকে কষ্ট দেবে অজানা-অচেনা কোন হিংস্র প্রাণী? ঈশ্বর, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও!

এতক্ষণে আতঙ্ক গ্রাস করল সুসিকে। মনে হলো আতঙ্ক একটা বিষ, তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে, টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে প্রতিটা

নার্ভ।

তার বাবা জলদানবের কথা বলছিলেন। সুসি এখন জানে, সেই জলদানবরাই এবার ধরবে তাকে। দুঃস্বপ্নের ছবিগুলো দ্রুত আসা-যাওয়া শুরু করল মনের পর্দায়, যে-সব ছবি অনেক বছর হলো দেখে না সে, শেষবার দেখেছে ছয় কি সাত বছর বয়েসে—বিছানার তলায়, আলমিরার ভেতর, জানালার বাইরে গাছের ডালে কিম্ভূতকিমাকার সব রাক্ষস আর ভূত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে তাকে। সেই বয়েসে যতবার ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে, ঘরে ঢুকে বুকে তুলে নিয়েছে মা, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, বলেছে ভূত বা দানব বলে কিছু নেই।

কিন্তু এখন তাকে অভয় দেয়ার কেউ নেই। কল্পনাই এখন বাস্তব সত্য।

নিজেকে অসম্ভব একা লাগল সুসির, এরকম নিঃসঙ্গতার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না ওর, মনে হলো গোটা পৃথিবীতে ও-ই যেন একমাত্র জীবিত প্রাণী।

মাথার ভেতর একের পর এক প্রশ্ন জাগছে। সমুদ্রে আসার জন্যে কেন জেদ ধরতে গেল? জারটা বাবাকে খালি করতে দেয়নি কেন? কেন, কেন, কেন?

প্রার্থনা করার চেষ্টা করল সুসি, কিন্তু ভাবতে পারল শুধু—এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।

তারমানে কি মারা যাচ্ছে সে?

না!

আবার চিৎকার করল সুসি—কিছু ভেবে নয়, কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্যে নয়—মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবিত প্রাণীর প্রতিবাদ।

আবার একটা ঢেউ ওপরে তুলে নিল তাকে। বোটটাকে দেখতে

পেল সে, এবার আরও কাছে। কিন্তু কি যেন অন্য রকম লাগল ওর।

বোট আছে, তবে স্থির, নড়ছে না। তারপর খেয়াল করল সুসি, বোটের এঞ্জিন কোন শব্দ করছে না। ঢেউটার মাথা থেকে নেমে আসছে, একটা গলা শুনতে পেল। তার বাবা, লাউড-হেইলারে কথা বলছেন।

'সুসান, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছি, যাতে তোমার কথা শুনতে পাই। আমার কথা শুনতে পেলে, আমি থামার সঙ্গে সঙ্গে যত জোরে পারো চিৎকার করো, সুইটহার্ট। ঠিক আছে? এবার চিৎকার করো!'

সুসি ভাবল, বাবা আমাকে সুসান বলল।

চিৎকার করল সে।

সারফেস থেকে একশো ফুট নিচে রয়েছে জলদানব। থেমে আছে, অনুভূতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

ওপর থেকে আসা স্পন্দন বা কাঁপুনিটা থেমে গেছে, তবে সারফেসে আলোড়নটা আছে—ছোটখাট কি যেন একটা, নড়ছে।

জ্যান্ত কিছু।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করল জলদানব।

'আমি তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, সুসান! আবার, আবার!'

আবার চিৎকার করল সুসি। তার গলা ভেঙে গেছে, খুব একটা জোরালো আওয়াজ বেরুল না, তবে গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে বারবার চিৎকার করে যাচ্ছে।

একটা ঢেউয়ে ধাক্কা খেলো, সেটার মাথা থেকে দেখতে পেল চারপাশে ঘোরাফেরা করছে একটা সার্চলাইটের আলো। তারপর

আলোটা এগিয়ে আসতে শুরু করল ওর দিকে। প্রার্থনা করল সে, ঢেউ থেকে নেমে যাবার আগেই যেন আলোটা তার গায়ে পড়ে। কিন্তু না, আলোটা কাছে আসার আগেই ঢেউয়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেল সে। নামছে, নামছে। হাত নাড়ল সুসি। মনে হলো আলোটা তাকে ছুঁতে পারবে না।

একেবারে শেষ মুহূর্তে আলোটা তার উঁচু করা হাতের নাগাল পেয়ে গেল। সুসি দেখল, তার মুঠো করা আঙুলগুলো আলোকিত হয়ে উঠল। তারপর স্থির হলো আলো। লাউড-হেইলার থেকে তার বাবার চিৎকার ভেসে এল, 'পেয়েছি!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ শুনতে পেল সুসি।

পানিতে কাঁপুনিটা আবার শুরু হয়েছে...কাছাকাছি, আগের চেয়ে স্পষ্ট, ছোটখাট জ্যান্ত জিনিসটার দিকে সরে আসছে।

এখন উত্তেজিত, ওপরে উঠতে শুরু করল জলদানব, বদলে যাচ্ছে গায়ের রঙ। ক্ষুধার কারণে উত্তেজিত নয় ওটা, যুদ্ধ করার ঝোঁকও চাপেনি বা মারাত্মক কোন হুমকিও অনুভব করছে না, উত্তেজিত খুন করার নেশায়।

সারফেসের কাছাকাছি উঠে আসায় এতক্ষণে ঢেউগুলো অনুভব করতে পারছে জলদানব।

এরপর আবার যখন একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ল সুসি, সার্চলাইটের তীব্র আলো আঘাত করল চোখে, অন্ধ হয়ে গেল সে। তবে বোটটা আছে, এঞ্জিনের শব্দ পাচ্ছে, নাকে গন্ধ আসছে পোড়া ফুয়েলের।

তার পাশে কি যেন ছলকাল। খুব বড় একটা কিছু। সুসি অনুভব করল, কি যেন তার কোমর জড়িয়ে ধরল। তারপর একটা গলা শুনতে

পেল, 'ব্যাস, ব্যাস, হয়েছে··আর কোন ভয় নেই···তুমি বেঁচে গেছ··· ।'

পিয়ার্স। সুসি দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ভাইকে। অনুভব করল, টেনে তোলা হচ্ছে তাকে, বোটের গায়ে ঠেকল তার হাত।

জ্যান্ত জিনিসটা সরাসরি ওপরে রয়েছে, আলোড়ন তুলছে পানিতে।

আহত একটা প্রাণী।

শিকার।

শিকারের চেয়েও বেশি।

খোরাক!

শরীরের গভীর গহ্বরে বিপুল পানি টেনে নিল জলদানব, পেটের ফানেল দিয়ে বের করে দিল সঙ্গে সঙ্গে, তীর বেগে ছুটল ওপর দিকে।

কয়েক জোড়া হাত সুসিকে ধরে এত জোরে টান দিল, ওর মনে হলো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে ওগুলো। পরমুহূর্তেই বাবা ওকে আলিঙ্গনে আটকে বুকে টেনে নিলেন, বলছেন, 'ওহ্ সুইটহার্ট···ওহ্ বেইবী···ওহ্ সুসান···!'

আরও কয়েক জোড়া হাত টেনে তুলে ফেলল পিয়ার্সকে। ডেকে পড়ে খকখক করে কাশতে শুরু করল সে।

তারপর কে যেন বলল, 'গন্ধটা কিসের?'

সুসি শুনতে পেল আবার স্টার্ট নিল এঞ্জিন, তারপর চলতে শুরু করল বোট।

বাবা তাকে বুকে তুলে নিয়ে আফটার হ্যাচের দিকে এগোচ্ছেন, কয়েকটা গলা ভেসে এল।

'ওহে, দেখো!'

'কি?'

'ওই যে ওদিকে, পিছনে।'

'কোথায়?'

'পানিতে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।'

'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'ওই তো! আমার হাত বরাবর তাকাও।'

'কি? কি ওটা?'

'বুঝতে পারছি না। অদ্ভুত কিছু একটা...।'

'কোন তিমি-টিমি নাকি?'

'মনে হয় না।'

'দূর, বাদ দাও। সুসিকে ফেরত পেয়েছি, সেটাই বড় কথা। ওখানে কি আছে না আছে ভুলে যাও।'

পানির কাঁপুনিটা অস্পষ্ট হয়ে আসছে আবার, জ্যান্ত জিনিসটাও এখন আর নেই।

ঢেউয়ের সঙ্গে মাথাচাড়া দিল জলদানব, হলদেটে-সাদা একটা চোখ পানির পিঠে দৃষ্টি বুলাল। তারপর চাবুক দুটো উঁচু করে ঝাপটা মারল পানির গায়ে—খুঁজছে। কিন্তু কিছুই পেল না, কাজেই আবার তলিয়ে গেল সমুদ্রের অতলতলে।

কম্বলে গা মুড়ে বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে সুসি, বাবা তাকে নিজের হাতে সুপ খাওয়াচ্ছেন। এই হাসছেন এই কাঁদছেন তিনি। তাঁর হাতে ধরা সুপের কাপটা এত বেশি কাঁপছে যে মনে হলো পড়ে যাবে। কাপটা নিয়ে নিজেই খেতে শুরু করল সুসি।

তার ভিজে কাপড়চোপড় খুলে দিয়েছে নিভিয়া। এখন আর নির্লিপ্ত

আর গম্ভীর লাগছে না মেয়েটাকে, এড়িয়েও থাকেনি। কাপড় খুলে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে সুসির শরীর, তারপর নিজের একটা সুইট স্যুট পরিয়েছে।

শাওয়ারে যাবার পথে বাঙ্কের পাশে একবার থামল পিয়ার্স। কোন কথা বলল না, শুধু ঝুঁকে চুমো খেলো বোনের কপালে।

মাইকেল আর টমাস এল, এলেন চাচা, তারপর একে একে সবাই—একজন করে এল, কিছু একটা বলল সুসিকে। না, কেউই বিরূপ কোন মন্তব্য করল না।

নিজেকে বিখ্যাত কোন ব্যক্তিত্ব মনে হতে লাগল সুসির, অনুভূতিটা দারুণ উপভোগ করছে। এতদিন পর এইবার একটা বলার মত গল্প পেয়ে গেছে সে, এখন আর সবাইকে গর্ব করতে শুনলে চুপচাপ বসে থাকতে হবে না তাকে। এতদিন পর উত্তেজনাকর স্মৃতি রোমন্থনে তারও ভূমিকা নিশ্চিত হয়েছে।

চোখ দুটো বুজে এল সুসির। ওর মনে হলো, বারমুডা পর্যন্ত পুরোটা পথ ঘুমাতে পারলে ভাল হয়।

দুই

শ্বাস টানার সময় রানা অনুভব করল, বাতাস খুব ধীরে আসছে, ইতস্তত ভঙ্গিতে, যেন খালি একটা সোডার বোতল শুষছে সে। ওর ট্যাঙ্ক প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পানির ওপর মাথা তোলার আগে আর হয়তো একবার

শ্বাস টানতে পারবে, খুব বেশি হলে দু'বার।

চিন্তার কিছু নেই, সারফেস থেকে মাত্র পাঁচ ফুট নিচে রয়েছে ও। এরপর বাতাস না পেলে মুখ থেকে খুলে ফেলবে মাউথপীসটা, নিঃশ্বাস ছাড়বে, তারপর মাথাচাড়া দেবে পানির ওপর।

তবে শুধু এই বিরক্তিকর কাজটা করার জন্যে ওপরে উঠে ট্যাঙ্ক বদলে আবার নিচে নামার ইচ্ছা নেই ওর। কাজটা শেষ করতে বিশ মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়,অথচ এক ঘণ্টার বেশি, পার করে দিয়েছে। সরকারী বয়া রিপ্লেস করা সহজই, যে-কেউ একজোড়া প্লায়ার্স থাকলেই করতে পারবে। নিজে কখনও করেনি, তবে কিভাবে করতে হয় জানে রানা। চেইন থেকে বয়াটা খোলো, টেম্পোরারি ফ্লোটে চেইন আটকাও, টেনে বয়াটা তোল বোটে, বোট থেকে রিপ্লেসমেন্ট বয়া পানিতে ফেলো, চেইনের সঙ্গে আটকাও সেটা, তারপর নিজের ফ্লোটটা উদ্ধার করো। পানির মত সহজ।

তবে এবার নয়। প্রথমে বেল ওকে চেইনে লাগাবার জন্যে যে রিঙ দিল, সাইজে তা মিলল না, তারপর মিলল না রিঙের জন্যে দেয়া পিনগুলো। সঠিক মাপের পিন যা-ও বা হাতে এল, আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল সেটা। নতুন একটা আনার জন্যে বোটে উঠতে হলো ওকে, কারণ পানির নিচে রানা একা থাকায় এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল বেল যে একটা পিন খুঁজে বের করতে পারল না। তারপর কি হলো? রানা পিন খুঁজছে, বোট হুকটা ফেলে দিল বেল। বয়াটাকে ওই হুক দিয়েই ধরে রেখেছিল সে। স্রোতে পড়ে ভেসে যাচ্ছে বয়া, কাজেই নোঙর তুলে সেটাকে ধাওয়া করতে হলো। উপায় কি, ভ্রমণ বিলাসী তিনশো পাউণ্ড ওজনের একটা ইস্পাতের বয়াকে পানিতে নেমে টেনে-হিঁচড়ে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না!

উচিত ছিল বেলের পানিতে নামা, রানা তাকে একটা একটা করে

ধরিয়ে দেবে ইকুইপমেন্টগুলো। পানিতে সে নামেনি, সেজন্যে অবশ্য তাকে দায়ী করা যায় না। নিজে নামবে, এ সিদ্ধান্তটা রানারই। তবে ওর এরকম সিদ্ধান্ত নেয়ার পিছনে দায়ী বেলই। পানিতে এখন যে-ই নামবে, তাকেই বিরাট একটা ভিলেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, এ-কথা একশো বার শুনতে হয়েছে রানাকে। অন্তত খেয়ে যদি না-ও ফেলে, ভয়ে দম আটকে মারা যেতে হবে তাকে। এ-সব শুনে বাধ্য হয়ে নিজে নামার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে রানাকে।

দম আটকে চেইনের রিঙে পিন সেট করল ও, তারপর হ্যামার দিয়ে ঠুকল। পানির ভেতর হ্যামার খুব ধীর গতিতে নড়ে, আঘাত হানার আগেই বেশিরভাগ শক্তি ব্যয় হয়ে যায়, কাজেই পিনের মাথায় আবার ঘা দিতে হলো ওকে। পানি আর মাস্কের কারণে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটছে, ফলে পিনের মাথায় না লেগে ঘা পড়ল পাশে। রিঙ থেকে ছুটে গেল পিন, নেমে গেল অতল গভীরে।

'শিট!' মাউথপীসের ভেতর চিৎকার করল রানা। ট্যাঙ্ক থেকে শেষবার বাতাস টানল, শুষে নিল সবটুকু অক্সিজেন, বেদিং স্যুটের ওয়েস্ট ব্যাণ্ড থেকে বের করল স্পেয়ার পিনটা। হ্যামার দিয়ে বাড়ি মারল ওটার মাথায়, তাজা মাংসের ভেতর ছুরির মত ঢুকে গেল ভেতরে। প্লায়ার্স দিয়ে প্যাঁচ ঘুরিয়ে আঁট করল, তারপর নিচে চোখ মেলে চারদিকে তাকাল, নিশ্চিত হতে চায় নীলচে অন্ধকার থেকে কোন কিছু এগিয়ে আসছে কিনা ওর দিকে। মুখ থেকে মাউথপীসটা খুলে পা ছুঁড়ল, উঠে এল রোদের ভেতর।

ডাইভ স্টেপে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে বেল। 'শেষ?' জিজ্ঞেস করল সে, হাত বাড়িয়ে রানার ট্যাঙ্ক আর ওয়েট বেল্টটা ধরল, তুলে নিল বোটের ওপর।

মাথা ঝাঁকাল রানা, উঠে পড়ল ডাইভ স্টেপে, তারপর শুয়ে হাঁপাতে

লাগল। 'এখানে আমরা কি করছি, বেল?' দম একটু ফিরে পেতে জিজ্ঞেস করল ও। 'কথা ছিল ভেরো বীচে পিকনিকে যাব, রোদ পোহাবো আর বিয়ার খাব। তার বদলে সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, ডুবে মরার বা স্কুইডের পেটে যাবার ঝুঁকি নিচ্ছি। কেন?'

'ভবিষ্যতের কথা ভেবে, রানা। কাজটা পেয়ে না করতে পারলে ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে যাব আমি।'

'হুম!' বলে চুপ করে গেল রানা।

এর আগে সরকারী বয়া রিপ্লেসমেন্টের কাজ বহু চেষ্টা করেও পায়নি বেল। সেজন্যে অনেক বছর হয়ে গেল কাজটা পাবার আর চেষ্টাও সে করে না। কিন্তু এবার কি হলো, সরকার চ্যানেল বয়া বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুনেই ঠিক করে ফেলল সে-ও টেণ্ডার দেবে। তারপর বিস্মিত হয়ে দেখল—শুধু বিস্মিত নয়, বিব্রতও কম হয়নি সে—তার টেণ্ডারেই সবচেয়ে কম রেট দেয়া হয়েছে, ফলে কাজটা পেয়ে গেছে সে।

কিন্তু কাজটা পাবার পর হিসেব করে দেখা গেল, ফুয়েল সহ অন্যান্য খরচ বাদ দিলে দৈনিক পঞ্চাশ ডলারের বেশি থাকবে না। সরকারী কাজে লাভ এমনিতেই কম, টেণ্ডারটা পাবার লোভে রেটও অস্বাভাবিক কম দিয়েছিল সে। বয়ার সংখ্যা খুব বেশি, কাজেই গাধার খাটুনি খাটতে হবে তাকে। তার ওপর, পানিতে এসে পড়েছে জলদানব। কাজটা পেয়েও করতে পারবে না, এই দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ছিল বেচারা। তার অবস্থা দেখে মায়া হলো রানার, জানাল কাজটা ও-ই করে দেবে।

বেলের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গেছে রানার, বোট নিয়ে সাগরে ঘুরে বেড়াবার শখও মিটে গেছে ওর, এখন বোটটা বেলকে ফিরিয়ে দিলেই পারে। কিন্তু বেচারার আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এখনও তাকে কিছু বলেনি ও। অ্যাকুয়েরিয়ামের কাজটা তো

আগেই গেছে, কোন ডাইভ চার্টার ছাড়া রেসটাও শেষ হয়ে গেছে—রেসাররা তীরে পৌঁছে নিউজউইককে ছাপা খবর আর স্কুইডের ছবি দেখে সিদ্ধান্ত নেয়, ডাইভিং বাদ। এমনকি অগভীর রীফে, যেখানে খুব খারাপ কিছু ঘটলে প্রবালে লেগে হাঁটুর চামড়া একটু ছিঁড়তে পারে, সেখানেও কেউ নামতে চায়নি। জায়ান্ট স্কুইড়ের ছবিটা নিউজউইক সংগ্রহ করেছে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব ন্যাশনাল হিস্টরি থেকে। ওটাই কাল হয়েছে। আজ প্রায় দু'হপ্তা হলো সাগরে আর কোন ঘটনা ঘটেনি, জলদানবকেও দেখা যায়নি, তবু কোন ডাইভার পানিতে নামছে না।

তবে আতঙ্ককে পুঁজি করেও যে ব্যবসা হতে পারে, তার দৃষ্টান্তও তৈরি করছে কিছু লোক। একটা বোটের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে—'স্কুইড হান্টার'। বোটটার খোলের তলা কাঁচের। ট্যুরিস্টদের নিয়ে রীফের কিনারা পর্যন্ত যাচ্ছে বোট মালিক, পানির একশো ফুট নিচে পর্যন্ত দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। পরনে ইণ্ডিয়ানা জোনস-এর মত পোশাক, সে তার পি.এ. সিস্টেম থেকে ভারি গলায় অতিকায় জলদানবের রোমহর্ষক বর্ণনা দিচ্ছে, শুনে আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ট্যুরিস্টদের চেহারা। মাথা পিছু ত্রিশ ডলার, মন্দ কি!

সী শেল আর সিলভার ওয়্যার দিয়ে অলঙ্কার বানিয়ে দেদার বিক্রি করছে এক গিফট-শপ মালিক। তারপর শোনা যাচ্ছে, এক জেলে রীতিমত বড়লোক বনে গেল। ছোট ছোট স্কুইড ধরে ফ্রিজে রাখছে সে, শক্ত হয়ে গেলে ওগুলোর সাহায্যে ছাঁচ তৈরি করছে, তারপর ছাঁচে ফেলে বের করে আনছে পিতল আর তামার স্কুইড। নাম দিয়েছে, জেনুইন মিনিয়েচার বারমুডা ট্রায়্যাঙ্গেল মনস্টার। ট্যুরিস্টরা নাকি লাইন দিয়ে কিনছে।

ইতিমধ্যে এনভায়রনমেন্টাল গ্রুপগুলোর প্রতিনিধিরাও পৌঁছে গেছে

বারমুডায়। 'সেভ দা স্কুইড' শ্লোগান দিয়ে কয়েকটা মীটিংও করেছে তারা। তাদের কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা চাইছে। এই কর্মসূচীর স্থানীয় মুখপাত্র হবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল বেলকে, কিন্তু রাজি হয়নি সে, বলেছে নিজেকে রক্ষা করার দক্ষতা ভালই দেখাচ্ছে জলদানব, তার বা আর কারও সাহায্য না পেলেও চলবে ওটার।

গ্রুপগুলো বারমুডায় এসেছে আটচল্লিশ ঘণ্টাও হয়নি, একদল লোকের সঙ্গে তাদের হাতাহাতি মারামারি হয়ে গেল। বিরোধী দলের সবাই দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে, স্বচ্ছল ও সাহসী জেলে, ভাড়া করা লোক সহ বোট নিয়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে জলদানব ধরার জন্যে। এদের মধ্যে দু'জন, বোট এসে পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে দেখে সী কুইন ভাড়া করতে চেয়েছিল। কিন্তু জেরি হ্যাসটনকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছে বেল, এদেরকেও বোট দিতে রাজি হয়নি।

এক সকালে নাস্তা খেতে বসে প্রসঙ্গটা তুলেছিল রানা। দেখা গেল বেল তার বোট ড. ফেরেল আর হ্যাসটনকে ভাড়া না দেয়ায় তার স্ত্রী এনা স্বামীর ওপর খুশি। এমনকি মোনাও। এনা তার স্বামীকে বোকাসোকা সরল মানুষ বলে জানে, ঝুট-ঝামেলায় তাকে জড়াতে দিতে চায় না। আর ড. ফেরেল ও হ্যাসটন সম্পর্কে সব কথা জানার পর দুই বোনের বক্তব্য হলো, দু'জনেই অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি— দু'জনেরই হারাবার কিছু নেই। তাছাড়া, এনার ভাষায়, 'যে দানব নাস্তা হিসেবে মানুষ খায় আর লাঞ্চ হিসেবে বোট গেলে, তার নাম শুনলে বুকে ক্রস আঁকতে হবে, দূরে সরে থাকতে হবে সাতশো হাত।'

ওদের এ-সব কথা শুনে কোন মন্তব্য করেনি রানা।

শাওয়ারে দাঁড়িয়ে গা থেকে লবণ ধুলো রানা, একজোড়া শর্টস পরল। ইতিমধ্যে ডাইভিং গিয়ার তুলে রেখেছে বেল, লাঞ্চ প্যাকেট

খুলে অপেক্ষা করছে।

লাঞ্চের পর রীফের বাইরের কিনারা ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোল ওরা, উদ্দেশ্য ডকে ফেরা। শহরে একবার থামতে চায় বেল, মেরিন অ্যাণ্ড পোর্ট-এ বিল দাখিল করবে। ওখানে তার এক বন্ধু আছে, কথা দিয়েছে নগদ পেমেন্ট করবে।

'ওদিকে তাকাও,' বলল বেল, ফ্লাইং ব্রিজ থেকে নিচের দিকটা দেখাল। এক জোড়া স্ন্যাপার উল্টো হয়ে ভাসছে, দুটোর মাঝখান দিয়ে চলে এল সী কুইন।

খানিক পর আরও একজোড়া দেখল ওরা, তারপর দেখল কয়েকটা অ্যাঞ্জেল ফিশ, চার কি পাঁচটা সার্জেন্ট মেজর। সবগুলো মরা।

'কি ঘটছে বলো তো?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

পরমুহূর্তে একটা আওয়াজ শুনল ওরা। অনেক দূর থেকে ভেসে এল। ভারি, গভীর, ভোঁতা একটা আওয়াজ। পায়ের তলায় কেঁপে উঠল ইস্পাত, কেউ যেন মুগুর দিয়ে বাড়ি মেরেছে খোলে।

তারপর, আধ মাইল দূরে ডান দিকের গভীর পানিতে, একটা বোট দেখতে পেল ওরা। বোটটার সামনে ঝর্ণার মত উঁচু হয়ে উঠেছে পানি, নেমে আসছে যেন সাগরজলের একটা কুঁজ-এর ওপর। ওরা তাকিয়ে আছে, কুঁজটা মিলিয়ে গেল, যেন হজম করে নিল সাগর, ঝর্ণার ধারা সারফেসে হয়ে উঠল সাদা দাগ।

বিনকিউলার তুলে নিয়ে বোটটার দিকে তাকাল বেল। 'অ্যাকুয়েরিয়ামের বোট,' বলল সে।

থ হয়ে গেল রানা। তারপর বলল, 'তারমানে ড. ফ্যাদম স্কুইডটাকে বোমার সাহায্যে মারতে চাইছেন!'

সানগ্লাস থেকে লোনা পানির ফোঁটা জিভ দিয়ে চেটে নিলেন ড.

আলফ্রেড ফেরেল, তারপর শার্টের কোণ দিয়ে কাঁচ দুটো মুছলেন। একটা ছোট মাছ বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে এসে তাঁর মাথার পিছনে আঘাত করেছিল, ডেক থেকে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বোটের বাইরে ফেলে দিলেন তিনি। পানির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অসংখ্য মরা মাছ চিৎ হয়ে ভাসছে।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি,' বললেন তিনি, অনেক কষ্টে অন্যান্য শব্দ উচ্চারণ করা থেকে বিরত রাখলেন নিজেকে—যেমন, গাধা বা বোকা।

'আরে না, কোন ঝুঁকি নেই, ডক্টর,' বললেন ড. কাইল ফ্যাদম। তাঁর মাথার লম্বা, কোঁকড়ানো ভিজে চুল বিস্ফোরণের ধাক্কায় এলোমেলো হয়ে আছে, মাথার দু'পাশে ঝুলে আছে আগাছার মত। 'বিস্ফোরণ সম্পর্কে পড়াশোনা আছে আমার। আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

বোটের বাইরে তাকালেন তিনি, হাত তুলে ছায়া ফেললেন চোখে। মরা মাছগুলো দেখে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হলেও চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। সিধে হলেন, ঘুরলেন, এক পা এগোলেন, তারপর বোতে দাঁড়ানো লোকজনদের উদ্দেশে চিৎকার করলেন, 'আরও একটা ফাটাও! এটাকে সেট করো একশো ফ্যাদমে।'

হেলমসম্যান একজন গ্রাজুয়েট, সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান, দেখে মনে হবে সেক্স-অ্যাণ্ড-সার্ফার মুভির জনপ্রিয় হিরো। কেবিন থেকে মাথা বের করে জানতে চাইল, 'একশো ফ্যাদম পেতে হলে কত দূর যেতে হবে আমাদের, ড. ফ্যাদম?'

'তোমার ফ্যাদোমিটার ব্যবহার করো, ফর গড'স সেক! কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো নিশ্চয়ই?...নাকি সব কাজ একা আমাকেই করতে হবে?'

'স্যার, বিস্ফোরণের ধাক্কায় এইমাত্র ভেঙে গেছে ওটা!'

'তাহলে ওদিকে চলো!' বললেন ড. ফ্যাদম, গাঢ় পানির দিকে হাত

ছুঁড়লেন তিনি।

খুক করে কাশলেন ড. ফেরেল।

তাঁর দিকে ফিরে ড. ফ্যাদম জানতে চাইলেন, 'আপনি আমার সঙ্গে একমত, জলদানব মারা পড়লে ভেসে উঠবে?'

'যদি,' বললেন ড. ফেরেল, 'যদি আপনি ওটাকে মারতে পারেন। হ্যাঁ।' একমত? আর্কিটিউথিস-এর বায়ালজি সম্পর্কে ড. ফ্যাদম কিছুই জানেন না, এরকম একজন অজ্ঞ লোককে ড. ফেরেল জ্ঞান দান করেন, তাঁর সঙ্গে একমত হন না।

'এমনকি আমরা যখন ওটাকে বিস্ফোরণের সাহায্যে টুকরো টুকরো করে ফেলব, তখনও?'

'হ্যাঁ।' ড. ফেরেল যুক্তি ও তথ্য দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন না, কারণ জানেন এভাবে চেষ্টা করলে কোনদিনই ড. ফ্যাদম স্কুইডটাকে মারতে পারবেন না।

'একশো ফ্যাদম...ছয়শো ফুট নিচে থেকেও সারফেসে ভেসে উঠবে ওটা?'

'যে-কোন গভীরতা থেকে ভেসে উঠবে। আপনাকে আগেই বলেছি, মাংসে অ্যামোনিয়া থাকায় সী-ওয়াটারের চেয়ে হালকা ওটা। ঠিক তেলের মত ভাসবে ওটা, ঠিক...।'

'জানি, জানি,' বললেন ড. ফ্যাদম, ঘুরে গেলেন বোর দিকে।

তিক্ত একটা ঢোক গিললেন ড. ফেরেল, ভাবছেন খর্বকায় বুদ্ধুটার কবল থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করছেন, তিনি যেন একজন নবিস। ভুলটা তাঁরই, ড. ফ্যাদমের প্রস্তাব মেনে নিয়ে এখানে আসা উচিত হয়নি তাঁর।

তবে ফোনে অত্যন্ত বিনয়ী মনে হয়েছিল ভদ্রলোককে। ব্যাকুল অনুরোধ জানান জলদানব নিধন পর্ব চাক্ষুষ করার জন্যে। তারপর

অ্যাকুয়েরিয়ামের বোটে তিনি নিজে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান, চারজন ক্রুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

বোটটা পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা। ক্রুদের মধ্যে একজন বিস্ফোরকের দায়িত্বে আছে—দেখে মনে হবে বমি পেয়েছে তার, হয় নার্ভাসনেসের কারণে, নয়তো সী-সিকনেসের শিকার। পরিচয় পর্ব শেষ হলে তাঁকে একটা লেকচার শোনান ড. ফ্যাদম। এমন একটা সাবজেক্টে, যে সাবজেক্ট নিয়ে সারা জীবন মেতে আছেন ড. ফেরেল। অজ্ঞতারও একটা সীমা থাকে, ড. ফ্যাদম সেটাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ছেলেমেয়েরা দৈত্য-দানোর যে-সব গল্প শুনে ভয় পায়, সেগুলোতেই আরও রঙ চড়িয়ে পরিবেশন করলেন ড. ফ্যাদম।

ইতিমধ্যে বোট ছেড়ে দেয়া হয়েছে, ইচ্ছে করলেও নেমে যেতে পারছেন না ড. ফেরেল। একটা তথ্য সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করলেন তিনি, কঠিন বা ঝগড়াটে সুরে নয়। শুধু বললেন, অতিকায় স্কুইড তিন ধরনের, তাঁর এ তথ্যটা সঠিক নয়। আরও বললেন, বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর ধারণা, বড় আকৃতির স্কুইড উনিশ রকম, একজাতের সঙ্গে অপরটার সূক্ষ্ম কিছু অমিল আছে।

উত্তরে ড. ফ্যাদম তুড়ি মেরে বললেন, 'ওরা কিছু জানে না!' তারপরই প্রসঙ্গ বদলে ফেললেন। ড. ফেরেল বুঝলেন, ভদ্রলোক কিছু জানেন তো নাই-ই, কিছু শিখতেও রাজি নন। আর শুধু তাই নয়, ভদ্রলোক আশা করছেন যা-ই তিনি করুন না কেন, ড. ফেরেল তাঁকে সমর্থন করবেন, তাঁর প্রশংসা করবেন।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ড. ফ্যাদম নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে এত বেশি অজ্ঞ যে উদ্ভট যা কিছু বলছেন সব সত্যি বলে বিশ্বাসও করছেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তাঁর ব্রেন সমস্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে—বাস্তব ঘটনা, অতিরঞ্জিত ঘটনা, মিথ্যে কল্পনা, ফ্যান্টাসী—

তারপর ব্রেনের যেটা পছন্দ সেটা গ্রহণ করছে, বাকি সব বাতিল ঘোষণা করছে।

ড. ফ্যাদম অভিযানের বেশিরভাগ সময় ড. ফেরেলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকছেন, নির্দেশ দেয়ার সুরে আগেই তাকে বলে দিয়েছেন, 'আপনি বোটের পিছন দিকে থাকবেন, ওখানটাই সবচেয়ে নিরাপদ।' নির্দেশ দেয়ার পর নিজের ক্রুদের উদ্দেশে আরেকবার লেকচার দিয়েছেন তিনি, সাবজেক্ট ছিল অতিকায় স্কুইড ও আণ্ডারওয়াটার এক্সপ্লোসিভ।

ড. ফেরেলের পরামর্শ চাওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গে কথা বলারও গরজ অনুভব করেননি ভদ্রলোক। একবারই শুধু কথা বলেছেন, তা-ও বাধ্য হয়ে। তাঁর একজন ক্রু জানতে চেয়েছিল, জলদানব মারা গেছে কিনা জানা যাবে কিভাবে? ওটার যদি সুইম ব্লাডার না থাকে তাহলে তো ভেসে না উঠে তলিয়ে যাবে...নয় কি?

প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিলেন ড. ফ্যাদম। তখন যেচে পড়েই ড. ফেরেল জানান যে স্কুইডের পজিটিভ বয়্যান্সি আছে। তথ্যটা সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্রুদের জানিয়ে দেন ড. ফ্যাদম, ভাব দেখান উত্তরটা তিনি জানতেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে।

ড. ফ্যাদমকে তথ্য সরবরাহ করতে আপত্তি নেই ড. ফেরেলের। কিন্তু এখন তিনি বোট থেকে নেমে যেতে চাইছেন, বিস্ফোরণজনিত কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাবার আগেই।

শুধু যদি তাঁরা একটা বোট ভাড়া করতেন পারতেন। জেরি হ্যাসটন চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি, পুরানো ফেরিটা ছাড়া প্রয়োজনীয় আকৃতির একটা বোটও কোথাও পাওয়া যায়নি, সেটাকেও পানিতে নামাতে হলে পুরোদস্তুর ওভারহল করাতে হবে। মিডিয়াম সাইজ সরকারী বোট কয়েকটা আছে বটে, কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল ওগুলোর যে-

কোন একটা পেতে হলে আমলাতান্ত্রিক ঝামেলা পোহাবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে প্রথমে। বেশি নয়, তাতে সময় লাগবে দেড় মাস থেকে তিন মাস। প্রতিটি বোটই মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত ড. ফেরেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করে বসলেন ড. ফ্যাদমের প্রস্তাব।

জেরি হ্যাসটন বসে থাকেননি, আমেরিকা থেকে একটা বোট আনাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতটা পথ পাড়ি দিয়ে আসতে সময় লাগবে, তারপর আছে ক্লিয়ার‍্যান্স পাবার ব্যাপার, ইন্সপেকশন, শুল্ক নির্ধারণ ইত্যাদি আরও নানা ঝামেলা। অর্থাৎ স্কুইডটাকে ধরা তো দূরের কথা, ওটার জগতে অর্থাৎ পানিতে সওয়ার হবারই কোন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

কাজেই ড. ফ্যাদমের প্রস্তাবটা এক সময় লোভনীয় বলেই মনে হয়েছিল। এই লোকের সঙ্গে অভিযানে থাকলে ত্রিশ বছর ধরে যে প্রাণীটির ওপর গবেষণা করছেন সেটাকে চামড়ার চোখে একবার দেখার সুযোগ মিলতে পারে তাঁর। তিনি জানেন, এ-ধরনের সুযোগ বারবার আসে না। স্রোতের মধ্যে মৌসুমী পরিবর্তন আসছে, বদলে যাচ্ছে পানির তাপমাত্রা, কাজেই স্কুইডটা অন্য কোথাও চলেও যেতে পারে।

জেরি হ্যাসটনের সঙ্গে আলোচনা করে ড. ফেরেলও সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, ওদের একমাত্র আশা ন্যাট বেলের সী কুইন। কিন্তু বোটটা সে দেবে না, আরও কয়েকবার অনুরোধ করেও কোন ফল হয়নি। স্থানীয় কয়েকজন লোক পরামর্শ দেয়, বেলকে রাজি করাতে হলে ধরতে হবে মাসুদ রানাকে। কারণ, সী কুইন এখন রানার ভাড়া করা বোট। তাছাড়া, বেল শুধু রানার কথাই শুনবে। কিন্তু রানার সঙ্গে কথা বলার কোন ইচ্ছে ড. ফেরেলের ছিল না। তিনি জানেন, রানা জায়্যান্ট স্কুইডটাকে মেরে ফেলতে চাইবে, আর তিনি চাইছেন ওটাকে জ্যান্ত

ধরতে। কাজেই বেলকে রাজি করানোর জন্যে রানাকে ধরে কোন লাভ হবে না।

'সেট!' বো থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

হেলমসম্যানকে ড. ফ্যাদম জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা পজিশনে আছি তো?'

'ইয়েস, স্যার।'

'চার্জ থেকে কত দূরে আমরা?'

'প্রায় একশো গজ, স্যার।'

'আরও কাছাকাছি হও।'

'কিন্তু, স্যার...!'

'কাছাকাছি হও, ড্যাম ইট! চাও না ওটা কাজ করুক? নাকি...?'

'ইয়েস, স্যার!' বোট ছাড়ল হেলমসম্যান। যতটা সম্ভব পিছন দিকে সরে এলেন ড. ফেরেল। ফাইবারগ্লাসে টোকা দিলেন, ভাবলেন এটা ভাসিয়ে রাখার কোন উপাদান দিয়ে তৈরি কিনা।

ড. ফ্যাদম হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ফায়ার!' ফায়ারিং বক্সের সুইচ অন করল একজন ক্রু।

এক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না, নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল। তারপর ভোঁতা গুরুগুরু একটা আওয়াজ হলো, সেই সঙ্গে ধাক্কাটা অনুভব করল সবাই—মনে হলো অতিকায় একটা হাত বোটটাকে ধরে আকাশে তুলে দিতে চাইছে। পরমুহূর্তে ওদের চারদিকে বিস্ফোরিত হলো পানি।

এক সময় নিচে নামল বোট, শান্ত হলো পানি, বোটের পিছনে এসে কিনারা থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন ড. ফ্যাদম। ছোটছোট মাছগুলো পানির ওপর চিৎ হয়ে ভাসছে—লাল, ধূসর, সাদা, খয়েরি।

'ডীপার,' বললেন তিনি। 'জলদানব নিশ্চয়ই আরও অনেক গভীরে আছে। বিস্ফোরণ আরও নিচে ঘটাতে হবে।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে হেলমসম্যান বলল, 'স্যার, বেট বলছে বোটে একটা লিক দেখা দিয়েছে।'

'লিক? কোথায়?'

'গ্লাসে চিড় ধরেছে। নিচে, ভিউইং পোর্টে।'

'তুমি তাহলে বিস্ফোরণের এত কাছে থাকলে কেন?'

'কি? কিন্তু, স্যার, আপনিই তো বললেন যে...।'

'এই বোটের নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার ওপর। এত কাছে থাকা বিপজ্জনক বলে যদি মনে করে থাকো, আমার নির্দেশ অমান্য করা তোমার কর্তব্য ছিল!'

হেলমসম্যান হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শুধু।

'ইডিয়ট!' বললেন ড. ফ্যাদম, পা বাড়ালেন সামনের দিকে। 'কি রকম লিক? কতটা সিরিয়াস?'

'আমাদের বোধহয় ফিরে যাওয়া উচিত, সাবধানের মার নেই ভেবে।'

'ননসেন্স। এপোক্সি দিয়ে বন্ধ করে দাও,' বললেন ড. ফ্যাদম, তারপর কেবিনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ড. ফেরেল ভাবলেন, গ্রেট! ডুবে মরো এবার, সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হোক। ককপিটের চারদিকে চোখ বুলালেন, ভেসে থাকবে এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজছেন। কাঠের একটা হ্যাচ কাভার দেখতে পেয়ে হুক খুলে মুক্ত করলেন সেটা, বোটের পিছন দিকটা ডুবে গেলে স্বাধীনভাবে যাতে ভাসতে পারে পানিতে। তীরের দিকে তাকালেন একবার, কতটা দূরে আন্দাজ পাবার চেষ্টা করলেন। তিন মাইল, নাকি চার মাইল? বলা মুশকিল, মনে হচ্ছে অনেক দূর।

তারপর, ঘাড় ফেরাতে, কাছাকাছি দূরত্বে একটা বোট দেখতে পেলেন তিনি। কিছু করছে না বোটটা, এদিকে মুখ করে স্থির হয়ে

আছে। বেশ বড় একটা বোট।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও, ভাবলেন তিনি। বিপদের সময় কেউ অন্তত সাহায্য করতে আসবে।

এঞ্জিনের শব্দ পেলেন তিনি, পায়ের তলায় ডেক কেঁপে উঠল। ঘুরে যাচ্ছে তাঁদের বোট, ফিরে যাচ্ছে তীরের দিকে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ড. ফ্যাদম, ঘামছেন তিনি; মুখের রঙ হয়েছে টকটকে লাল—রাগে কিংবা ক্লান্তিতে।

'ওখানে একটা বোট রয়েছে,' ড. ফেরেল বললেন। 'ইচ্ছে করলে আমরা বোধহয়...।'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' ড. ফ্যাদম কেবিন বাল্কহেডের গায়ে ঘুসি মারলেন, তারপর হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ওহে!'

দরজা দিয়ে মাথা বের করল হেলমসম্যান। 'ইয়েস, স্যার?'

'ওদিকে ওই বোটটা দেখতে পাচ্ছ? রেডিওতে নির্দেশ দাও, বলো আমাদেরকে যেন অনুসরণ করে।'

'নির্দেশ দেব, ডক্টর?'

'হ্যাঁ,...নির্দেশ দাও। ওদের বলো, আমরা এখানে সরকারী লোক, আমাদের সঙ্গে একজন সরকারী কর্মকর্তা রয়েছেন। বলো, আমাদের পিছু নিতে হবে, কারণ হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দিলে সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। খুশি হয়ে তোমার নির্দেশ পালন করবে ওরা। খুশি হয়ে যদি নাও করে, অন্তত ভয়ে বাধ্য হবে।'

'ইয়েস, স্যার।' হেলমসম্যান দরজার ভেতর মাথা গলিয়ে নিল।

ড. ফ্যাদম জানতে চাইলেন, 'ওদেরকে তুমি চিনতে পারছ?'

'ইয়েস, স্যার।' আবার মাথা বের করল হেলমসম্যান।

'কারা বলো তো?'

'সী কুইন, স্যার—ন্যাট বেল। সঙ্গে সেই ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকও

রয়েছেন।'

'ও!' হঠাৎ যেন চুপসে গেলেন ড. ফ্যাদম। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, থাক। ভুলে যাও।'

'স্যার?'

'বললাম তো, ভুলে যাও। ওদেরকে ডাকার দরকার নেই। আমাদের শুধু তীরে পৌঁছে দাও।'

ভুরু কুঁচকে কাঁধ ঝাঁকাল হেলমসম্যান, তারপর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'লক্ষ করছ, কি রকম ডেবে রয়েছে বোটটা?' জিজ্ঞেস করল বেল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কোথাও ফুটো দেখা দিয়েছে।'

'তুমি চাও আমরা ওটার পিছু নেই?'

'সাহায্য দরকার হলে ডাকবে ওরা,' বলল রানা। 'ডাকলে খুশি হই, যদিও ড. ফ্যাদম ডাকবেন বলে মনে হয় না।' হুইলটা সবেগে ঘোরাল ও, সামনে ঠেলে দিল থ্রটল, এগোল মার্কার-এর দিকে। ওয়েস্টার্ন ব্লু কাট চিহ্নিত করছে ওটা।

গভীর পানিতেই থাকছে রানা, কয়েক মিনিট ধরে বোটের বো ঝাঁক ঝাঁক মরা মাছের ওপর দিয়ে এগোল।

'মাছ আর পাওয়াই যাবে না,' বলল বেল। 'ধেড়ে বদমাশটা সব মেরে ফেলেছে।'

'নির্বুদ্ধিতা দণ্ডনীয় অপরাধ নয়, এটা বড়ই দুঃখের বিষয়,' বলল রানা। 'যাবজ্জীবন দিয়ে জেলখানায় ভরে রাখা উচিত ভদ্রলোককে।'

'কি ব্যবহার করছে, জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি শিওর, উনি জানেন না। ফাটলেই হলো, আর কিছু জানার দরকার নেই তাঁর। ওয়াটার জেল...সি-ফোর...কিংবা

হয়তো সাদামাঠা ডিনামাইট।'

'বারমুডায় এ-সব কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না,' বলল বেল।

'সরকারী দোকান থেকে সহজেই কেনা যায়। পারমিট? কর্মচারীকে ঘুষ দিলেই হবে। বলতে হবে পুরানো ডক বা বাড়ি ভাঙতে চাও। ড. ফ্যাদমকে এত সব ঝামেলা পোহাতে হবে না, চাইলেই পাবেন।'

'ওটা কি...?' উত্তর দিকে তাকিয়ে ছিল বেল, হাত লম্বা করে কি যেন দেখাল রানাকে।

এক জোড়া ঢেউয়ের মাঝখানে চকচকে কি যেন ভাসছে।

হুইল ঘোরাল রানা, পোর্ট কোয়ার্টারে ঢেউ এসে লাগায় কাত হয়ে পড়ল বোট।

ভাসমান জিনিসটার কাছাকাছি বোট এনে রানা বলল, 'ধ্যেত, আবার সেই জিনিস...অন্তত তাই মনে হচ্ছে।'

স্বচ্ছ মোম-এর মত জিনিসটা, চকচকে, ছয় থেকে আট ফুট লম্বা, দুই থেকে তিন ফুট চওড়া, ঢেউ খেলানো আকৃতি, মাঝখানে একটা গর্ত আছে।

বোট থামিয়ে ফ্লাইং ব্রিজের রেইলিং থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে হোয়েল স্পিউ...তুমি জানো, তিমির মাথায় পাওয়া যায়। আমাদের ভাষায় বলে অম্বর, এক ধরনের সুগন্ধী। কিন্তু স্পার্ম হোয়েলই তো নেই আর এদিকে...।'

মাথা ন্যাড়ল বেল। 'জিনিসটা যথেষ্ট গাঢ় নয়, রানা। তাছাড়া, গন্ধ কোথায়?'

'তা ঠিক...তাহলে কোন মাছের ডিম হতে পারে। কিন্তু কোন্ মাছের ডিম, আমাকে জিজ্ঞেস করো না।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল, 'খানিকটা নিয়ে গিয়ে ড. ফেরেলকে দেখানো উচিত, উনি হয়তো বলতে পারবেন জিনিসটা কি।'

'খানিকটা তাহলে তুলব বলছ?'

'তোল।'

মই বেয়ে নেমে এল বেল, লম্বা হাতলঅলা ডিপ নেট নিয়ে বোটের পিছন দিকে পৌঁছুল। এখানে বোট কিছুটা নিচু হয়ে আছে, পানির নাগাল পাওয়া সহজ।

ছোট একটা বৃত্ত রচনা করে বোট ঘোরাল রানা, জেলির তালটা যাতে বোটের পাশ ঘেঁষে ভেসে যায়।

বোটের বাইরে ঝুঁকে নেট দিয়ে ছুঁলো বেল, টুকরো টুকরো হয়ে গেল জেলি। 'কি করে তুলব, এ তো ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

'নেটে একটুও আটকায়নি?'

'দাঁড়াও, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি।'

বোট পিছিয়ে আনল রানা, নেটের হাতল ধরে সামনের দিকে আরও একটু ঝুঁকল বেল।

পানি স্পর্শ করা মাত্র কি যেন একটা আঁকড়ে ধরল নেটটাকে, টান দিল। বেলের হাঁটুর নিচের হাড় নিচু বুলওয়ার্ক-এ বাড়ি খেলো। বোটের বাইরে অতিরিক্ত ঝুঁকে ছিল, ফলে খসে পড়ার অবস্থা হলো ওর।

'রানা!' চিৎকার করল সে, মুক্ত হাতটা দিয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

'নেট ছেড়ে দাও!' পাল্টা চিৎকার করল রানা, কিন্তু ছাড়ল না বেল। তার হাত যেন ওটার সঙ্গে ঝালাই করা, হাতলটা শক্ত করে ধরে থাকল সে। বোট থেকে খসে পড়ল শরীরটা, একটা ডিগবাজি খেয়ে সরাসরি পানিতে। এতক্ষণে নেটের হাতলটা ছাড়ল।

ফ্লাইং ব্রিজের পিছন দিকে ছুটল রানা, মই বেয়ে প্রায় হড়কে নেমে এল নিচে, ছুটল স্টার্নের দিকে। বোট ইতিমধ্যে স্থির হয়ে গেছে, কাজেই প্রপেলারটা বেলের জন্যে কোন বিপদ হয়ে দেখা দেবে না।

তবে রানার উদ্বেগ, ভয় পেয়ে না পানি গিলতে শুরু করে বেল। তাহলে ডুবে মরবে।

আতঙ্ক কাকে বলে বুঝতে পারছে বেল। তার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল, ভুলে গেল কিভাবে সাঁতার কাটতে হয়। দুর্বোধ্য চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, পানিতে এলোপাথাড়ি বাড়ি মারছে হাত দিয়ে, ওখানে যেন হিংস্র কোন প্রাণী লুকিয়ে আছে। বোটের পিছন থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে সে।

খপ করে একটা রশি তুলল রানা, চিৎকার করে ডাকল, 'বেল!'

কিন্তু বেল ওর ডাক শুনতে পেল না, এখনও আগের মত শুধু হাত ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে।

আলগা রশি কুণ্ডলী পাকাল রানা, একটা প্রান্ত বাগিয়ে ধরে লক্ষ্যস্থির করল বেলের মাথায়, তারপর ছুঁড়ল। সরাসরি তার মুখে গিয়ে লাগল রশিটা, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই বেলের। তবে হাতে রশির স্পর্শ পেতে ধরে ফেলল খপ্ করে। রশি টেনে তাকে ডাইভ স্টেপে তুলে আনল রানা, ঝুঁকল, আঁকড়ে ধরল শার্টের কলার।

ডেকে উঠে শুয়ে পড়ল বেল, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, হড়হড় করে পানি বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। খানিক পর কাশতে কাশতে বসল সে, বলল, 'আমার কি হয়েছে বলো তো!'

'নেটটা কে টানছিল, জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাসছে। 'বড় একটা কচ্ছপ, বুঝলে। দেখেছি আমি…চায়নি মাছের ডিমে তুমিও ভাগ বসাও।'

'মরুক শালা!' গাল দিল বেল।

হেসে উঠল রানা। 'এখন তুমি স্বাভাবিক তো?'

'বোট বেচে দিয়ে ট্যাক্সি কিনব… ।'

কাপড় নিঙড়ে গায়ে একটা তোয়ালে জড়াল সে। ইতিমধ্যে হুইলে

চলে এসেছে রানা, বোট নিয়ে ফিরে এসেছে যেখানটায় পানির ওপর ভাসছে নেট। এঞ্জিন বন্ধ করল ও, মন্থর গতিতে নেটের দিকে ভেসে যাচ্ছে ওরা। বোট হুক দিয়ে আটকে ওটাকে ডেকে তুলে আনল রানা।

জালের গায়ে একটা ফুটো করেছে কাছিম। জেলি খুব সামান্যই আটকেছে। আঠাল পদার্থ, বিন্দু বিন্দু লেগে আছে জালের সঙ্গে। আঙুলে একটু নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা। নিরেট পদার্থ বলতে কিছুই নেই, নেট থেকে অনেক কষ্টে তোলা হয়তো যায়, তবে পরিমাণে এত সামান্য যে বোতলে ভরা যাবে না। কাজেই জেলিটুকু পানিতে ধুয়ে ফেলল ও, নেটটা ফেলে রাখল ডেকে, উঠে এল ফ্লাইং ব্রিজে।

কয়েক মিনিট পর বাঁক ঘুরে ওয়েস্টার্ন ব্লু কাট-এর মুখে পড়ল বোট, দু'কাপ চা নিয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে এল বেল। 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না, রানা,' বলল সে, একটা কাপ ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

'বোট থেকে পানিতে পড়লে সবারই খুব খারাপ লাগে।'

'না, সে-কথা বলছি না। গোটা পরিস্থিতির কথা বলছি। এর আগেও তো বোট থেকে পানিতে পড়েছি আমি, কিন্তু এরকম আতঙ্কিত হইনি। আমি যে এত ভয় পেতে পারি, ধারণা ছিল না। কারণটা কি বুঝতে পারছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ফ্যাতরা ব্যাটা লোক যতই খারাপ হোক, বোমা মেরে ওটাকে যদি খতম করতে পারে, আমার চেয়ে খুশি কেউ হবে না!'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ধমক দিল রানা।

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বেল। 'তারমানে তুমি বলতে চাও, জলদানবকে বোমা মেরে খতম করা যাবে না?'

'অসম্ভব।'

'কেন?'

'কারণ গভীর পানিতে বাস করে ওটা, মারতে হলে প্রথমে ওটাকে ওপরে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি নিজেই ভেবে দেখো না, সাগর কি একটা বালতি নাকি যে ভেতরে একটা বোমা ফাটালে ব্যথা পাবে ওটা? বিশাল আটলান্টিকের কোথায় ওটা আছে কে জানে! বোমা ফাটালেই হলো!'

'তাহলে উপায়?'

এক মুহূর্ত পর জবাব দিল রানা, 'তুমি তো আর ওটাকে মারতে যাচ্ছ না, কাজেই এ-সব প্রশ্ন না তুললেও পারো। যাদের কাজ তারা করুক। আমরা সাহায্য করতে চাইলে কি হবে, কেউ আমাদের কথা শুনলে তো।'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়েও দিল না বেল। 'যাদের কাজ তারাও তো, তোমার ভাষায়, বোকামি করছে। তাহলে ওটা মরবে কিভাবে?'

'কিভাবে মরবে তা আমি জানি না, তবে কিভাবে মরবে না তা বুঝতে পারি,' বলল রানা। 'অবশ্যই ওঁরা বোকামি করছেন, আর সেজন্যে ওঁদেরকে মূল্যও দিতে হবে।'

'ড. ফেরেল আর মি. হ্যাসটনের প্রস্তাবটা তাহলে...।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা স্কুইডটাকে ধরতে চান। কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

'দেখা যাচ্ছে কারও ওপরই তোমার ভরসা নেই,' বলল বেল। 'তাহলে তুমি নিজে কেন ওটাকে মারার কথা ভাবছ না?'

'ভাবছি না কে বলল?' তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ভাবছি, আমার একটা প্ল্যানও আছে, কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্য করছে না।'

'কি সাহায্য চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল বেল।

'তোমার কাছ থেকে একটা সাহায্যই চাওয়ার আছে,' বলল রানা। 'বোটটা।'

চেহারা কালো হয়ে গেল বেলের। কয়েক সেকেণ্ড পর কিছু বলার চেষ্টা করল সে, বাধা দিল রানা।

'থাক, বেল। আমি বুঝি। সী কুইন তোমার একমাত্র সম্পদ। তাছাড়া, তোমার বউও চায় না যে…।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বেল বলল, 'হ্যাঁ…।'

অগভীর পানির ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে ওরা। বাঁ দিকে দুর্গের মত ঝুলে রয়েছে ডকইয়ার্ড, আর ডান দিকে দেখা যাচ্ছে ক্যামব্রিজ বীচ, এই সময় বোটের পিছন থেকে বেল বলল, 'আগে তো ওটাকে কখনও দেখিনি, রানা!'

পিছন দিকে তাকাল রানা। উত্তরে, অন্তত তিন মাইল দূরে, ডীপ নর্থ চ্যানেলে ঢুকতে যাচ্ছে ছোট একটা জাহাজ। লম্বায় একশো বিশ থেকে একশো পঞ্চাশ ফুট হবে, তার বেশি না। খোলটা সাদা, একটা মাত্র কালো চিমনি।

'স্থানীয় নয়,' আবার বলল বেল।

'না।'

'নেভীর জাহাজও নয়। দেখে মনে হচ্ছে প্রাইভেট রিসার্চ ভেসেল।'

চোখে বিনকিউলার তুলল রানা, রেইলিঙে হাঁটু বাধিয়ে স্থির করল নিজেকে। জাহাজটার দিকে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল ও। ডেভিটস থেকে একটা লাইফবোট ঝুলছে, স্টারবোর্ড সাইডে। আর, কেবিনের পিছনে, মাথা উঁচু করে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা ইস্পাতের ক্রেন। ক্রেনের নিচে, ক্রেডলে, গোল কি যেন একটা রয়েছে। জিনিসটা যা-ই হোক, গায়ে পোর্টহোল আছে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর রানা বলল, 'আরও একদল বুদ্ধু, বেল। ওদের সঙ্গে ছোট একটা সাবমারসিবল রয়েছে। কিন্তু ওরা যদি ভেবে থাকে…।'

তিন

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন ক্যাপটেন স্টিফেন হান্টার, সই করছেন একটা ফর্মে, এই সময় উদয় হলো ওয়াটারম্যান। দরজায় দু'বার টোকা দিয়ে বলল, 'ক্যাপটেন?'

'টেডি। কি ব্যাপার?' মুখ না তুলেই কথা বলছেন ক্যাপটেন হান্টার। 'না, থামো, কিছু বলো না। কেন এসেছ, আমিই বরং আন্দাজ করি। তুমি শুনেছ বারমুডায় একটা রিসার্চ ভেসেল এসেছে, অত্যাধুনিক সার্চ গিয়ারে ঠাসা, সঙ্গে দুই মিলিয়ন ডলারের একটা সাবমারসিবল। অতিকায় জলদানব বা স্কুইডটাকে দেখতে এসেছে ওরা। আরও শুনেছ, জাহাজ ও সাবমারসিবলে নেভির তরফ থেকে একজন লোককে রাখব আমরা। তুমি এসেছ স্বেচ্ছাসেবক হবার আবেদন নিয়ে। তোমার ধারণা, এই কাজের জন্যে তুমিই সবচেয়ে উপযুক্ত।' মুখ তুললেন তিনি। 'কি?'

'আমি...ইয়েস, স্যার,' অফিসে ঢুকে ক্যাপটেনের ডেস্কের সামনে দাঁড়াল ওয়াটারম্যান।

'তুমি কেন, টেডি? তুমি তো সাবমেরিনার নও। তাছাড়া, কোন সীম্যানকে না পাঠিয়ে একজন অফিসারকে আমি পাঠাব কেন? ওখানে একজোড়া চোখ থাকলেই চলে আমার, দেখতে হবে চিড়িয়াগুলো যাতে যেখানে-সেখানে নাক গলাতে না পারে কিংবা নেভির কোন আণ্ডারওয়াটার কেবল দুর্ঘটনাবশত ছিঁড়ে না ফেলে।'

'আমি একজন ডাইভার, স্যার,' ওয়াটারম্যান বলল। 'পানির নিচে আমাদের ইকুইপমেন্ট কি রকম দেখতে, আমি জানি। অন্য লোক যা দেখতে পাবে না, আমি হয়তো তা দেখতে পাব।' এক মুহূর্ত বিরতি নিল সে। 'আমার ইউডিটি ট্রেনিং নেয়া আছে, স্যার।'

'ইউডিটি ট্রেনিং?' বললেন ক্যাপটেন। 'গড, টেডি, লোকগুলো এখানে কিছু উড়িয়ে দিতে আসেনি। ম্যাগাজিনের লোক ওরা, সবার আগে প্রথম জায়্যান্ট স্কুইডের ছবি তুলতে চায়। যে স্কুইড, আমার ধারণা, এখান থেকে ইতিমধ্যেই হাজার মাইল দূরে সরে গেছে।'

'বারমুডা সরকারের সঙ্গে তাহলে ওদের চুক্তিটা কি, স্যার? আমি তো ভেবেছিলাম এ-ব্যাপারে কোন রকম প্রচারণা বারমুডা একেবারেই চাইছে না।'

'তুমি ভুল ভেবেছ। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার জড়িত। বারমুডা পথে বসে যাচ্ছে, টেডি। ট্যুরিজম প্রায় শেষ। হোটেলগুলো খালি হয়ে যাচ্ছে, রেস্তোরাঁয় খদ্দের নেই, স্পোর্ট ফিশিং বন্ধ, ডাইভিং বিজনেসও অচল হয়ে পড়েছে। এক্সপ্লোরার ফাউণ্ডেশন যখন বলল...।'

'এক্সপ্লোরার, স্যার?'

'ও, কিছুই তাহলে জানো না। তবে শোনো...।' শুরু করলেন ক্যাপটেন হান্টার।

এক্সপ্লোরার নতুন একটা ম্যাগাজিন, মালিক বল-বেয়ারিং বিজনেসে আছেন, মাঠে নেমেছেন এক টন টাকা নিয়ে। পত্রিকার লোকজন তাদের আনকোরা নতুন সাবমারসিবল নিয়ে কেইম্যান আইল্যাণ্ডে ছিল, ছবি তুলছিল গভীর পানির অদ্ভুত সব জিনিসের, এই সময় শুনতে পেল বারমুডায় অতিকায় একটা স্কুইড দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনা দেখতে পায় তারা, স্কুইডটার ছবি ছাপতে পারলে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির সম পর্যায়ে উঠে আসতে পারে পত্রিকাটা। ন্যাশনাল

জিয়োগ্রাফির কোন সাবমারসিবল নেই। কারুরই নেই, অন্তত কোন আমেরিকানের নেই, একমাত্র নেভি বাদে। বারমুডা সরকার চিন্তা করল, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। পত্রিকার লোকগুলোকে আসতে দেয়াই উচিত। ওরা যদি স্কুইডটাকে দেখতে পায়, তাহলে হয়তো সেটাকে মারারও একটা ব্যবস্থা করতে চাইবে বা পারবে। আর যদি দেখতে না পায়, প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে স্কুইড চলে গেছে, বারমুডা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ক্যাপটেন হান্টার থামতে ওয়াটারম্যান বলল, 'ইউএস নেভির ভূমিকাটা তাহলে কি, স্যার? আমরা কিভাবে নাক গলাতে পারি? বলতে চাইছি, এটা তো বারমুডার পানি।'

'আমাদের ভূমিকা? টেডি, কাম অন। বারমুডার পানি বলে কিছু নেই। আইনের বিচারে এটা ন্যাটোর পানি। তবে, আসল কথা, লোকগুলো আমেরিকান।'

আমেরিকানদের বারমুডা সরকার কেন খাতির করতে বাধ্য, ক্যাপটেন হান্টার তা ব্যাখ্যা করলেন না। দরকারও ছিল না, টেডি ব্যাপারটা বোঝে। বলা হয় বটে যে সোনার ট্র্যাকারগুলো স্থাপন করেছে বারমুডা সরকার, কিন্তু তা সত্যি নয়। আমেরিকার টাকায়, আমেরিকান বিজ্ঞানীরা কাজটা করে দিয়ে গেছে, ফলে রাশিয়ার সাবমেরিনগুলোর গতিবিধির ওপর নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে। শুধু এই একটা ব্যাপারে নয়, আরও অনেক ব্যাপারে আমেরিকার কাছে বাঁধা পড়ে আছে বারমুডা। তাই পেন্টাগন যখন চুক্তিটার কথা শুনল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন হান্টারকে নির্দেশ দিল, জাহাজ ও সাবমারসিবলে অবশ্যই ইউএস নেভির একজন লোক থাকতে হবে। ইউএস নেভির ডীপ ওয়াটার অ্যাসেট অন্য কোন লোক দেখে ফেলবে, হোক তারা আমেরিকান, অথচ তাদের সঙ্গে ইউএস নেভির পাহারা থাকবে না, এ স্রেফ হতে পারে না।

চেয়ারে হেলান দিলেন ক্যাপটেন হান্টার। 'পরিস্থিতিটা বুঝতেই পারছ,' বললেন তিনি। 'এখন তোমার প্রসঙ্গ। কেন তুমি সাবমারসিবলে থাকতে চাইছ? উদ্দেশ্যটা কি বন্ধু ন্যাট বেলকে সাহায্য করা? তার জন্যে শিপরেক খুঁজে বের করা?'

'না, স্যার।' তাড়াতাড়ি বলল ওয়াটারম্যান, বিব্রত বোধ করছে। রীফের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় শিপরেক খোঁজে সে, এ-খবরও যে ক্যাপটেন রাখেন, তার ধারণা ছিল না। কিভাবে তিনি জানতে পেরেছেন, অনুমান করা সহজ। হেলিকপ্টারে কখনই একা থাকে না সে, আর নেভি বেস ছোট্ট একটা জায়গা, পরচর্চা করার প্রচুর সময় পায় সবাই। 'পাঁচশো বা হাজার ফুট নিচে শিপরেক দেখতে পেলেই বা কি, তা উদ্ধার করার কোন উপায় নেই।'

'তাহলে কি?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন। 'কি কারণে সমুদ্রের আধ মাইল নিচে নামতে চাইছ তুমি? এমন সব লোকের সঙ্গে, যাদের তুমি চেনো না। সাবমারসিবল কি জিনিস, জানো? ছোট একটা ইস্পাতের কফিন। তাছাড়া, ওরা এমন একটা জিনিস খুঁজতে যাচ্ছে যেটা হয়তো আশপাশে কোথাও নেই। আর যদি থাকে, তুমি ওটার হাতে মারাও যেতে পারো। তাহলে?' নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন নিউইয়র্ক থেকে আজ তাঁকে ফোন করেছিলেন, তাঁর নির্দেশে মাসুদ রানা নামে এক ট্যুরিস্ট ভদ্রলোককে সাক্ষাৎ দান করতে হয়েছে তাঁর। সেই ভদ্রলোককেও এই যুক্তিটা দেখিয়েছেন তিনি, স্কুইডটা সম্ভবত বারমুডা ছেড়ে চলে গেছে। যুক্তিটা ভদ্রলোক মানেননি, বরং আবেদন জানিয়েছেন নেভি যাতে সাবটাকে পানিতে নামতে না দেয়, নামলে নাকি বিপদ হতে পারে। নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন ক্যাপটেন।

'আমি যেতে চাইছি, কারণ...,' ইতস্তত করছে ওয়াটারম্যান, জানে

তার যুক্তি বেশিরভাগ মানুষেরই মেনে নিতে কষ্ট হবে। '...কারণ, এ এমন একটা কাজ যা আগে কখনও করিনি আমি। একটা সাবমারসিবলে চড়ে নিচে নামতে কেমন লাগে আমি জানতে চাই।'

'তুমি তো আগে কখনও চাঁদেও যাওনি। কেউ বললে তুমি তার সঙ্গে যাবে ওখানে?'

'ইয়েস, স্যার। অবশ্যই যাব আমি।'

'গড অলমাইটি, টেডি,' বললেন ক্যাপটেন হান্টার, মাথা নাড়ছেন। 'ঠিক আছে, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হলো। চারটের সময় ডকইয়ার্ডে হাজির থেকো। আজ রাতেই গভীর সাগরে চলে যাবে ওরা, সাব নিয়ে ডুব দেবে কাল।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল ওয়াটারম্যান। 'ব্যাপারটা কতটুকু অফিশিয়াল, স্যার? আমাকে কি ইউনিফর্ম পরতে হবে?'

'না। তবে সোয়েটার আর গরম মোজা সঙ্গে নিয়ো। শুনেছি তিন হাজার ফুট অন্ধকার পানির নিচে নাকি ঠাণ্ডা খুব বেশি।'

'ইয়েস, স্যার।' স্যালুট করে ঘুরল ওয়াটারম্যান।

'টেডি।' দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সে, দাঁড় করালেন ক্যাপটেন হান্টার।

'স্যার?'

'আমি নিজেই তোমাকে পাঠাতাম, তুমি স্বেচ্ছাসেবক হতে না চাইলেও।' নিঃশব্দে হাসলেন ক্যাপটেন। 'আমি শুধু তোমার যুক্তিটা শুনতে চেয়েছিলাম।'

কোয়ার্টারে ফিরে একটা ওভারনাইট ব্যাগ গুছিয়ে নিল ওয়াটারম্যান, টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে ভেতরে ভরল একটা ওয়াকম্যান, কয়েকটা টেপ আর একটা বই। শাওয়ার সেরে জিনস আর ডেনিম শার্ট পরতে

তিনটে বেজে গেল। ডকইয়ার্ডটা বারমুডার আরেক প্রান্তে, মোটরবাইকে এক ঘণ্টার পথ, কাজেই তাড়াতাড়ি কামরা থেকে বেরিয়ে এল সে। তারপর মনে পড়ে গেল, বেল আর তার ট্যুরিস্ট বন্ধুর সঙ্গে কাল ডাইভিং-এ যাবার কথা হয়ে আছে তার। কামরায় ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলল সে।

ফোন ধরল এনা, বেলের স্ত্রী। ওয়াটারম্যান মেসেজ দেয়ার আগেই সে বলল, বেল বোটে আছে, এখুনি তাকে ডেকে দিচ্ছে। অপেক্ষা করার সময় ওয়াটারম্যান ভাবল, ওদেরকে তার বলা উচিত কিনা কোথায় যাচ্ছে সে। নেভি গোপনীয়তা রক্ষাটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, তার ধারণা এই অভিযানটাও ক্লাসিফায়েড। তারপর ভাবল, একটা ম্যাগাজিন স্কুইডের ছবি তুলবে, এর মধ্যে গোপনীয়তার কি আছে? নেভি তো মেসের জন্যে কেনা আলু-পিঁয়াজকেও ক্লাসিফায়েড মনে করে। ধুত্তোর, সিক্রেসির নিকুচি করি। ইতিমধ্যে সম্ভবত দ্বীপের কারও জানতে বাকি নেই, সাবমারসিবল নিয়ে কেন এসেছে জাহাজটা।

'ফোন করেছ ভালই হয়েছে, টেডি,' অপরপ্রান্তের রিসিভারে বলল বেল। 'আমিই তোমাকে ফোন করতাম। শোনো, কাল আমরা ডাইভিং-এ যেতে পারছি না, দুঃখিত।'

'ও,' মনে মনে খুশি হলো ওয়াটারম্যান। 'কেন?'

'সে অনেক কথা, দেখা হলে বলব। আমরা একটা ম্যাগাজিনের হয়ে কিছু কাজ করে দিচ্ছি।'

স্বভাবতই কৌতূহল হলো ওয়াটারম্যানের। 'মানে? কোন ম্যাগাজিনের কি কাজ?'

'তাহলে শোনো...' শুরু করল বেল।

সাবমারসিবল নিয়ে যে জাহাজটা বারমুডায় এসেছে সেটার নাম ফিলিপ এক্সপ্লোরার। নামটা দেখেই রানার সন্দেহ হয়, বল-বেয়ারিং

বিজনেসের রাজা বলে খ্যাত ফিলিপ মরগানের নয় তো ওটা? ডকইয়ার্ডে গিয়ে ক্রুদের সঙ্গে কথা বলে ও, জানতে পারে ওর ধারণাই ঠিক। ফিলিপ মরগান ওর ঠিক বন্ধু নয়, তবে দু'জনের পরিচয় অনেক দিনের। বিসিআই এজেন্ট বা রানা এজেন্সির কর্ণধার হিসেবে নয়, ফিলিপ মরগান ওকে ভিনসেন্ট গগলের বন্ধু হিসেবে চেনে। গগল পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় বলেছিল, 'আমার বন্ধু, জাহাজ ব্যবসায়ী।' কথাটা যে মিথ্যে তা নয়, একটা শিপিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছে রানা। গত পাঁচ-সাত বছরে পাঁচ-সাতবার ফিলিপ মরগানের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর, পরস্পরকে ওরা পছন্দ করে।

পরিচয় জানার পর জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে রানা। জায়ান্ট স্কুইড সম্পর্কে তাঁকে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে ও, তারপর পরামর্শ দেয়, এত ছোট একটা সাবমারসিবল নিয়ে ওটাকে মারতে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু ক্যাপটেন, ক্রুরাও, ওর কথা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। রানা ওর ভয়ের কারণটাও ব্যাখ্যা করে শোনায়। সাবমারসিবলটা স্কুইডের তুলনায় একটা ঠুনকো খেলনা, যে-কোন বিপদ ঘটতে পারে। তাতেও কোন লাভ হয়নি। অগত্যা বাধ্য হয়ে নিউ ইয়র্কে টেলিফোন করে ও, সরাসরি ফিলিপ মরগানের সঙ্গে কথা বলে।

রানার কথা মন দিয়েই শোনেন ফিলিপ মরগান। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী, রানার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেননি তিনি, ওর বক্তব্য মেনে নিয়েই পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'আপনি আমার শুভানুধ্যায়ী, সাবধান করে দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি সহ সমস্ত পত্রিকায় খবর পৌঁছে গেছে যে আমরা স্কুইডটার ছবি তোলার জন্যে সাবমারসিবল পাঠিয়েছি। এখন যদি পিছিয়ে আসি, আমাদের পত্রিকা

এক্সপ্লোরার একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই, এখন এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে।'

রানা জানতে চায়, 'কি সেটা?'

ফিলিপ মরগান জবাব দেন, 'আপনি বারমুডায় আছেন, এটা আমার সৌভাগ্য। বিপদ যখন সত্যি ঘটতে যাচ্ছে, আপনার সাহায্য আমাকে পেতেই হবে। সাবমারসিবলের কাজ সাবমারসিবল করুক, আপনি আমার জাহাজে পায়ের ধুলো দেন, মনিটরে লক্ষ করুন সাবমারসিবল সত্যি কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে কিনা। ক্যাপটেনকে আমি বলে দিচ্ছি, আপনার নির্দেশ মেনে চলবেন তিনি। মি. রানা, প্লীজ, আপনি কিন্তু এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না…।'

রানা দেখল, ফিলিপ মরগান কৌশলে ওকেও তাঁর অভিযানে জড়াতে চেষ্টা করছেন, পরিকল্পনাটা বাদ দেয়ার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই। প্রস্তাবটা গ্রহণ কোন করার ইচ্ছে ওর ছিল না, রাজি হলো শুধু সাবমারসিবলের ক্রুদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। ওরা যে মারাত্মক বিপদে পড়তে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, অথচ নিষেধ করলেও মানবে না, কাজেই দেখা যাক ওদের সঙ্গে থেকে বিপদটাকে এড়ানো যায় কিনা। রাজি হলো ঠিকই, তবে ফিলিপ মরগানের প্রস্তাবে কিছু সংশোধনী আনল। ঠিক হলো, এসকর্ট হিসেবে ন্যাট বেলের সঙ্গে একটা চুক্তি হবে মরগান এক্সপ্লোরারের। যা-কিছু করবে রানা, সবই বেলের বন্ধু হিসেবে। যেহেতু চুক্তি, কাজেই টাকা পয়সার প্রসঙ্গ উঠল। ফিলিপ মরগান ক্যাপটেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানলেন, আসলেও তাদের একজন এসকর্ট লাগবে। ঠিক হলো, দৈনিক এক হাজার ডলার করে পাবে বেল। রানার কাজ ও পদটা অবৈতনিক।

সব শুনে আকাশ থেকে পড়ল ওয়াটারম্যান। 'তারমানে তোমরা যাচ্ছ? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম…।'

'স্কুইডটাকে কোথায় খুঁজতে হবে ওরা তা জানে না। জানে না ড্রপ-অফ কোথায়, কিংবা বটম শেল্ফ কোথায় শেষ হয়েছে, অথবা গভীর পানি কোথায় শুরু হয়েছে। ওদের সঙ্গে একটা ফ্যাদোমিটার আছে, আছে সাইড-স্ক্যান সোনার, সময় নিয়ে চেষ্টা করলে এ-সব নিজেরাই জেনে নিতে পারে। কিন্তু ওই বোট চালাতে দৈনিক নিশ্চয়ই দশ হাজার ডলার খরচ হয়, কাজেই আমাকে শর্টকাট হিসেবে ভাড়া করেছে ওরা।'

'আর তুমিও রাজি হয়েছ? কিন্তু…।'

'টেডি, একদিনে এক হাজার ডলার। তাছাড়া, আমার জন্যেই কৌশলে কাজটা আদায় করেছে রানা। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে তো কিছুই করতে হবে না। ওদের জাহাজে থাকবে রানা, দেখিয়ে দেবে কোনদিকে যেতে হবে, কোথায় তাক করতে হবে ক্যামেরা। আমি শুধু জাহাজ থেকে দূরে পানির ওপর সাবমারসিবল মাথাচাড়া দিলে অনুসরণ করব সেটাকে।' হেসে উঠল বেল। 'রানা আমাকে চুপিচুপি বলেছে, সাবে কোনমতেই থাকবে না ও। আর আমি তো ওদের জাহাজেও থাকছি না। থাকছি সী কুইনে। কাজেই ভয় পাবার কোন কারণ নেই।'

'বেল,' বলল ওয়াটারম্যান, অনুভব করল তার উৎসাহ কর্পূর হয়ে উবে যাচ্ছে, 'আমাকে সাবমারসিবলে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'তোমাকে…হোয়াট!' আঁতকে উঠল বেল। 'কি বলছ!'

কেন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ব্যাখ্যা করল ওয়াটারম্যান।

এক পর্যায়ে বেল জানতে চাইল, 'ক্যাপটেন হান্টারের কেন মনে হয়েছে ওরা স্কুইডটাকে খুঁজে পাবে না?'

'নেভির ধারণা ওটা চলে গেছে,' বলল ওয়াটারম্যান। 'শুধু নেভি নয়, ওশেনোগ্রাফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও তাই বলছে।'

বেল বলল, 'কিন্তু রানার ধারণা উল্টোটা। ওর সঙ্গে আমার কথা

হয়েছে। ড. ফেরেলও মনে করেন যে স্কুইডটা এখনও আছে এদিকে, তা না হলে কানাডায় ফিরে যেতেন তিনি।'

'আর তুমি? তুমি কি মনে করো?'

'আমিও মনে করি…টেডি, আমার কথা শোনো।'

'কি?'

'যেয়ো না।'

'আমাকে যেতেই হবে, বেল। উপায় নেই,' মন খারাপ করে বলল ওয়াটারম্যান। এখন সত্যি তার ভয়ই করছে।

'উপায় না থাকলে মরো!' রেগে গেল বেল। 'ঠিক আছে, জানিয়ে ভালই করেছ। রানাকে আমি এখুনি সব বলছি। তোমার ওপর নজর রাখবে ও।'

'ঠিক আছে,' মিনমিন করে বলল ওয়াটারম্যান।

বাটিক শপ, কাফে, স্যুভেনির শপ, তারপর একটা মিউজিয়ামকে পাশ কাটিয়ে ডকইয়ার্ডে ঢুকল ওয়াটারম্যান। নাম দেখে চিনতে পারল জাহাজটা—মরগান এক্সপ্লোরার। জাহাজটাকে পাশে রেখে হাঁটার সময় পদক্ষেপগুলো গুণল সে। কমবেশি দেড়শো ফুট হবে। জাহাজের বেশির ভাগটাই খোলা, চিমনি আর কেবিনের মাঝখানে ক্রেডলে তোলা রয়েছে সাবমারসিবল, তারপুলিন দিয়ে ঢাকা। একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায়, নতুন তৈরি করা হয়েছে জাহাজটা, হয় হল্যাণ্ড নয়তো জার্মানীতে। কেনার পর অত্যন্ত যত্ন করা হচ্ছে, খোলে একবিন্দু মরচের দাগ পড়েনি, আঁচড় লাগেনি রঙে। ডেকের রশিগুলো নিখুঁতভাবে কুণ্ডলী পাকানো, বিকেলের রোদে ইস্পাত আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি সুপারস্ট্রাকচার চকচক করছে। যে-ই মালিক হোক জাহাজটার, ভাবল সে, টাকার ব্যাপারে তার কোন উদ্বেগ নেই।

বোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মেয়ে, রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছে এক ঝাঁক ছোট মাছকে।

'হ্যালো,' বলল ওয়াটারম্যান।

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটা বলল, 'হাই।' সাতাশ-আটাশ বছর বয়েস হবে তার, বেশ লম্বা, গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে। কাটঅফ জিনস পরে আছে, ওপরে পুরুষদের অক্সফোর্ড শার্ট, প্রান্তটা কোমরে গোঁজা, কব্জিতে রোলেক্স ডাইভার'স ওয়াচ। বাদামী চুল ছোট করে কাটা, কপাল থেকে পিছন দিকে টান টান হয়ে আছে। গলায় পেঁচানো কর্ড থেকে ঝুলছে একজোড়া সানগ্লাস।

'আমি টেডি ওয়াটারম্যান...লেফটেন্যান্ট ওয়াটারম্যান।'

'ওহ্,' বলল মেয়েটা। 'তুমি আসছ আমরা জানি। উঠে এসো, উঠে এসো!' হাসছে সে।

গ্যাঙওয়ে ধরে ডেকে উঠে পড়ল ওয়াটারম্যান।

'আমি জোনা...' বলল মেয়েটা, হাসিমুখে হাত বাড়াল। 'ছবি তুলি।' পথ দেখিয়ে জাহাজের পিছন দিকে, কেবিনের ভেতর নিয়ে এল তাকে।

কেবিনটা বেশ বড়, আরামদায়ক ফার্নিচারে সাজানো। ডেকে বোল্ট দিয়ে আটকানো একজোড়া সোফা, দুটো ফোল্ডিং টেবিল, খানকতক প্লাস্টিক চেয়ার, পেপারব্যাক বইয়ের কয়েকটা র‍্যাক ছাড়াও শেলফে রয়েছে একটা টেলিভিশন সেট ও ভিসিআর। সামনে ব্রিজে ওঠার ধাপ, আরেক প্রস্থ ধাপ নেমে গেছে পিছনের গ্যালি আর স্টেটরুমে।

একজন লোককে দেখা গেল, শক্ত-সমর্থ, চুলগুলো খুলি কামড়ে আছে, চেহারা দেখে বয়েস আন্দাজ করা কঠিন। ওয়াটারম্যান ধারণা করল, ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। ডেকে বসে জেমস বণ্ড মুভি

দেখছে ভিসিআর-এ।

'ও জর্জ,' বলল জোনা। 'সাব চালায়। জর্জ, এ টেডি।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল জর্জ। 'হাই!'

ওয়াটারম্যান দেখল একটা টেবিলে ভিড় করে রয়েছে ক্যামেরা, লাইট মিটার, ফিল্মের বাক্সসহ আরও নানা ধরনের জিনিস-পত্র। 'তোমাদের সঙ্গে কোন লেখক আছে নাকি?' জানতে চাইল সে।

'নেই,' বলল জোনা। 'সব আমিই করি। তাছাড়া, আমরা যদি এই জলদানবের ছবি তুলতে পারি, পড়ার আগ্রহ কারও থাকবে না।' পিছন দিকের সিঁড়িটা ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'নিচে এক জোড়া খালি কেবিন আছে। তোমার জিনিস-পত্র যেখানে খুশি রাখতে পারো।'

একটা চেয়ারে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল ওয়াটারম্যান। 'মরগান কে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'জাহাজের নামটা মরগান এক্সপ্লোরার হলো কেন?'

'ফিলিপ মরগান...মরগান বেয়ারিং...দা মরগান ফাউণ্ডেশন ...মরগান পাবলিকেশন্স। বেয়ারিং ফাউণ্ডেশনকে টাকা জোগান দেয়, জাহাজটার মালিক ফাউণ্ডেশন। প্রকাশনা সংস্থার দরকার হলে ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে ধার চায় জাহাজটা।'

'তুমি তাহলে ফিলিপ মরগানের চাকরি করো?'

'না, আমি ফ্রি ল্যান্সার। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি, ট্রাভেলার, ভয়েজার, যে-ই টাকা দেয় তার হয়েই কাজ করি।'

'হেই, নেভি ম্যান,' ব্রিজ থেকে হাঁক ছাড়ল এক লোক।

'এসো, ক্যাপটেন মিগুয়েল বারবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল জোনা, ওয়াটারম্যানকে নিয়ে ব্রিজে উঠে এল।

ক্যাপটেনের বয়েস প্রায় চল্লিশ। লাল চামড়া, মোটাসোটা। কড়া মাড় দেয়া সাদা শার্ট পরে আছেন, তাঁর সঙ্গে ক্যাপটেন'স শোল্ডার বোর্ড কোমরের নিচে নিখুঁত ভাঁজ সহ কালো ট্রাউজার, চকচকে কালো

জুতো। চার্টের ওপর রুলার-পেন্সিল দিয়ে কাজ করছেন তিনি। 'এই ভদ্রলোক, মি. মাসুদ রানা,' বললেন ক্যাপটেন, 'আমাকে এখানে নোঙর ফেলতে বলছেন।' চার্টের গায়ে পেন্সিলের টোকা দিলেন তিনি। 'কিন্তু এখানে তো বটম বলে কিছু নেই।'

'ব্যাপারটা তিনি আপনাকে ব্যাখ্যা করেননি?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'প্রতিটি ধাপ। এখানে এই পয়েন্টের চারপাশ, এখান থেকে উত্তর দিকের বয়া, তারপর উত্তর-পশ্চিম দিকে এসে এখান পর্যন্ত। কিন্তু চার্ট বলছে পাঁচশো ফ্যাদমের নিচে এখানে কোন বটম নেই। পাঁচশো ফ্যাদমে তো নোঙর ফেলার উপায় নেই আমার।'

'তিনি যা বলছেন তাই করুন,' পরামর্শ দিল ওয়াটারম্যান। 'উনি যদি বলেন ওখানে বটম আছে, তাহলে অবশ্যই আছে। না জেনে কথা বলার মানুষ মাসুদ রানা নন। হতে পারে সত্যি হয়তো কোন বটম নেই ওখানে, তবে পাহাড়ের একটা চূড়া থাকতে পারে, কিংবা একটা কার্নিশ। এমন কি শেলফের একটা অংশও হতে পারে।'

'কিন্তু চার্ট…।'

'চার্টের কথা ভুলে যান,' বলল ওয়াটারম্যান।

পাঁচটার সময় ডকইয়ার্ড ত্যাগ করল মরগান এক্সপ্লোরার, উত্তরের চ্যানেল মার্কারের দিকে যাচ্ছে। ওয়াটারম্যান ও জোনা কেবিনের মাথায় অবজারভেশন ডেকে দাঁড়িয়ে, দিগন্তরেখায় নেমে আসা সূর্যের আলো বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন স্তরের মেঘের গায়ে লেগে ওগুলোর রঙ বদলে দিচ্ছে।

'তুমি থাকো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'বলা যায় সান ফ্রান্সিসকোয়। আসলে কোথাও না। ওখানে খুদে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে বটে, শুধু ফেরার একটা জায়গা হিসেবে। বছরের দশ কি এগারো মাসই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়।'

'তারমানে তুমি বিবাহিত নও।'

'কি করে!' বলে হাসল জোনা। 'কে নেবে আমাকে, বলো? আমাকে তো সে দেখতেই পাবে না।'

'তাহলে এই পেশা বেছে নিলে কেন?'

'বলতে পারো নেশা,' এবার হাসল না জোনা। 'নেশাটা কি করে হলো বলি। সরে কলেজ থেকে বেরিয়েছি, পার্টটাইম কাজ করছি ক্যানসাসের ছোট একটা ম্যাগাজিনে। ওরা একটা কাজ দিল, আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে হিংস্র প্রাণীদের ছবি তুলতে হবে। গেলাম, তুললাম ছবি। ব্যস, ওয়াইল্ডলাইফ আমাকে পেয়ে বসল। বুঝলাম, ঘর-সংসার আর পেশা, দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে আমাকে—দুটোই একসঙ্গে পাওয়া হবে না। আমার ফটোগ্রাফার বন্ধুরা, স্পোর্টস বা অ্যাডভেঞ্চারে স্পেশালাইজড, দশজন বিয়ে করেছে, কিন্তু নয়জনের বিয়েই টেকেনি।'

'পেশাটা কি এত ভাল যে নিজেকে এভাবে বঞ্চিত করা যায়?'

'এতদিন তো ভালই লেগেছে। দুনিয়ার প্রায় সবখানে গেছি আমি, আমার পাসপোর্ট ফোন বুকের মত মোটা। বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, উদ্ভট সব কাণ্ড ঘটিয়েছি, ছবি তুলেছি বাঘ থেকে শুরু করে সৈনিক পিঁপড়েদের। তবে এবার যেন ক্লান্ত লাগছে। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয়, এবার কোথাও স্থির হয়ে বসি। কিন্তু যখনই এ-সব চিন্তা করি, ঠিক একটা ফোন আসে, অমনি আবার ছুটতে হয় আমাকে।' হাত তুলে সাগর দেখাল জোনা। 'এই যেমন এবার।'

'বড় আকৃতির স্কুইড সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'কিছুই জানি না। মানে, প্রায় কিছুই জানি না। আসার পথে কয়েকটা আর্টিকেল পড়েছি। জেনেছি, আজ পর্যন্ত কেউ ওটার ছবি তুলতে পারেনি। আমার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। আগে কেউ করেনি, এরকম কাজ করার সুযোগ খুব কমই আসে।'

'ওগুলো বিরল, জানো তো? আর অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'সেখানেই তো মজাটা,' বলল জোনা। 'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো, টেডি। আমরা এমন একটা কাজ করার জন্যে টাকা পাচ্ছি যে কাজটা করার জন্যে অনেকে নিজের পকেট থেকে সব টাকা বের করে দিতে রাজি আছে। ঝুঁকি নাও, আবিষ্কার করো। এর নামই তো জীবন।'

জোনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুকে একটা ব্যথা অনুভব করল ওয়াটারম্যান, যে ব্যথাটা অনেকদিন হলো সে অনুভব করে না। চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার কথা মনে পড়ে গেছে ওর।

'আমি আপনাকে বলছি,' বললেন ক্যাপটেন বারবি, ইঙ্গিতে ফ্যাদোমিটারটা দেখালেন, 'ওখানে কোন বটম নেই।' চৌকো স্ক্রীনে অস্পষ্ট কমলা রঙের আলো প্যাঁক খাচ্ছে, চারশো আশি ফ্যাদম মার্ক পেরোবার সময় উজ্জ্বল হচ্ছে সামান্য।

'কোন ভুল হয়নি তো, ঠিক জায়গায় পৌঁচেছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'স্যাটন্যাভ তাই বলছে, ঠিক জায়গায় রয়েছি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ওয়াটারম্যান। পানির রঙে এমন কিছু নেই যা দেখে বোঝা যাবে আশপাশে কোথাও অগভীর কিছু আছে। ইউনিফর্মের খাকি মনে হচ্ছে সাগরকে। 'আপনি নোঙর ফেলুন,' বলল সে।

'আপনার পক্ষে বলা সহজ, নেভি ম্যান,' ঘ্যোৎ ঘ্যোৎ করলেন ক্যাপটেন বারবি। 'আমাদের অ্যাংকার আর চেইন অত্যন্ত দামি জিনিস...।'

'ফেলুন। যদি খোয়া যায়, আমি নিজে ডুব দিয়ে তুলে আনব।' হাসল ওয়াটারম্যান।

তার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন, বললেন, 'শুধু আপনার কথায়।' একটা বোতামে চাপ দিয়ে রিলিজ করলেন নোঙর। পানিতে ছলাৎ করে একটা শব্দ হলো, বোর দিক থেকে ভেসে এল চেইন নেমে যাবার আওয়াজ। চেক শার্ট পরা একজন ক্রু ফোরডেকে দাঁড়িয়ে, চেইনের নেমে যাওয়া দেখছে।

'আপনার সাইড স্ক্যান অন করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'অবশ্যই।'

সাইড স্ক্যান সোনারের সুইচ অন করল ওয়াটারম্যান, মুখটা চেপে ধরল রাবার গ্যাসকিট-এ। ধূসর স্ক্রীন উজ্জ্বল হলো, ফুটে উঠল সাদা একটা রেখা, রিফ্লেক্টেড সোনার ইমপালস-এর তৈরি, আধ মাইল দূরে সাগরতলের রঙিন নকশা দেখাচ্ছে। কোথায় ওটা? ভাবছে সে। গোপন একটা শেলফ না থেকেই পারে না, গভীর তলায় তলিয়ে যাবার আগে সেটার ওপর অবশ্যই আটকাবে নোঙর। কোথায়?'

শুনতে পেল ক্যাপটেন বারবি বলছেন, 'আপনার কথা শুনে দেখছি বোকামিই করলাম!' আর ঠিক তখনই সোনার স্ক্রীনের বাম কোণে খুদে একটা সাদা দাগ ফুটল, ফুটিয়ে তুলল পাহাড়-প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসা একটা বাহু। চেইন নেমে যাবার শব্দ থেমে গেল।

'দু'শো দশ ফুট,' ক্যাপটেন বারবি বললেন। 'হাউ দা হেল মি. রানা নোয দ্যাট? উনি তো শুনেছি লোকালও নন!'

'গত দশ বছরে সাত-আটবার বারমুডায় এসেছেন তিনি,' বলল ওয়াটারম্যান। 'প্রতিবার এসে মন্থন করেছেন সাগর। ভদ্রলোকের এ এক নেশা। প্রতিটি কার্নিশ তাঁর চেনা। তিনি জানেন, স্রোত কিভাবে আপনার নোঙরটাকে বয়ে নিয়ে যাবে।'

'ভদ্রলোক কি জানেন, কোথায় পাওয়া যাবে স্কুইডটাকে?'

'স্কুইডের খবর কেউ জানে না,' বলল ওয়াটারম্যান, সিঁড়ি বেয়ে কেবিনে নেমে গেল সে।

কেবিনে ডিনার খেলো ওরা। হ্যামবার্গার, ধূমায়িত পাস্তা আর স্যালাড। বাসন-পেয়ালা ধোয়ার পর দু'জন ক্রুকে নিয়ে ভিসিআর-এ 'দা হান্ট ফর দা রেড অক্টোবর' দেখতে বসল জর্জ, ক্যাপটেন বারবি ফিরে গেলেন ব্রিজে।

ওয়াটারম্যান আর নিজের জন্যে কাপে কফি ঢালল জোনা, ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা সিগারেট বের করল, তারপর পথ দেখিয়ে বেরিয়ে এল খোলা স্টার্নে। চাঁদটা এত বেশি উজ্জ্বল, চারপাশের সবগুলো তারাকে নিভিয়ে দিয়েছে। সাগর কাঁচের মত সমতল দেখাচ্ছে।

'তোমার ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল জোনা। 'বিয়ে করেছ?'

'না,' বলল ওয়াটারম্যান। তারপর, কি মনে করে, সে তার অকালে হারিয়ে যাওয়া দুঃখজনক প্রেমের কাহিনীটা শোনাল।

'মর্মান্তিক,' শোনার পর মন্তব্য করল জোনা। 'এ-ধরনের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে, আমার বোধহয় নেই।'

ওয়াটারম্যান কিছু বলার আগে ক্যাপটেনের চিৎকার ভেসে এল ব্রিজ থেকে, 'হ্যালো, নেভি ম্যান!'

একটা প্যাসেজ ধরে পোর্ট সাইডে চলে এল ওরা, ইস্পাতের ধাপ বেয়ে ব্রিজের দরজা পর্যন্ত উঠল।

'ভেতরে ঢুকুন,' আহ্বান জানালেন ক্যাপটেন বারবি।

ব্রিজে ঢুকল ওয়াটারম্যান। অন্ধকারে পরিত্যক্ত একটা নাইটক্লাবের মত লাগছে। আলো বলতে শুধু ইলেকট্রনিক গিয়ারে লাল, সবুজ আর কমলা আভা দেখা যাচ্ছে।

'জিনিসটা দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন, সাইড-স্ক্যান সোনার-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'কি দেখব?'

'নোঙরের চেইন টান টান হয়ে আছে জাহাজের নিচে, এদিক ওদিক নড়াচড়া করছি আমরা। আমার মনে হচ্ছে, আমরা সম্ভবত একটা শিপরেকের ওপর দোল খাচ্ছি।'

সোনার স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ওয়াটারম্যান ভাবছে পুরানো একটা শিপরেক পাওয়া গেলে কি মজাই না হয়। হয়তো কয়েকশো বছর ধরে পড়ে আছে ওখানে, কোন হাতের স্পর্শ পায়নি। ওদের সঙ্গে সাবমারসিবল আছে, কাজেই শিপরেকে পৌঁছুতে পারবে, ওটার ফটো তুলতে পারবে, এমনকি মূল্যবান কিছু উদ্ধার করাও সম্ভব হতে পারে।

চোখ বন্ধ করে আবার খুলল ওয়াটারম্যান, ধূসর স্ক্রীনের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। তার জানা আছে সাইড-স্ক্যান সোনার ইমেজ অত্যন্ত নিখুঁত হয়, যদি ডুবে থাকা জিনিসটার আকৃতি অবিকৃত থাকে। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিতে সাইড-স্ক্যান সোনারের একটা ছবি দেখেছিল সে, আর্কটিকে ডোবা একটা জাহাজের। সাগরের তলায় সিধে ভাবে পড়েছিল সেটা, মাস্ট আর সুপারস্ট্রাকচার পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এখুনি কোথাও রওনা হবে। কিন্তু নোঙর সহ মাত্র তিনশো ফুট পানিতে ডুবেছিল সেটা। কিন্তু এখানে যদি কোন জাহাজ থাকে, সারফেস থেকে নেমে গেছে আধ মাইল, নামার সময় ডিগবাজি খেতে খেতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার কথা। লোহা-লক্কড়ের স্তূপ ছাড়া আর

কিছু থাকার কথা নয়।

আকৃতিবিহীন একটা দাগ দেখতে পেল ওয়াটারম্যান। স্ক্রীনের পাশে ফুটে থাকা সংখ্যাগুলোর ওপর চোখ বুলাল সে। দাগটা বিশ কিংবা ত্রিশ মিটার লম্বা। শিপরেকের জন্যে সাইজটা ঠিকই আছে।

'হতে পারে,' বলল সে।

'সাব নিয়ে কাল একবার দেখে আসবেন,' ক্যাপটেন বারবি বললেন। 'যুদ্ধের সময় এদিকটায় অনেক জাহাজ ডুবেছে, ওটা হয়তো সেগুলোরই একটা। প্লীজ, লোরান নাম্বারগুলো দিন আমাকে।'

সোনার স্ক্রীনের সামনে থেকে পিছিয়ে এল ওয়াটারম্যান, লোরান-এর দিকে এগোল। নম্বরগুলো বলে গেল সে, একটা কাগজে লিখে নিলেন ক্যাপটেন।

সোনার স্ক্রীনের দিকে কেউ তাকাল না আর। যদি তাকাত, আকৃতিবিহীন দাগটায় মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করত ওরা। দেখতে পেত, কয়েকটা রেখা মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল নতুন কয়েকটা। ওদের তিন হাজার ফুট নিচে জিনিসটা নড়তে শুরু করেছে।

ঝনঝন একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওয়াটারম্যানের। কোথায় রয়েছে বুঝতে পারল না সে। বেডটা ছোট, তার নয়, আলোও খুব কম। ঝন ঝন শব্দটা এখনও হচ্ছে, মাথার পিছনে কাছাকাছি কোথাও থেকে। কাত হয়ে পিছন দিকে তাকাতে ইন্টারকম ফোনটা দেখতে পেল বাল্কহেডের ওপর। ফোন তুলে নিজের নাম বলল সে।

'উঠে পড়ো, টেডি,' জোনা বলল। 'যাবার সময় হয়েছে।'

ফোনটা রেখে দেয়ার সময় শিরশির করে উঠল ওয়াটারম্যানের শরীর। এই অভিযানে স্বেচ্ছায় এসেছে সে, কিন্তু কাল যেটা উত্তেজনাকর ছিল আজ সেটা ভীতিকর মনে হচ্ছে। জীবনে কখনও

সাবমেরিনে চড়েনি সে। এটা তো আবার আকারে একটা সাবওয়ে কার-এর তিন ভাগের এক ভাগ। লোক ঠাসা এলিভেটর পছন্দ করে না সে। কে-ই বা করে? জাহাজের ভেতর দিকের কেবিনেও কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে তার।

ঠিক আছে, এত ভয় পেলে চলে না।

দাড়ি কামিয়ে জিনস আর শার্ট পরল ওয়াটারম্যান। পায়ে উলের মোজা পরল, শার্টের ওপর চাপাল একটা সোয়েটার। ধীরে ধীরে ফিরে আসছে আগের উত্তেজনা। আর কিছু না হোক, কাজটার মধ্যে অ্যাকশন আছে, আছে চ্যালেঞ্জ। জোনার ভাষায়, এটাই তো জীবন।

দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে মাত্র উঠে এসেছে সূর্য, এই সময় কেবিনে পৌঁছুল ওয়াটারম্যান, ভেতরে ঢুকে নিজের জন্যে একটা কাপে কফি ঢালল। কেবিনের পিছন দিকের জানালা দিয়ে দেখল, একজন ক্রুকে সঙ্গে নিয়ে সাবমারসিবলের ওপর থেকে তারপুলিন সরাচ্ছে জর্জ। জোনা রয়েছে আফটারডেকে, একটা আণ্ডারওয়াটার হাউজিং-এ ভিডিও ক্যামেরা বসাচ্ছে। ডানদিকে তাকাল ওয়াটারম্যান, দেখল জাহাজের পোর্ট সাইডে বাঁধা রয়েছে সী কুইন। কেবিন থেকে বেরুতে যাবে, পিছনে রানার গলা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ব্রিজে রয়েছে রানা, কথা বলছে ক্যাপটেন বারবির সঙ্গে।

'মর্নিং, টেডি,' ওয়াটারম্যান ব্রিজে উঠে আসছে দেখে বলল রানা। 'বেল আমাকে সব বলেছে। কিন্তু সাবমারসিবলে সত্যি তুমি থাকতে চাও? নাকি সিদ্ধান্ত পাল্টেছ?'

'না,' বলে মাথা নাড়ল ওয়াটারম্যান। 'সিদ্ধান্ত পাল্টাইনি।'

ক্যাপটেনের দিকে ফিরল রানা। 'মি. বেলকে আপাতত আমি ছেড়ে দিচ্ছি, লাঞ্চের পর আমাদের গিয়ারের সাহায্যে সাব-এর ওপর নজর রাখবেন তিনি।'

'মি. রানা, আপনারা আসলে কি করতে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল ওয়াটারম্যান।

'বেল বলছে, তোমার ওপর একটা চোখ রাখতে হবে,' বলে মৃদু হাসল রানা। 'বেল তার বন্ধুকে হারাতে চায় না।' ব্রিজ থেকে নেমে গেল ও, পোর্ট সাইড থেকে কথা বলবে বেলের সঙ্গে।

কফির কাপ হাতে স্টার্নে চলে এল ওয়াটারম্যান। মইয়ের মাথায় পৌঁচেছে, দেখল ওপরে উঠে আসছে জোনা। ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলল মেয়েটা। মেইন কেবিনের মাথার ওপর, ব্রিজের পিছন দিকে, ওয়াটারটাইট একটা দরজা গলে ভেতরে ঢুকল ওরা।

এটা সাবমারসিবলের কন্ট্রোল রুম। ভেতরটা অন্ধকার, মাথার ওপর শুধু লাল একটা বালব জ্বলছে, আর চারটে টেলিভিশন মনিটরে দেখা যাচ্ছে রঙিন বার। একজন ক্রু, তার নাম এলিস, একটা প্যানেলের সামনে বসে আছে। প্যানেলের গায়ে অসংখ্য রঙিন আলো আর কী-বোর্ড বাটন। হেডসেট আর মাইক্রোফোন পরে রয়েছে এলিস।

'আমাদের সমস্ত সিস্টেমের ওপর চোখ রাখে এলিস,' বলল জোনা। 'ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক, ফিলিপ মরগানের বন্ধু, মি. রানা এখানে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে যখন খুশি কথা বলতে পারব আমরা সাবমারসিবল থেকে।'

টিভি মনিটরগুলোর দিকে একটা হাত তুলল ওয়াটারম্যান। 'সাবমারসিবলের সঙ্গে সারফেসের যোগাযোগ থাকবে হার্ড-ওয়্যারের মাধ্যমে?'

'সব কিছু ভিডিওতে টেপ করা হবে, ফাউণ্ডেশনের জন্যে। একটা মাত্র ফাইবার-অপটিক কেবল সব কাজ করবে। সাবের ভেতরে বাইরে আমার ভিডিও ক্যামেরা আছে, স্টিল ক্যামেরা ছাড়াও। তুমি কি একটা চাও? আমরা আলাদা পোর্টহোলে থাকব, দেখতেও পাব হয়তো আলাদা

দৃশ্য।'

'হ্যাঁ, দাও,' বলল ওয়াটারম্যান, 'তোমার কাছে সত্যি যদি কোন ইডিয়ট-প্রুফ ক্যামেরা থাকে। কি ধরনের ছবি চাও তুমি? মানে, কিসের? প্রবাল, শ্যাওলা···?'

'ও-সবে কাজ হবে না।' নিঃশব্দে হাসল জোনা। 'দানব। সব বাদ দিয়ে শুধু জলদানবের ছবি তুলব।'

কাছ থেকে সাবমারসিবলটাকে অতিকায় অ্যান্টিহিস্টামিন ক্যাপসুলের মত দেখাচ্ছে! তবে এটার বাহু আছে। প্রতিটি বাহুর শেষ মাথায় চিমটে রয়েছে, সেগুলোর মাঝখানে ফিট করা হয়েছে একটা করে ভিডিও ক্যামেরা।

ইতিমধ্যে আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। এক ফোঁটা বাতাস নেই। গোল হ্যাচটা সাবমারসিবলের মাথায়, নিচু হয়ে ভেতরে ঢোকার সময় ওয়াটারম্যানের কপাল থেকে কয়েক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল। ক্রেন কন্ট্রোলার ক্রু হাত তুলে ইঙ্গিত দিল তাকে, উত্তরে জোর করে সামান্য হাসল সে।

সাবমারসিবলের ভেতর আগেই ঢুকে পড়েছে জোনা ও জর্জ। খাটো একটা ভেস্ট পরে আছে জর্জ, কুঁজো হয়ে সামনের দিকে চলে গেল সুইচ তার,আর গজ পরীক্ষা করার জন্যে।

ক্যাপসুলের ভেতরটা টিউব আকৃতির, বারো ফুট লম্বা, ছয় ফুট চওড়া, পাঁচ ফুট উঁচু। তিনটে পোর্টহোল, একটা জর্জের জন্যে বোতে, দু'পাশের দুটো জোনা আর ওয়াটারম্যানের জন্যে। ওয়াটারম্যানের পোর্টহোলের সামনে ইস্পাতের ডেকে চৌকো একটা কুশন দেখা যাচ্ছে, নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোল সে। পৌঁছে দেখল, শরীরের নিচে হাঁটু ভাঁজ করে বসা যায় কুশনটার ওপর, কিংবা হাঁটুর

ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে পোর্টহোলে সেঁটে থাকবে মুখটা। আরেক কাজ করা যায়, ইচ্ছে করলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে পারে সে, পা দুটো ভাঁজ হয়ে থাকবে। মোট কথা, সোজা হবার কোন উপায় নেই।

শিরায় যদি টান ধরে, বা যদি ক্র্যাম্প দেখা দেয়? থাক, এ-সব নিয়ে ভেব না, নিজেকে পরামর্শ দিল সে। 'বটমে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল জোনাকে।

'আধ ঘণ্টা,' বলল জোনা। 'প্রতি মিনিটে একশো ফুট নামতে পারি আমরা।'

মন্দ নয়, ভাবল ওয়াটারম্যান। এক ঘণ্টা বেঁচে থাকার শক্তি-সামর্থ্য তার আছে। 'আর নিচে আমরা কতক্ষণ থাকব?'

'চার ঘণ্টা।

'চার ঘণ্টা!' অসম্ভব, ভাবল ওয়াটারম্যান। চার ঘণ্টা নিচে থাকতে হলে ভয়েই মরে যাব আমি।

শুনতে পেল, হিসহিস শব্দে মাথার ওপর বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ।

ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্স সহ ছোট একটা থারটিফাইভ-এমএম ক্যামেরা ওয়াটারম্যানের দিকে বাড়িয়ে ধরল জোনা, বলল, 'লোড করা আছে। শুধু বোতাম চাপ দিলেই হবে।'

ক্যামেরাটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ওয়াটারম্যান, কিন্তু ঘামে ভেজা তালু থেকে পিছলে গেল সেটা। ইস্পাতের ডেকে পড়ে যাচ্ছে, এক ইঞ্চি বাকি থাকতে ধরে ফেলল জোনা। 'কি ব্যাপার, টেডি? তোমাকে এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন?'

'সত্যি?' ট্রাউজারে হাত মুছে জোনার হাত থেকে ক্যামেরাটা নিল ওয়াটারম্যান।

'তোমার উদ্বেগের কারণটা কি? এটা একটা অত্যাধুনিক ডীপ বোট,

আর জর্জ অত্যন্ত অভিজ্ঞ পাইলট।' হাসল জোনা। 'ঠিক বলেছি না, জর্জ?'

'এ-প্লাস,' বলল জর্জ। হেডসেট থেকে ঝুলে থাকা মাইক্রোফোনে কিছু বলল সে, তারপর হঠাৎ ঝাঁকি খেলো ক্যাপসুল, ক্রেডল থেকে ওটাকে শূন্যে তুলে নিচ্ছে ক্রেন। প্রথমে ওপরে উঠল, তারপর এক পাশে সরে গেল, জাহাজের বাইরে। কিছুক্ষণ দোল খেলো সাব, ডেকে ছিটকে পড়ার ভয়ে পোর্টহোলের কিনারা আঁকড়ে ধরে শরীরটাকে শক্ত করে রাখল ওয়াটারম্যান। তারপর ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল সাব, এক সময় পানির স্পর্শ পেল। নড়াচড়ার ধরন বদলে গেল, এখন শুধু সামান্য দোল খাচ্ছে।

পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল ওয়াটারম্যান, দেখল সাগরের পানি লাফ দিচ্ছে কাঁচ লক্ষ্য করে। মাথার ওপর থেকে ধাতব আওয়াজ ভেসে এল, সাবমারসিবলের লিফটিং রিঙ থেকে খুলে নেয়া হলো জিঞ্জির।

ডুবতে শুরু করল ক্যাপসুল। পোর্টহোল ঢাকা পড়ে গেল পানিতে। মুখটা কাঁচে ঠেকিয়ে চোখের তারা ওপর দিকে তাক করল ওয়াটারম্যান, সূর্যের আলো শেষবার দেখে নিতে চাইছে। সচল পানির ভেতর দিয়ে নীল আকাশ, সাদা মেঘ আর সোনালি রোদকে একসঙ্গে নাচানাচি করতে দেখল সে।

তারপর রঙগুলো ফিকে হয়ে এল, দেখা যাচ্ছে শুধু হালকা নীল কুয়াশা কুয়াশা ভাব। সব শব্দ থেমে গেছে, শোনা যাচ্ছে শুধু ইলেকট্রিক মোটরের কোমল গুঞ্জন।

দুনিয়াটাকে গিলে ফেলেছে সাগর।

কপালের ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে, পিঠ আর বগলের তলাও শুকিয়ে গেল। ঠাণ্ডা লাগছে তার। এক মিনিটেরও কম সময়ে তাপমাত্রা নেমে গেছে প্রায় ত্রিশ ডিগ্রী। তবে চিটচিটে ঘাম এখনও বেরুচ্ছে গা থেকে।

কারণটা গরম নয়, ভয়। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার ভয়।

পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখল হালকা নীল বদলে যাচ্ছে, হয়ে উঠছে বেগুনি। সাহস করে নিচের দিকে তাকাল সে। সূর্যের রশ্মিগুলো যেন পানিকে আলোকিত করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, কিন্তু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ওগুলো, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। বেগুনির পর কালো হয়ে উঠল পানি। নিচে শুধু অন্ধকার।

ধীরে ধীরে নামছে ওরা, কিছুই দেখছে না, কিছুই শুনছে না, কিছুই অনুভব করছে না। বোধহয় সেজন্যেই স্বস্তিবোধ করছে ওয়াটারম্যান। অবশ্য খানিক পরই রানার বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। গভীর সাগরে অচেনা-অজানা কত রকম হিংস্র প্রাণীর বসবাস। শিউরে উঠল সে।

জমাট বরফ হয়ে যাচ্ছে ওয়াটারম্যান। উলেন মোজার ভেতর তার গোড়ালি অসাড় হয়ে গেছে, ব্যথা করছে আঙুলগুলো। সোয়েটারের ভেতর হাত দুটো ভরে বগলের তলায় চেপে গরম করার চেষ্টা করল, পোর্টহোল থেকে পিছন দিকে হেলান দিয়ে তাকাল জর্জের দিকে, তার কাঁধের ওপর দিয়ে চোখ বুলাল কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর। বাইরের তাপমাত্রা চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মত। ভেতরের তাপমাত্রা বেশি গরম নয়, পঞ্চাশের সামান্য বেশি। এই মুহূর্তে দু'হাজার ফুট নিচে রয়েছে ওরা, এখনও নামছে।

নিজের মাইক্রোফোনে জর্জ বলল, 'আলো জ্বালছি।' একটা সুইচ অন করল সে। সাবমারসিবলের মাথার ওপর এক হাজার ওয়াটের দুটো ল্যাম্প জ্বলে উঠল, হলুদ আলোর বন্যা বয়ে গেল, আলোকিত হয়ে উঠল পনেরো থেকে বিশ ফুট পানি। সেই সঙ্গে ওদের চোখের সামনে জ্যান্ত হলো জলজ প্রাণীদের একটা জগৎ। খুদে প্ল্যাঙ্কটনিক জীবাণু পাক

খেতে খেতে আলোর ভেতর ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে, সাগরের প্রাণ যেন তুষারঝড়ের আদল পেয়েছে এখানে। অতি ক্ষুদ্র একটা শ্রিম্প পোর্টহোলে এসে ঠেকল, মার্চ করার ভঙ্গিতে হেঁটে গেল কাঁচের ওপর দিয়ে। ধূসর আর লাল কি যেন একটা, রিবনের মত দেখতে, হলুদ চোখ, মাথায় খুদে একটা খোঁটার মত, মোচড় খেতে খেতে উঠে এল পোর্ট-হোলের কাছে, ঝাঁকি খেলো কিছুক্ষণ, তারপর এঁকেবেঁকে ছুটে গেল।

'দেখো,' বলল জর্জ, হাত তুলে নিজের দিকের পোর্টহোলটা দেখাল। ঘাড় বাঁকা করে তাকাল ওয়াটারম্যান, কিন্তু জিনিসটা যা-ই হোক ইতিমধ্যে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজের পোর্টহোলে ফিরে এল সে, এক মুহূর্ত পর দেখতে পেল ওটাকে—শান্ত ভঙ্গিতে টিউবটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, যেন কল্পজগতের অদ্ভুত এক প্রাণী।

ওটা একটা অ্যাংলারফিশ—গোল, ফোলা ফোলা, খয়েরি হলুদ, পিছনে ছোট আকৃতির শ্লৈষ্মিক ফিন। চোখ দুটো বেরিয়ে আছে নীল-সবুজ ক্ষতের মত, হীরের তৈরি সুচের মত দাঁত, মাংসে পরস্পরকে ভেদ করে যাওয়া রেখার মত অসংখ্য কালো শিরা। যেখানে নাক থাকার কথা সেখানে একটা সাদা ও সরু দণ্ড রয়েছে, দণ্ডের ওপর জ্বলছে একটা আলো।

অ্যাংলারফিশের ছবি দেখেছে ওয়াটারম্যান। লাইটপোস্টের আলোগুলো ব্যবহার করে টোপ হিসেবে, হাঁ করা মুখের সামনে আলো দোলায় কৌতূহলী ও অসতর্ক শিকার আকৃষ্ট করতে।

'ওগুলো কত্ত বড় বল তো?'

পিছনে বা আশপাশে আর কিছু না থাকায় ওটার তুলনা করতে পারল না ওয়াটারম্যান, বুঝতে পারল না মাছটা কত দূরে বা কত বড়।

'তবু আন্তাজ করো তো,' আহ্বান জানাল জর্জ।

দুই হাত দুটো তুলে দু'ফুট দেখাল ওয়াটারম্যান।

হেসে উঠল জর্জ, একটা হাত তুলে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল ফাঁক করল। মাছটা খুব বেশি হলে চার ইঞ্চি লম্বা।

জোনার ক্যামেরা থেকে শব্দ বেরিয়ে আসছে। পোর্টহোলের সঙ্গে চেপে ধরেছে লেন্স। ওয়াটারম্যান তাকে বলল, 'আমি ভাবছিলাম তুমি শুধু জলদানবের ছবি তুলবে।'

'কিসের ছবি তুলছি দেখে যাও!' নিজের পোর্টহোলটা ইঙ্গিতে দেখাল জোনা। 'গুড গড, দেখো দেখো!'

ওয়াটারম্যান দেখল হলুদ একটা ঝলক পাশ কাটাল জোনার পোর্টহোল। ঘাড় ফেরাল সে, জিনিসটা দেখতে পাবার আশায় নিজের পোর্টহোলে তাকাল।

ঘুরে ঠিকই এদিকে চলে এল সেটা। দেখে মনে হলো প্রাণীটার কোন ফিন নেই। হলুদ একটা তীর বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়, পার্থক্য শুধু এই যে ওটার পেট আর নাড়ীভুঁড়ি একটা থলে থেকে ঝুলে আছে, অনুসরণ করছে ওটাকে, মোচড় খাচ্ছে। ওটার নিচের চোয়ালে আলপিনের মত অসংখ্য দাঁত, আর মাথার ওপর সাদা-কালো চোখ, ঠিক যেন গোল বোতাম।

একটু পরই আরও নানা ধরনের প্রাণী ক্যাপসুলটার চারদিকে ভিড় করল, আলো তাদেরকে টেনে এনেছে। কৌতূহলী, একটুও ভয় পাচ্ছে না। সাপের মত কয়েকটা প্রাণী দেখা গেল, পিঠে এত চুল যে পতাকার মত ঢেউ তুলছে। বিরাট চোখঅলা ঈল, মাথার ওপর টিউমারের মত কি যেন।

চমকে উঠল ওয়াটারম্যান, হঠাৎ ক্যাপসুলের ভেতর স্পীকার থেকে বেরিয়ে এল রানার গমগমে গলা, 'মনে হচ্ছে নিচে তোমরা একটা চিড়িয়াখানা পেয়ে গেছ, ওয়াটারম্যান। এরপর কোথায় ট্র্যাপ ফেলতে হবে, বেলকে আমরা জানাতে পারব।'

‘ছবিগুলো একবার দেখলে হয় শুধু,’ বলল ওয়াটারম্যান, ‘অ্যাকুয়েরিয়ামের লোকেরা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসবে ওর কাছে।’ ভয়ের কথা ভুলে, শীত অগ্রাহ্য করে, জোনার দেয়া ক্যামেরাটা তুলে নিল সে, অ্যাডজাস্ট করল ফোকাস। কুশনে হাঁটু গাড়ল, অপেক্ষা করছে পরবর্তী খুদে রহস্য কখন পোর্টহোলের বাইরে হলুদ আলোর ভেতর ঢুকবে।

নিজের গালে চড় মারল বেল, জ্বালাটা এক মুহূর্ত জাগিয়ে রাখল তাকে। যে-ই মাত্র ফিশ-ফাইণ্ডারে ফিরে এল চোখ, অনুভব করল পাতাগুলো আবার নেমে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জাহাজটা সিকি মাইল দূরে হবে, ওটার পিছনে খয়েরি একটা স্তূপের মত দেখা যাচ্ছে বারমুডাকে। তাছাড়া, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত সাগর পুরোপুরি খালি।

রানা তাকে ফিশ-ফাইণ্ডারে সারাক্ষণ চোখ রাখতে বলেছে। ফিশ-ফাইণ্ডার নয়, রানা বলেছে সাইড-স্ক্যান সোনার। যাই হোক, এক ঘণ্টারও বেশি ঠিক তাই করেছে বেল। কিন্তু দৃশ্যটা একবারও বদলায়নি। একটা রেখা আছে স্ক্রীনে, সাগরের তলা ওটা, তার ঠিক ওপরেই খুদে একটা বিন্দু, প্রতিনিধিত্ব করছে সাবমারসিবলের। ব্যস, আর কিছু নেই। ভাঙা কোন দাগ নেই যে এক ঝাঁক মাছের সংকেত দেবে। নিরেট কোন দাগও নেই, যা দেখে বোঝা যাবে ওখানে কোন তিমি আছে।

সাগরে এখন যে পরিস্থিতি, বোটে একা থাকতে ভাল লাগার কথা নয় তার। তবে আয়োজনটার কথা শুনে আপত্তি করেনি সে। কাছেই একটা জাহাজ রয়েছে, তাতে রয়েছে রানা। সমস্ত তৎপরতা আধ মাইল দূরে, তাকে বা তার বোটকে বিপদে ফেলতে যাচ্ছে না। তার কাজ শুধু

নজর রাখা, যদি কিছু দেখতে পায় রিপোর্ট করা।

অসুবিধে শুধু এই যে ঘুম পাচ্ছে তার। ঘুম পাচ্ছে মানে কি, বলা যায় রীতিমত সম্মোহিত হয়ে পড়ছে। শুধু যে স্ক্রীনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলে তা নয়, সাগরের ঢেউ সী কুইনকে ধীর একটা ছন্দে সারাক্ষণ দোল দিচ্ছে, কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'বার। দু'বারই, বাল্কহেডে মাথা ঠুকে না গেলে তার ঘুম বোধহয় ভাঙতই না।

ঘড়ঘড় করে জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও, রানার গলা শুনতে পেল বেল। 'সী কুইন...সী কুইন...সী কুইন...কাম ব্যাক।'

মাইক্রোফোনটা তুলে নিল বেল, 'টক' বাটন ঠেলে বলল, 'গো অ্যাহেড, রানা।'

'কেমন চলছে তোমার?'

'মড়ার মত ঘুম পাচ্ছে।'

'কিছুই ঘটছে না, কাজেই খানিক বিশ্রাম নিতে পারো তুমি।'

'আমি বরং এক কাপ কফি বানিয়ে খাই, তারপর তাজা বাতাসে বেরিয়ে পাম্পটা মেরামত করতে বসি।'

'ভলিউম বাড়িয়ে দাও, দরজাটা খোলা রাখো, আমি ডাকলে যাতে শুনতে পাও,' বলল রানা। 'ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, রানা। স্ট্যাণ্ডিং বাই।'

মাইক্রোফোনটা হুকে আটকে রাখল বেল। আরেকবার তাকাল ফিশ-ফাইণ্ডারের দিকে, দেখল দৃশ্যটা বদলায়নি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচে নেমে গেল সে।

হুইলহাউসে ফিশ-ফাইণ্ডার এখনও আভা ছড়াচ্ছে। বেশ কয়েক মুহূর্ত ছবিটা এমন স্থির হয়ে থাকল, ওটা যেন একটা স্টিল পিকচার। তারপর, স্ক্রীনের ডান পাশে, নতুন একটা চিহ্ন দেখা গেল। দাগটা

নিরেট, অবিচ্ছিন্ন, স্ক্রীন বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে, উঠছে সাবমারসিবলের দিকে।

চার

জলদানবের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এতদিন, বেড়ে ওঠার সময়, বেঁচে ছিল খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে—স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেছে, যাবার পথে যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। কিন্তু খাদ্যের প্রাচুর্য আর নেই, নিষ্ক্রিয়তা এখন আর অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না।

ওটার ইন্সটিংক্ট বদলায়নি, ওগুলো জেনেটিক্যালি প্রোগ্রামড, অপরিবর্তনীয়—তবে বেঁচে থাকার আবেগ বা প্রেরণা বদলে গেছে। চারপাশের পরিস্থিতি বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে এখন আর বেঁচে থাকার উপায় নেই, পরিস্থিতি তাকে শিকারী হয়ে উঠতে বাধ্য করেছে।

আগ্নেয়গিরিটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে দুটো স্রোত, এই মুহূর্তে স্রোত দুটো যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে ঝুলে রয়েছে জলদানব। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি, সাগরের স্বাভাবিক ছন্দে কোথায় যেন একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

চারপাশে একটা পরিবর্তন অনুভব করল সে, তার জগতে হঠাৎ যেন একটা শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। অস্পষ্ট, তবে একটানা কম্পন জাগছে

পানিতে, ছোটখাট প্রাণীরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, বড়গুলো যেন খুব সাবধানে সরে যাচ্ছে দূরে, বদলে যাচ্ছে পানির চাপ।

মানুষের ছোট ও তুলনায় দুর্বল চোখে কোন আলো ধরা পড়বে না, কিন্তু জলদানবের প্রকাণ্ড চোখগুলো ক্ষীণ হলেও আলোর আভা দেখতে পেল। তারপর শুধু আভা নয়, অনেক ওপরে আলোর টানেল চোখে পড়ল, নড়াচড়া করছে, সম্মোহিত করছে অন্যান্য প্রাণীদের।

জলদানব কয়েক দিন হলো খায়নি। সময়ের হিসাব তার জানা নেই, তবে সে তৎপর হয় প্রয়োজনের তাগিদে, নির্দিষ্ট সময় পরপর খিদে অনুভব করে।

নির্দিষ্ট সময় বহুবার পেরিয়ে গেছে, পেটভরা খাবার জোটেনি। এখন তার একটাই অনুভূতি। ক্ষুধা। বড় ক্ষুধা।

শরীরের ভেতর বিপুল পানি গ্রহণ করল সে, বের করে দিল ফানেল দিয়ে, উঠতে শুরু করল আলোর উৎস লক্ষ্য করে। শুরু হলো শিকার অভিযান।

'দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব শীত করছে, টেডি,' বলল জোনা।

মাথা ঝাঁকাল ওয়াটারম্যান। 'এতক্ষণে বুঝলে,' বলল সে। ভাঁজ করা বাহু দুটো বুকে, হাত দুটো বগলের তলায়, তারপরও কাঁপুনি থামাতে পারছে না সে। 'তোমার শীত করছে না···কি কারণ?'

'সুতী, সিল্ক আর উল, তিন প্রস্থ কাপড় পরে আছি, তাই।' জর্জের দিকে তাকাল জোনা। 'কফি কোথায় বলো তো?'

হাত তুলে দেখিয়ে দিল জর্জ। 'ওদিকে, বাক্সের ভেতর।'

হাত বাড়াল জোনা, প্লাস্টিকের একটা বাক্স খুলে থারমাল বোতলটা বের করল। কাপে ঢেলে বাড়িয়ে দিল ওয়াটারম্যানের দিকে।

খুবই কড়া কফি, তেতোও, তবে পেটে যাবার পর গরম হয়ে উঠল

শরীর। 'ধন্যবাদ,' বলল ওয়াটারম্যান।

হাতঘড়ি দেখল সে। প্রায় তিন ঘণ্টা হলো সাগরের তলায় রয়েছে ওরা। সাগরের তলা মানে সারফেস থেকে আড়াই হাজার ফুট নিচে, তলা থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট ওপরে। স্থির হয়ে নেই, ভেসে যাচ্ছে। এই তিন ঘণ্টা ছোটখাট অদ্ভুত সব প্রাণী ছাড়া কিছুই ওদের চোখে পড়েনি। আলোই ওগুলোকে টেনে এনেছে, ক্যাপসুলের চারধারে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে আবার চলে গেছে গভীর অন্ধকারে।

'আমি যদি সাগরের তলায় ক্যাপসুলটা নামাই, কি হবে?' জিজ্ঞেস করল জর্জ। 'মি. রানা?'

'ইচ্ছে হলে নামাতে পারেন,' স্পীকার থেকে ভেসে এল রানার গলা। 'হয়তো এক আধটা হাঙর দেখতে পাবেন।'

কন্ট্রোল স্টিকটা সামনে ঠেলল জর্জ, নিচে নামতে শুরু করল ক্যাপসুল।

সাগরের তলা ঠিক যেন চাঁদের পিঠ—শূন্য, কাদাময়, ঢেউ খেলানো। সাবমারসিবল থেকে সামনে ছুটছে একটা প্রেশার ওয়েভ, উঁচু হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে কাদা।

হঠাৎ জর্জের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'গড!'

'কি?' জানতে চাইল ওয়াটারম্যান। 'কি দেখলেন?'

ইঙ্গিতে ওয়াটারম্যানের পোর্টহোলটা দেখাল জর্জ। চোখের চারপাশ হাত দিয়ে আড়াল করে কাঁচে মুখ চেপে ধরল ওয়াটারম্যান।

সাপ, প্রথমে ভাবল সে। লাখ লাখ সাপ। একটা লাশকে ঘিরে কিলবিল করছে সবগুলো।

কিন্তু তারপর মনে হলো, না, ওগুলো সাপ হতে পারে না—ঈল। উঁহুঁ, তা-ও নয়, ঈলও নয়— এগুলোর ফিন রয়েছে। মাছ আসলে, অদ্ভুত জাতের মাছ, ঘনঘন পাক খাচ্ছে, খাবলা মেরে তুলে নিচ্ছে

মাংস। মাংসের কণা আলগা হয়ে ভেসে যাচ্ছে এদিক ওদিক, সেগুলো গপগপ করে মুখে পুরছে ছোট জাতের মাছগুলো।

সাপের মত একটা প্রাণী খাদ্যবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করল নিজেকে, পিছিয়ে এল, আলো তাকে দিশেহারা করে তুলেছে বা রাগিয়ে দিয়েছে, হামলা করে বসল সাবমারসিবলকে। ওয়াটারম্যানের পোর্টহোলে মুখ দিয়ে আঘাত করল ওটা, যেন মনে হলো গোটা ক্যাপসুলটাকে মুখের ভেতর ভরে পেটে চালান করে দিতে চাইছে। পুরো মুখই তার হয়ে উঠল বিশাল একটা হাঁ, চারদিকের কিনারায় ধারাল দাঁত আর মাঝখানে লকলকে জিভ। গোটা শরীর অনবরত মোচড় খাচ্ছে, যেন প্রচণ্ড শক্তিতে মুখটা ঢুকে পড়তে চাইছে সাবমারসিবলের ভেতর।

ওটা একটা হ্যাগফিশ, বুঝতে পারল ওয়াটারম্যান। সামুদ্রিক প্রাণীদের দুঃস্বপ্ন বলা হয় ওগুলোকে। বড় আকৃতির মাছ বা প্রাণীদের শরীরে মুখ দিয়ে গর্ত তৈরি করে, বের করে আনে প্রাণবায়ু।

জট পাকানো হ্যাগফিশের দিকে সাবমারসিবল নিয়ে এগোল জর্জ, ওগুলোর মাঝখানে তাক করল বো। সবগুলো সরে গেল লাশ ফেলে। এতক্ষণে ওয়াটারম্যান দেখতে পেল কি খাচ্ছিল ওগুলো।

'স্পার্ম হোয়েল!' বিস্মিত হয়ে বলল সে। 'একটা স্পার্ম হোয়েলের নিচের চোয়াল। মি. রানা, দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি,' স্পীকারে রানার গলা শোনা গেল।

'হ্যাগফিশ একটা স্পার্ম হোয়েলকে মেরে ফেলেছে, এ অসম্ভব। তাহলে?'

রানা জবাব দিল না। নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে উঠছে, হঠাৎ ওয়াটারম্যান ভাবল, আমি জানি।

ঘামতে শুরু করল সে। চোখ কুঁচকে আলোর সীমানার ওদিকে কি আছে দেখার চেষ্টা করল। ঝাঁক ঝাঁক মাছ আলোর ভেতর ঢুকছে,

আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে গেলে ওগুলো যে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তা নয়, ঝাপসা লাগছে দেখতে; তারপর আবার ফিরে আসছে আলোর ভেতর। মাছগুলোর আচরণ দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করল ওয়াটারম্যান। ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক একবার বলেছিলেন, কোথাও মাছ থাকলে ধরে নিতে হবে সেখানে হাঙর নেই। হাঙর আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইমপাল্স-এর কারণে মানুষের চেয়ে অনেক আগে টের পেয়ে যায় মাছেরা। ওগুলো পালিয়ে যাচ্ছে দেখলে সতর্ক হওয়া দরকার।

তবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ওয়াটারম্যান, স্কুইড হাঙর নয়। পোর্টহোলের দিকে ক্যামেরা তুলল সে।

জলদানবের চোখে আলো আরও বেশি করে ধরা পড়ছে। ওটার অন্যান্য অনুভূতি রেকর্ড করছে পানির কম্পন, আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে কম্পন। কিছু একটা রয়েছে ওপরে, খুব বেশি দূরে নয়। নড়াচড়া করছে জিনিসটা।

ওটার অলফ্যাক্টারি প্রাণের কোন সংকেত পায়নি, অনুভূতি বলতে পারছে না ওখানে কোন শিকার আছে কিনা। প্রচণ্ড ক্ষুধায় অস্থির ওটা, তা না হলে হয়তো আরও সতর্ক হত, সম্ভবত ফিরে যেত অন্ধকারে, অপেক্ষা করত। কিন্তু শরীরের চাহিদা ব্রেনকে বেপরোয়া হবার প্ররোচনা দিচ্ছে, কাজেই আলোর উৎস লক্ষ করে চলা বন্ধ করল না ওটা।

আলোর উৎস এবার দেখতে পেল জলদানব। কম্পনটা যে ওখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে, অনুভব করতে পারল। কম্পন, স্পন্দন বা নড়াচড়া মানেই হলো জীবন। জলদানব ধরে নিল, জিনিসটা জীবিত।

শুরু হলো হামলা।

'জন্তুটা এখানে নেই,' বলল জর্জ। 'ওপরে উঠছি আমরা।' কন্ট্রোল স্টিক নিজের দিকে টেনে আনল সে।

জর্জের সামনে, কনসোল-এর দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান। ডিজিটাল ডেপথ রিডআউট মিটারে ফুটে উঠেছে। সংখ্যাগুলো ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে দেখে অস্থির লাগল তার। নয়শো সত্তর থেকে নয়শো ঊনসত্তর, তারপর নয়শো আটষট্টি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পায়ের গোড়ালি ডলতে শুরু করল, ভাবল ফ্রস্টবাইটের শিকার হয়েছে কিনা।

আচমকা একটা ঝাঁকি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে গেল ক্যাপসুল। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ছিল ওয়াটারম্যান, ছিটকে পড়ল সে, খপ করে ধরে ফেলল একটা হ্যাণ্ডেল। আবার সিধে হলো ক্যাপসুল, উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে।

'কি ঘটল?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ওয়াটারম্যান।

কোন জবাব দিল না জর্জ। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে, কাঁধ দুটো আড়ষ্ট।

বাল্কহেডের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে জোনার পিঠ, হাতের তালু ভেজে। 'কি ব্যাপার, জর্জ?' সে-ও জিজ্ঞেস করল।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাইনি,' বলল জর্জ। 'মনে হলো একটা এয়ার পকেটে ধাক্কা খেয়েছি আমরা, কিংবা মাথার ওপর দিয়ে একটা জাহাজ চলে গেছে।'

'তারমানে কি একটা স্রোত?'

স্পীকার থেকে ভেসে এল রানার গলা, 'প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে কোন স্রোত নেই।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'অন্য কিছু আছে।'

রানার কথা শেষ হতেই ওয়াটারম্যান অনুভব করল, তার পেটের ভেতর পাথর ভরা একটা থলে ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। ওহ্ গড, ভাবল

সে। বিপদ তাহলে ঠিকই এল।

ডেকে পড়ে হড়কে গিয়েছিল ক্যামেরাটা, হাত বাড়িয়ে তুলল সেটা। সেটিংগুলো চেক করে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করতে যাবে, লক্ষ করল আঙুলগুলো অসম্ভব কাঁপছে। নাক থেকে এক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল লেন্সের ওপর। শার্টের প্রান্ত দিয়ে লেন্সটা পরিষ্কার করল সে।

জোনার দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান। তার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে, ক্যামেরার লেন্সটা চেপে ধরেছে পোর্টহোলে। রিলিজ বাটন চাপ দিল মেয়েটা, দু'সেকেণ্ডের মধ্যে এক ডজন ছবি ফ্রেম-বন্দী করল। 'তুমিও কিছু ছবি তোলো, টেডি,' কাঁধের ওপর দিয়ে ওয়াটারম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

'কিসের?' জানতে চাইল ওয়াটারম্যান। 'কিছু দেখতে পেলে তো।'

'তোমার চোখের চেয়ে লেন্স চওড়া। ওটা হয়তো কিছু দেখতে পাবে।'

ওয়াটারম্যান কিছু বলার আগে আবার একটা ঝাঁকি খেলো ক্যাপসুল, ছিটকে পড়ল বাম দিকে। আলোর ভেতর দিয়ে দ্রুত পাশ কাটাল একটা ছায়া, ম্লান করে দিল ক্যাপসুলের বাইরের উজ্জ্বলতা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'গড অলমাইটি!' চিৎকার করল জর্জ, স্টিকের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সিধে করে নিল ক্যাপসুল।

পোর্টহোলে ক্যামেরা ঠেকিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল ওয়াটারম্যান। পর পর দু'বার।

আবার ওপরে উঠছে ক্যাপসুল। রিডআউটের দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান—৯৬০ মিটার, ৯৫৯, ৯৫৮···

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তীর বেগে ছুটছে অতিকায় স্কুইড,

হতাশাজনিত আক্রোশে অস্থির। ওটার চাবুকগুলো সবেগে আছড়ে পড়ল, খাড়া হয়ে আছে হুকগুলো, তারপর কুঁকড়ে-মুচড়ে ফিরে এল শরীরের কাছে, পরমুহূর্তে আবার লম্বা হয়ে আছড়ে পড়ল পানিতে, যেন সাগরকেই ক্ষতবিক্ষত করতে চাইছে। ধূসর থেকে খয়েরি হলো গায়ের রঙ, তারপর তামাটে থেকে লাল, লাল থেকে বেগুনি, সবশেষে ফিরে পেল সাদাটে ছাই রঙ।

আলোকিত জিনিসটার ওপর দিয়ে একবার ভেসে গেছে জলদানব, বোঝার চেষ্টা করেছে কি ওটা। পরের বার চেষ্টা করেছে হত্যা করার, যদিও জিনিসটা থেকে বেরিয়ে আসা প্রাণের স্পন্দন ছিল অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত।

জিনিসটা শক্ত, কোনভাবে ভেদ করা সম্ভব নয়। অচেনা শব্দ আর গতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে জলদানব। কিন্তু হামলা করে কোন লাভ হয়নি, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসেনি রক্ত, ছেঁড়েনি মাংস, ফলে হতাশ হয়ে সরে আসতে হয়েছে অন্য কোন শিকারের সন্ধানে।

কিন্তু ওটার সেল প্রত্যাখ্যানে অভ্যস্ত নয়, খোরাক পাবার আশায় হজমী রস হড়হড় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে প্রচণ্ড খিদে অস্থির করে তুলেছে ওটাকে, দিশেহারা বোধ করছে, খেপে আছে প্রচণ্ড রাগে।

খাবারের খোঁজে পানির ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে জলদানব, একটু তির্যক গতিপথ ধরে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। আলোর উৎসটার অনেক পিছনে এখন সে, ধাওয়া করছে না, তবে অনুসরণ করছে।

'একটা অভিজ্ঞতা হলো বটে,' বলল জোনা, খোলা হ্যাচ দিয়ে উঠে রিম-এ বসল। রানা ও ক্যাপটেন বারবির দিকে তাকিয়ে হাসল নিঃশব্দে। নিচে, জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন।

হ্যাচে উঠে তার পাশে বসল ওয়াটারম্যান। বড় করে শ্বাস টানল সে, তাজা বাতাস উপভোগ করল। নিরাপত্তার আরামদায়ক অনুভূতিটাও উপভোগ করছে।

'আপনারা ওটাকে দেখতে পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন বারবি।

'এক মিলিয়ন অদ্ভুত প্রাণী দেখেছি আমরা,' বলল জোনা। 'এ-ধরনের প্রাণী দুনিয়ায় আছে, জানা ছিল না, ফটো তোলা তো দূরের কথা।'

'না, আমি জানতে চাইছি নিচে আপনাদের গুঁতো মারল যেটা। কে ধাক্কা মারল সাবমারসিবলে?'

'বলতে পারব না। আমি আসলে দেখতে পাইনি।' ওয়াটারম্যানের দিকে ফিরল জোনা। 'তুমি?'

'না,' বলল ওয়াটারম্যান, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'আপনি ভিডিওতে কিছু পেয়েছেন?'

'শুধু একটা ছায়া,' বলল রানা, সাবমারসিবলটাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল, পরীক্ষা করছে ওটাকে। দু'এক জায়গার রঙ ছুঁয়ে দেখল।

ক্যাপসুল থেকে সবার আগে বেরিয়েছে জর্জ, দু'জন ক্রুর সাহায্যে ওঠাকে ক্রেডলের সঙ্গে বাঁধছে সে, বলল, 'জিনিসটা যা-ই হোক, সাবের সঙ্গে লাগতে চায়নি। একটু ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে নিজের পথে।'

'হতে পারে,' বলল রানা। ঘোরা বন্ধ করে ক্যাপসুলের গায়ে কি যেন স্পর্শ করল ও।

ঝুঁকে তাকাল ওয়াটারম্যান, দেখল ক্যাপসুলের গায়ে পাঁচটা আঁচড়ের দাগ, দাগগুলোর ওপর আঙুল বুলাচ্ছে রানা। ওগুলো দুই কি তিন ফুট লম্বা। কিছু একটা রঙ আঁচড়ে নিয়েছে, ফলে বেরিয়ে পড়েছে

ভেতরের মেটাল। 'স্কুইডটার কাণ্ড, তাই না, মি. রানা?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

'তা যদি হয়ও,' বলল জর্জ, 'ক্যাপসুলটা সম্ভবত ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওটাকে।'

'পরের বার ওটার অপেক্ষায় তৈরি হয়ে থাকব আমরা,' বলল জোনা। 'যাই, ভিডিও ক্যামেরা রিঅ্যাডজাস্ট করে রাখি।' হ্যাচ থেকে পা তুলল সে, ক্যাপসুল থেকে হড়কে নেমে পড়ল, তারপর জর্জকে বলল, 'তোমার টার্নঅ্যারাউণ্ড টাইম বলো।'

'চার ঘণ্টা,' জবাব দিল জর্জ, হাতঘড়ির ওপর চোখ। 'আবার আমরা রওনা হতে পারব সাড়ে তিনটে বা চারটের দিকে।'

আমি নই, ভাবল ওয়াটারম্যান। একদিনের জন্যে যথেষ্ট উত্তেজনা পাওয়া হয়েছে। 'আমি জাহাজে থাকব,' বলল সে। 'নেভিকে খুশি করার জন্যে টিভির পর্দায় তাকিয়ে থাকলেই হবে।'

'আপনি যেতে চাইলেও আপনাকে যেতে দেয়া হবে না, নেভি ম্যান,' ক্যাপটেন বারবি বললেন। 'মি. রানা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে যেন বাদ দেয়া হয়।'

অবাক হয়ে রানার দিকে ফিরল ওয়াটারম্যান। 'মি. রানা?' কিন্তু তার দিকে খেয়াল নেই রানার, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। আবার ক্যাপটেনের দিকে ফিরল সে। 'মানে?'

'আমার মালিক, মি: ফিলিপ মরগান, আমাকে বলে দিয়েছেন, মি. রানার প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে—অভিযানের কোন ক্ষতি না করে। কাজেই তাঁর নির্দেশ পরের বার আপনাকে আমি ক্যাপসুলে থাকতে দেব না।'

'বুঝলাম। কিন্তু কারণটা কি?'

'কারণটা হলো, মি. রানার ধারণা, এরইমধ্যে স্কুইডটা

আপনাদেরকে ধাক্কা দিয়েছে। তাঁর আরও ধারণা, পানির নিচে আমাদের সাবমারসিবল নিরাপদ নয়, যদিও আমরা তাঁর সঙ্গে একমত নই।'

পাঁচ

বিশটা ডলার দিয়ে প্রৌঢ় লোকটাকে বিদায় করলেন ড. আলফ্রেড ফেরেল, তারপর লাউঞ্জ থেকে উঠে এলেন নিজেদের স্যুইটে। সিটিংরুম পেরিয়ে ঢুকে পড়লেন জেরি হ্যাসটনের বেডরুমে। 'মি. হ্যাসটন, অনেক বেলা হয়েছে, উঠে পড়ুন,' বললেন তিনি। কামরার ভেতর গুমোট একটা ভাব, তার সঙ্গে ব্র্যাণ্ডির গন্ধ। এগিয়ে গিয়ে একটা জানালা খুললেন তিনি।

চোখে আলো লাগায় গুঙিয়ে উঠলেন হ্যাসটন। 'ক'টা বাজে বলুন তো?' জানতে চাইলেন তিনি।

'প্রায় দুপুর। টেরেসে আছি আমি, চলে আসুন।'

দাঁত মেজে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন হ্যাসটন, টেরেসে দাঁড়িয়ে ক্যাসল হারবার-এর দিকে তাকিয়ে আছেন ড. ফেরেল। এক মাইল দূরে এয়ারপোর্ট, একটা সেভেন-ফোর-সেভেন ল্যাণ্ড করছে। এঞ্জিন রিভার্স করল পাইলট, গর্জনটা হঠাৎ এত বেড়ে গেল যে ড. ফেরেলের পিরিচে চামচটা কাঁপতে লাগল। রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে তিনি ভাবলেন, এত বিপুল টাকা খরচ করে এত সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানায় মানুষ, সারা দিনে বিশবার এই গর্জন শোনার জন্যে?

অথচ প্রতিটি বাড়ির সামনে লেখা আছে—প্রাইভেট।

কিচেন থেকে টেরেসে বেরিয়ে এলেন হ্যাসটন, পরনে বাথরোব, হাতে কফির কাপ। 'কি খবর বলুন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আর্থার···সেই জেলেটা, এসেছিল,' বললেন ড. ফেরেল। 'যাকে আমরা ইনফর্মার হিসেবে কাজে লাগাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকালেন হ্যাসটন। 'বোটটা দেবেন ন্যাট বেল? আর্থার তাঁর বউকে রাজি করাতে পেরেছে?'

'না,' বললেন ড. ফেরেল। 'মিসেস বেল বলে দিয়েছেন, বোটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক, মি. মাসুদ রানা। তিনি নাকি ওঁদের পারিবারিক বন্ধু।'

'তাহলে লোকটা এসেছিল কেন?' বিরক্ত হলেন হ্যাসটন।

'এসেছিল অন্য একটা কারণে,' বললেন ড. ফেরেল। 'আধঘণ্টা আগে মজার একটা রেডিও মেসেজ শুনেছে সে। কথা হচ্ছিল রিসার্চ ভেসেল আর নেভি বেস-এর সঙ্গে। রিপোর্ট করছিল একজন লেফটেন্যান্ট, ওয়াটারম্যান।'

'তো?' শুধু বিরক্ত না, অস্থির আর অসুস্থ বোধ করছেন হ্যাসটন। কাল সারারাত ব্র্যাণ্ডি খেয়ে শরীরটা তাঁর আরও খারাপ হয়ে গেছে। 'যা বলার সংক্ষেপে বলুন, ড. ফেরেল।'

'জাহাজটার নাম মরগান এক্সপ্লোরার। ওটায় একটা সাবমারসিবল আছে। স্কুইডটাকে খুঁজতে এসেছে ওরা। আমার ধারণা ওটাকে ওরা পেয়েছে, যদিও নিশ্চিতভাবে জানে না।'

'মরগান?' বললেন হ্যাসটন। 'ফিলিপ মরগান?'

'কি জানি, বোধহয়। কিন্তু কথা হলো, মি. হ্যাসটন, আমার ধারণা স্কুইডটা এখনও এখানে আছে, আগের মতই ক্ষুধার্ত। আরও জরুরী কথা হলো, বারমুডায় এখন এমন একটা জাহাজ রয়েছে, যে জাহাজের

ইকুইপমেন্ট স্কুইডটার কাছে লোকজনকে নিয়ে যেতে পারে। ওই সাবে চড়তে পারলে আমরা ওটাকে দেখতে পাব, ওটার ছবি তুলতে পারব, ওটাকে স্টাডি করতে পারব, ওটার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারব। সবশেষে আপনি ওটাকে মারতেও পারবেন, যদি…,' চুপ করে গেলেন ড. ফেরেল।

'যদি কি?' ভুরু কুঁচকে তাকালেন হ্যাসটন।

'যদি ওটায় চড়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনার ক্ষমতা আছে, মি. হ্যাসটন। সেটা ব্যবহারের এখনই সময়।'

হ্যাসটন ইতস্তত করছেন। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন তিনি, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ব্রেডরুমে ঢুকলেন। টেরেস থেকে শোনা গেল ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করছেন।

টেরেসের কিনারায় এসে নিচের দিকে ঝুঁকলেন ড. ফেরেল, তাকালেন গোলাকার সুইমিং পুলটার দিকে। পুলের পাশে একটা স্কুবা ট্যাংক পড়ে রয়েছে, ব্যাকপ্যাক ও রেগুলেটর সহ। আজ কয়েক দিন ধরেই ওটাকে ওখানে দেখছেন তিনি, গায়ে পাইনের কাঁটা জমেছে। তিনি ভাবলেন, হ্যাসটনের ছেলেমেয়েরা ওটা ব্যবহার করেনি তো? কে জানে, হ্যাসটন হয়তো ওটাকে ওখানে পড়ে থাকতে দিয়েছেন বেদনার স্মৃতি হিসেবে।

হ্যাসটন যে অস্থির হয়ে উঠেছেন, তিনি তা জানেন। তিনি নিজেও শান্ত থাকতে পারছেন না। সময় বয়ে যাচ্ছে, একটা কিছু করা দরকার, অথচ কি করবেন বুঝতে পারছেন না। শুনতে পেলেন ফোনে কথা বলছেন হ্যাসটন। ভাবলেন, দেখা যাক এবার কিছু ঘটে কিনা।

খানিক পর টেরেসে ফিরে এলেন হ্যাসটন। 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' বললেন তিনি। 'স্বয়ং ফিলিপ মরগানের সঙ্গে কথা বললাম। জাহাজটা এখানে পাঠানো হয়েছে তাঁর একটা ম্যাগাজিনের কাজে। কথা

দিয়েছেন, তাঁর লোকদের বলে কাল আমাদেরকে জাহাজে ওঠার সুযোগ করে দেবেন।'

'কাল?' বেজার হলেন ড. ফেরেল। 'আজ নয় কেন? আর্থার বলল, আজ বিকেলেও আবার একবার পানির তলায় নামবে ওরা।'

'সাবে জায়গা নেই,' বললেন হ্যাসটন। 'বারমুডা সরকার আজ বিকেলে একজন প্রতিনিধিকে পাঠাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, স্কুইডটাকে মারার একটা প্ল্যান আছে তাদের।'

'মারার প্ল্যান আছে? কিভাবে মারবে, শুনি!' হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলেন ড. ফেরেল।

'তা কি করে বলব,' ক্ষীণ হাসলেন হ্যাসটন। 'তবে এ নিয়ে আপনার উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই।'

'উদ্বিগ্ন হব না? আপনার জানা আছে আমি ওটাকে পরীক্ষা করতে চাই...!'

'আছে। আমি বলতে চাইছি, যে-ই ওটাকে মারার চেষ্টা করুক, সফল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে বারমুডা সরকার যাকে পাঠাচ্ছে তাঁর পক্ষে তো কোনদিনই...।'

'বারমুডা সরকার কাকে পাঠাচ্ছে?'

'পাঠাচ্ছে চীফ স্কুইড হান্টার, আপনার বিদ্বান বন্ধু, ডক্টর কাইল ফ্যাদমকে।'

অবজারভেশন ডেকে দাঁড়িয়ে রানা, পাশে ওয়াটারম্যান; অ্যাকুয়েরিয়াম বোট থেকে তাঁর জিনিস-পত্র নামাচ্ছেন ড. ফ্যাদম, দেখছে ওরা। জিনিসপত্র বলতে অ্যালুমিনিয়ামের চারটে কেস, দু'বাক্স তাজা মাছ, একটা উন্নতমানের ফিশ ট্র্যাপ—প্রায় তিন বর্গ ফুট, সরু তার আর রিএনফোর্সিং স্টীল রড দিয়ে তৈরি।

জর্জ আর জোনার সঙ্গে আলোচনা করলেন ড. ফ্যাদম। এরপর দু'জন ক্রুকে ডাকল জর্জ। কেসগুলো সাবমারসিবলে তুলল তারা, সবশেষে তারের জালটা সাবমারসিবলের মাথায় বাঁধল, হ্যাচের সামনে।

মই বেয়ে অবজারভেশন ডেকে উঠে এল জোনা। 'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং,' বলল সে। 'ক্যাপটেন বারবিকে নরম করা প্রায় অসাধ্য একটা কাজ, অথচ তাঁকে প্রায় নিজের শিষ্য বানিয়ে ফেলেছেন উনি।' হাত তুলে আফটার ডেকের দিকটা দেখাল সে। ওরা দেখল, ড. ফ্যাদমকে অনুসরণ করছেন ক্যাপটেন বারবি, সবিনয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করছেন।

জোনার দিকে তাকাল রানা। 'অনেকক্ষণ বোঝাতে চেষ্টা করলাম আপনাদের ক্যাপটেনকে, কিন্তু তিনি ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছেন না। এভাবে কয়েকজন লোককে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া একদম উচিত হচ্ছে না তাঁর। আমি বুঝতে পারছি না, আপনারাই বা জেনেশুনে কেন এই বোকামি করতে যাচ্ছেন!'

জোনা বলল, 'আমাদের ঝুঁকি নেয়াটাকে আপনি বোকামি বলছেন, এই তো? কিন্তু ভেবে দেখুন, ঝুঁকির তুলনায় লাভ কতটুকু। এত বড় স্কুইডের ছবি কেউ কোন দিন তুলতে পারেনি, সারা দুনিয়ায় রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে যাবে। এই সুযোগ কেউ কখনও ছাড়ে? তাছাড়া, বিপদটা কতটুকু ভয়ঙ্কর? ধাক্কাটা যদি স্কুইডই দিয়ে থাকে, আমাদের কোন ক্ষতি হয়েছে কি? আমার তো মনে হয় ওটাকে আমরা এবার ধরেও ফেলতে পারি, ড. ফ্যাদমের সাহায্যে...।'

রানা আর কিছু বলল না। ওয়াটারম্যান জোনার দিকে ঝুঁকে জানতে চাইল, 'ড. ফেরেলের ওপর তুমি ভরসা করছ?'

'ভদ্রলোক প্রচুর টোপ নিয়ে এসেছেন,' বলল জোনা। 'একশো পাউণ্ড টুনা গভীর পানির যে-কোন প্রাণীকে আকৃষ্ট করবে। স্কুইড যখন

ভুরিভোজনে ব্যস্ত থাকবে, আমরা তখন নিজেদের কাজ সেরে নেব।'

'ড. ফেরেল ওটাকে কিভাবে মারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভদ্রলোকের কাছে দুটো অস্ত্র আছে,' বলল জোনা, ইঙ্গিতে সাবমারসিবলের মেকানিক্যাল বাহুগুলো দেখাল। 'দুটো অস্ত্রই সাবের বাহুর সঙ্গে আটকানো—ওগুলো তিনি সাবের ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। একটা অস্ত্র হলো স্পিয়ার গান, সঙ্গে সিরিঞ্জ ভর্তি স্ট্রিকনীন, ডজনখানেক হাতি মারার জন্যে যথেষ্ট। দ্বিতীয় অস্ত্রটা ডাইভারের ব্যাঙ-স্টিক-এর মত—ওটা থেকে টুয়েলভ-গজ শটগান শেল ছোঁড়া যায়, প্রতিটির ভেতর পারদ আছে, বিষাক্ত শ্র্যাপনেলের মত ছড়িয়ে পড়বে। জায়্যান্ট স্কুইড সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নেই আমার, তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের কাছে যে ফায়ার পাওয়ার রয়েছে তা দিয়ে ওটাকে তিনি তিন-চারবার মারতে পারবেন।'

রানা বুঝতে পারছে, ওদেরকে ঠেকানো ওর কাজ নয়। ওয়াটারম্যানের যাওয়া বন্ধ করা গেছে, এতেই খুশি থাকা উচিত ওর। ওরা যখন যাবেই, ওদেরকে ভয় দেখানোও ঠিক নয়। তবু নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার একটা গরজ অনুভব করল ও। বলল, 'সবাই একটা জিনিস একেবারেই বুঝতে চাইছে না। সেটা হলো, এই দানবটার কোন বোধ-বুদ্ধি নেই। ওটা আমাদের নিয়মে খেলে না। ওটা তার নিজের নিয়মে খেলে।'

'ড. ফেরেল সে কথা মনে রেখেই প্ল্যানটা তৈরি করেছেন,' বলল জোনা।

'কি রকম?'

'অস্ত্রগুলো যদি কোন কাজ না করে, তাঁর ধারণা স্কুইডটা নিজ স্বভাব-দোষে ক্যাপসুলটাকে পেঁচিয়ে ধরবে, তখন ওটাকে কেবলে জড়িয়ে সারফেসে তুলে আনা সম্ভব হবে।'

'মাই গড!' বলল রানা। 'এ তো বাঘের মুখের ভেতর হাত ভরে চিৎকার করা, ধরেছি! আপনি বুঝতে পারছেন না, কি ধরনের প্রাণী এটা?'

'যে-ধরনেরই হোক, সাবমারসিবলকে ভেঙে ফেলতে পারবে না,' বলল জোনা। 'আমার ধারণা, আইডিয়াটা মন্দ নয়।'

কথা না বলে ডেক ছেড়ে চলে গেল রানা।

'থাক না হয়, যেয়ো না নিচে,' রানা চলে যেতে জোনাকে বলল ওয়াটারম্যান। 'ড. ফ্যাদম একা যা করার করুন। একান্তই যদি যেতে চাও, পরের বার যেয়ো।'

'আমার জন্যে তোমার উদ্বেগ, ভালই লাগছে, টেডি,' ধীরে ধীরে বলল জোনা, হাত বাড়িয়ে তার চিবুক স্পর্শ করল সে। 'কিন্তু আমি যেতে চাই। সেজন্যেই তো আমার এখানে আসা।'

ব্রিজে ঢুকল রানা, ক্যাপটেন বারবির অনুমতি নিয়ে রেডিওতে যোগাযোগ করল সী কুইনের সঙ্গে। ইতিমধ্যে সেটা এক মাইল উত্তরে ভেসে গেছে।

বেল সাড়া দিল কয়েক মিনিট পর। রানা ভাবল, ও বোধহয় স্টার্নে ছিল, ঘুমে ঢুলছিল, নয়তো মেরামত করছিল পাম্পটা। 'স্রেফ চেক করছি, বেল,' বলল ও। 'তুমি জেগে আছ তো?'

'কোন রকমে। নিচে একটা লাইন ফেললে কোন অসুবিধে আছে, রানা? চেষ্টা করে দেখতাম দু'একটা মাছ পাই কিনা।'

'ঠিক আছে। তবে বোটটা নিয়ে প্রথমে এদিকে চলে এসো। দু'শো গজের মধ্যে এসে এঞ্জিন বন্ধ করো, তারপর ভেসে আসতে দাও। তাহলে সাবটাকে অনুসরণ করার জন্যে পজিশনে চলে আসবে তুমি।'

'বেশ। তোমরা ওটাকে নামাচ্ছ কখন? ভাল কথা, টেডি এবার

যাচ্ছে না তো?’

‘ঘন্টাখানেক পর। না, টেডি যাচ্ছে না। শোনো, বেল, সাবটা নামার পর তুমি কিন্তু ঘুমাবে না। আমি চাই সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে তুমি, প্রয়োজন হলে যাতে ফুলস্পীডে দূরে সরে যেতে পারো।’

‘ঠিক আছে, রানা,’ বলল বেল। ‘সী কুইন স্ট্যাণ্ডিং বাই।’

জাহাজটা থেকে বোটের দূরত্ব আন্দাজ করল বেল, দেড়শো গজ তো হবেই, দু’শো গজও হতে পারে। ঠিক রানা যেমন বলেছে। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে।

হুইলের সামনের শেলফ থেকে বিনকিউলারটা তুলে নিল, ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল সাবমারসিবলের ওপর। হ্যাচটা খোলা, লোকজন এখনও সাবের মেকানিকাল বাহুগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। তারমানে প্রচুর সময় পাবে সে।

বোটের পিছন দিকে চলে এল সে, যেখানে ম্যাকরল্‌গুলো রোদে ফেলে নরম হতে দিয়েছিল। একটা লাইনে দুটো হুক বাঁধল, টোপ হিসেবে ম্যাকরল্‌ গাঁথল হুকে, তারপর লাইনের শেষ মাথায় দুই পাউণ্ড ওয়েট আটকে ফেলে দিল পানিতে। আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে লাইন। যখন মনে হলো দেড়শো ফুট নেমে গেছে হুকগুলো, লাইন আটকে হেলান দিল বুলওয়ার্কে। লাইনটা এখনও ধরে আছে, ঝাঁকি দিচ্ছে মাঝে মধ্যে, মাছদের আকৃষ্ট করার জন্যে।

পায়ের কাছাকাছি বালতিটার দিকে তাকাল বেল। ওটার ভেতরই ছিল ম্যাকরল্‌গুলো। বালতির অর্ধেক পানিতে ভর্তি, পানিটুকু লালচে হয়ে আছে রক্তে আর মাংসের কণায়, ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু আঁশ। বালতিটা তুলে পানিটা বোটের বাইরে ফেলে দিল সে, দেখল সামান্য পিচ্ছিল রক্ত আর তেল ছড়িয়ে পড়ল পানিতে।

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, টোপে ঠোকর দিল না কোন মাছ। বেলের মনে হলো, এদিকে যদি মাছ থাকেও, হয় তার টোপের অনেক নিচে নয়তো অনেক ওপরে আছে। ফিশ-ফাইণ্ডারটা এখনও অন করা রয়েছে, ওটা থেকে কোন সুবিধে পাওয়া যায় কিনা দেখা যেতে পারে। লাইনটা গোঁজে আটকাল সে, ফিরে এল হুইলহাউসে।

স্ক্রীনে কি এক বিশৃঙ্খল অবস্থা, এর আগে বেল কখনও এ-ধরনের নকশা দেখেনি। তার নিচে তিন হাজার ফুট গভীর পানি, এটা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে ধরে নিত মাটির ওপর রয়েছে বোট। দেখে মনে হলো ফিশ-ফাইণ্ডার থেকে যে-সব ইমপালস্ বেরুচ্ছে সেগুলোর কয়েকটা বোটের ঠিক নিচে কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, বাকিগুলো ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে বটে, তবে গভীরে নেমে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে। নকশাটা তাই ঝাপসা, কাঁপা কাঁপা আর অস্পষ্ট।

হতে পারে থ্রু-হাল ফিটিঙে কিছু একটা জড়িয়েছে, মেশিনের ট্রান্সপণ্ডারটা তো ওটাতেই আটকানো। তীরে পৌঁছে একটা স্কুবা ট্যাঙ্ক পরবে বেল, বোটের তলায় গিয়ে কি জড়িয়েছে দেখে আসবে। কিংবা কে জানে, মেশিনটাই হয়তো ভেঙে গেছে। আজকাল তো সব জিনিসই চিপস্ আর সার্কিট বোর্ড দিয়ে তৈরি, ওসব শুধুমাত্র জাপানীরা মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে পায়—এক টুকরো ইলেকট্রনিকের দিকে তাকিয়ে সাধারণ মানুষ খুঁজে বের করতে পারবে না কোথায় তার ত্রুটি।

বেল সিদ্ধান্ত নিল, তার মাছ ধরা হয়ে গেলে, সাবটা পানিতে নামার পর, মেশিনটা খুলে দেখবে সে, দেখবে ত্রুটিটা সামান্য কিছু কিনা। হয়তো কিছু না, একটা তার ছুটে গেছে।

স্টার্নে ফিরে এল বেল, গোঁজ থেকে লাইনটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটেছে। খুব বেশি হালকা লাগছে লাইন।

কোন সন্দেহ নেই, ওয়েটটা গেছে, সম্ভবত হুক আর টোপগুলোও নেই।

গাল দিল বেল, লাইন টেনে তুলতে শুরু করল।

ফানেল থেকে বিপুল পানি ছেড়ে সাগরের নীল তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে জলদানব। খাবারের অস্পষ্ট একটা গন্ধ পেয়েছিল, একবার হারিয়ে ফেলে খুঁজে পায়, শেষে আবার হারিয়ে ফেলেছে।

সারফেসের এত কাছাকাছি আরাম পাচ্ছে না সে, গরম পানিতে থাকা তার অভ্যাস নয়। প্রচণ্ড খিদেতে কাতর না হলে এখানে উঠত না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে সামান্য দু'টুকরো খাবার জুটেছিল কপালে, তারপর ওপরে কিছু একটার ঠাণ্ডা ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে কিছুক্ষণ। ওপরে জিনিসটা যা-ই হোক, ওটা থেকে তার জন্যে অস্বস্তিকর সঙ্কেত আসতে থাকে, তাই খানিক পর সরে এসেছে।

নীল পানি থেকে বেগুনি পানিতে ডাইভ দিল জলদানব, তারপর আবার উঠে এল নীল পানিতে।

কিন্তু কিছুই পেল না।

যতই ওপরে উঠল, সারফেস যত কাছাকাছি চলে এল, ততই সম্ভাবনাময় সঙ্কেত বয়ে নিয়ে এল পানি। কোন পদার্থ নেই, তবে লক্ষণ আছে, যা প্ররোচিত করছে ওটাকে—যেন সারফেসের কাছাকাছি পানিতে অঢেল খাবার বসানো আছে।

আরও ওপরে উঠল জলদানব, গাঢ় কিছু একটার কাছাকাছি। সরাসরি সেটার নিচে পৌঁছুনোর জন্যে ছুটল ওটা।

শালার বাচ্চা হাঙর, মনোফিলামেন্ট লাইনের শেষ মাথাটা পরীক্ষা করার

সময় গাল দিল বেল। লাইন যদি এক মিনিট নড়াচড়া না করে, চুপিসারে এগিয়ে আসবে ওগুলো, কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে সব।

নিচে থেকে উঁচু হলো বোট, যেন হঠাৎ একটা ঢেউ বা স্রোত ওপরে তুলছে ওটাকে। লাইন থেকে চোখ তুলে সাগরের দিকে তাকাল বেল। সাগরকে এখন সমতলই বলা যায়। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এরকম মাঝে মধ্যে টগবগ করে ফুটে ওঠার মত আচরণ করে সাগর, আসলে নিচ থেকে যে-কোন কারণেই হোক উথলে ওঠে পানি। দূরে তাকাল সে, মরগান এক্সপ্লোরারের ক্রেন ক্রেডল থেকে তুলে নিল সাবমারসিবলটাকে, দোল খাইয়ে জাহাজের বাইরে নিয়ে আসছে।

সাগরের তলায় সাবটার পৌঁছুতে কতক্ষণ যেন লাগবে বলেছে ওরা? আধ ঘণ্টা? পানিতে আরেকবার লাইন ফেলার সময় আছে তার হাতে। তবে এবার লাইন ছেড়ে নড়বে না সে, হাতে ধরে থাকবে। এবারও যদি কোন হাঙর ওটা কাটতে আসে, বেচারার কপালে খারাবি আছে।

মিডশিপ-এর হ্যাচ কভার থেকে নতুন একটা ওয়্যার লীডার নিল বেল, বুলওয়ার্কে হেলান দিয়ে লীডারের শেষ মাথার সুইভেল-এর চোখটা মুখের সামনে তুলল, মনোফিলামেন্টটা যাতে ঢোকাতে পারে ওটায়। প্রথমবার ব্যর্থ হলো সে। চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, ভাবল বেল, চশমা নেয়া দরকার।

তার পিছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো, কেমন যেন কলকল করে উঠল পানি। শব্দটা খেয়াল করলেও, সুইভেলের চোখে মনোফিলামেন্ট ঢোকাবার কাজে মগ্ন সে।

গর্তের ভেতর ঢুকল লাইন। 'হয়েছে!' স্বস্তিবোধ করল বেল।

কলকল শব্দটা আবার শুনতে পেল। এবার আরও কাছাকাছি। সেই সঙ্গে আঁচড়ানোর আওয়াজ। শব্দ লক্ষ করে ঘুরতে শুরু করল বেল।

কিসের একটা গন্ধও পাচ্ছে সে। পরিচিত গন্ধ···যদিও ঠিক মনে করতে পারছে না···।

আর তারপরই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল বেলের জগৎ। কি যেন একটা তার বুক আর মাথা পেঁচিয়ে ধরল, আঁটসাঁট আর ভেজা ভেজা। হাত দুটো আপনা থেকেই উঠে এসে আঁকড়ে ধরল জিনিসটাকে, পরমুহূর্তে পিছলে গেল—তাকে পেঁচিয়ে থাকা জিনিসটা চাপ দিতে শুরু করেছে। তীব্র ব্যথা অনুভব করল বেল, যেন এক হাজার সুঁচ তার মাংস ভেদ করছে।

ডেক থেকে শূন্যে উঠে পড়ল বেলের পা, অনুভব করল বাতাসের ভেতর দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। কি ঘটছে বুঝতে পারল বেল।

ছয়

কন্ট্রোল রুমে, কনসোল-এর সামনে বসে রয়েছে এলিস। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মাথায় হেডসেট; পাশে ওয়াটারম্যান।

যেহেতু মাত্র দুটো টেলিভিশন ক্যামেরা সচল, চারটে মনিটরের মধ্যে দুটো ফাঁকা। তৃতীয়টায় ক্যাপসুলের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে, স্টিক ধরে নিজের পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে জর্জ, ড. ফ্যাদম বাহুগুলোর ম্যানুপুলেটর পরীক্ষা করছেন, আর জোনা ক্যামেরার লেন্স অ্যাডজাস্ট করছে।

চতুর্থ মনিটরে ক্যাপসুলের বাইরেটা দেখা যাচ্ছে—ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো, ঝর্ণার ধারার মত প্ল্যাঙ্কটন, তারের খাঁচা থেকে লালচে রক্ত বেরিয়ে সামান্য ঘোলা করছে পানি। মাঝে মধ্যে দু'একটা ছোট মাছ ছুটে যাচ্ছে ক্যামেরার সামনে দিয়ে, খাঁচার ভেতর ঢুকতে না পেরে অস্থির ও হতাশ, অথচ আকর্ষণীয় গন্ধটা ওটার ভেতর থেকেই আসছে।

'আটাশশো,' বলল এলিস। 'ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে ওখানে।'

একটু পরই সাগরের তলা উঠে আসতে দেখল ওরা। সাবমারসিবলের প্রপেলার আলোড়ন তুলছে পানিতে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে নিচের কাদা, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ভিডিও ক্যামেরার লেন্স।

স্থির হলো ক্যাপসুল, কাদার মেঘ অদৃশ্য হলো।

হঠাৎ সাগরের তলা দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল। সরে গিয়ে আবার দেখা দিল, আরেক দিকে যাচ্ছে।

'শার্ক,' বলল রানা। 'ড. ফ্যাদম শার্কের কথা ভাবেননি। ওটা সম্ভবত তাঁর টোপ গিলবে।'

মনিটরের দৃশ্য এলোমেলো হয়ে গেল, ঝাঁকি খাচ্ছে ক্যাপসুল।

'কি ওটা?' ড. ফ্যাদমের গলা শুনতে পেল ওরা।

'একটা শার্ক, ড. ফ্যাদম,' মাইক্রোফোনে বলল এলিস। 'কিছু না, শুধু একটা শার্ক।'

'বেশ, বুঝলাম—কিছু একটা করো!' ধমক দিলেন ড. ফ্যাদম।

হেসে উঠল রানা। 'আমরা আধ মাইল দূরে রয়েছি, ড. ফ্যাদম। কি করতে বলেন আপনি আমাদের?'

একটা বোতামে চাপ দিল এলিস, তারপর খপ করে একটা কন্ট্রোল লিভার চেপে ধরল। ক্যাপসুলের বাইরের ক্যামেরা মুখ ঘুরিয়ে ওপর দিকে তাকাল। এবার তারের খাঁচাটা ওরা দেখতে পাচ্ছে।

'ওটা একটা সিক্স-গিল শার্ক,' বলল রানা। 'খুব কম দেখা যায়।'

গায়ের রঙ চকোলেট-ব্রাউন, উজ্জ্বল সবুজ চোখ, ছ'টা ঢেউ খেলানো ফুলকা। আকারে ছোট, খাঁচাটার দ্বিগুণ হতে পারে, তবে নাছোড়বান্দা। খাঁচার একটা কোণ কামড়ে ধরল, শরীরটা পাক খাওয়াল, প্রথম একদিকে, তারপর আরেক দিকে, চেষ্টা করছে জালে একটা গর্ত তৈরি করতে। দূরে ঝাঁক বেঁধে রয়েছে ছোট মাছেরা, শকুনদের মত ভাগ পাবার আশায়।

'মাছগুলো পালায়নি কেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান। 'এতদিন শুনে এসেছি যেখানে হাঙর থাকে সেখানে মাছ থাকে না।'

'হাঙরটা একটা টার্গেট পেয়ে গেছে,' বলল রানা। 'মাছগুলো বুঝতে পারছে, তাদের ওপর ওটার নজর নেই। হাঙরটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল দিচ্ছে, পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে ওগুলো। এখন হাঙরটা যদি খাঁচা থেকে পিছিয়ে আসে, বা অন্য একটা হাঙর হাজির হয়, দেখবে কিভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওগুলো।'

অপর মনিটরে ড. ফ্যাদমকে দেখতে পেল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোলেন তিনি, হ্যাণ্ডেলগুলো ধরলেন। এই হ্যাণ্ডেলই মেকানিক্যাল বাহুগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। কন্ট্রোল প্যানেলের ফাঁকে একটা চার ইঞ্চি সাদা-কালো মনিটর রয়েছে, বাইরের ক্যামেরা থেকে পাঠানো দৃশ্য ধরা পড়ছে সেটায়। স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে ড. ফ্যাদম একটা হ্যাণ্ডেল নিজের দিকে টানলেন—ক্যাপসুলের বাইরে একটা বাহু নড়ে উঠল। অপর হ্যাণ্ডেলটা সামনে ঠেললেন একটু—ক্যাপসুলের বাইরে দ্বিতীয় বাহুটা উঁচু হলো, ঘুরল, ওটার কাঁটাগুলো মুখ করল খাঁচার দিকে।

'উঁহুঁ, না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'টক' বাটনে চাপ দিল ও, কথা বলল মাইক্রোফোনে। 'কি দরকার, ড. ফ্যাদম। শুধু শুধু বেচারাকে মেরে লাভ কি!'

স্পীকার থেকে ভেসে এল ড. ফ্যাদমের গলা, 'শুধু শুধু মানে?

আপনি বলতে চান হাঙরটা আমার সব টোপ নিয়ে চলে যাক, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি?'

'শুনুন। ওটা আপনার খাঁচা ভাঙতে পারবে না। সিক্স-গিল-এর দাঁত অত বড় নয়। খাঁচাটাকে হয়তো বাঁকা করবে, তবে একেবারে নষ্ট করতে পারবে না।'

'আপনি বলছেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা, ভদ্রলোককে কিভাবে ক্ষান্ত করা যায় ভাবছে। তারপর বলল, 'শুনুন, ড. ফ্যাদম, আপনার যদি মরার শখ চেপে থাকে, সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু ওখানে আপনার সঙ্গে আরও দু'জন রয়েছেন—ওদেরকে বিপদে ফেলার কোন অধিকার আপনার নেই।'

ওরা দেখল, ড. ফ্যাদমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জোনা, তারপর তার কথাও শুনতে পেল, 'ডক্টর, আপনার একটা অস্ত্র যদি হাঙরটাকে মারার কাজে লাগান, স্কুইডটাকে খতম করার সম্ভাবনা অর্ধেক কমে যাবে আমাদের।'

'চিন্তা করবেন না, মিস জোনা,' ড. ফ্যাদম তাকে আশ্বস্ত করলেন। 'সেটাকে মারার জন্যে আরও উপায় আমাদের হাতে থাকবে।'

ড. ফ্যাদমকে একটা বোতামে চাপ দিতে দেখল ওরা। পরমুহূর্তে স্পিয়ার গান থেকে ছুটল বর্শা। হাঙরটার ঠিক ফুলকার পিছনে লাগল সেটা।

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, মনে হলো হাঙর ব্যাপারটা খেয়ালই করছে না। তারপর হঠাৎ ওটার শরীর ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল, শক্ত হয়ে গেল ফিন আর লেজ। ঝাঁকি খেয়ে খাঁচা থেকে সরে এল মুখ, চোয়াল খুলে গেল। আড়ষ্ট, কাঁপছে, ঝুলে থাকল পানিতে। তারপর, যেন একটা ফাইটার প্লেন ঝাঁক থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, ডান দিকে কাত হলো হাঙর, ডিগবাজি খেলো, ধাক্কা খেলো একবার ক্যাপসুলের

গায়ে, পড়ে গেল কাদায়।'

ছোট মাছের ঝাঁকগুলো এগিয়ে এল এবার, লাশটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

একটা ভিডিও মনিটরে দেখা গেল পোর্টহোলে লেন্স ঠেকিয়ে দ্রুত ছবি তুলছে জোনা।

'মরা একটা হাঙর কি আরও হাঙরকে ডেকে আনবে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'না,' বলল রানা। 'হাঙরদের কিছু অদ্ভুত রীতি আছে। পরস্পরকে খুন করবে, কিন্তু নিজেদের কেউ মারা গেলে দূরে সরে থাকবে তারা। যেন নিজেদের মৃত্যু লাশটার মধ্যে লেখা আছে।' মনিটরের দিকে তাকাল ও। 'কোন কোন প্রাণী মৃত্যু সহ্য করতে পারে না। আবার কোন কোন প্রাণীর কাছে মৃত্যু উত্তেজনাকর।'

জলদানব খেয়েছে, তবে দীর্ঘক্ষণ অভুক্ত থাকার পর সামান্য যে প্রোটিন পেয়েছে তাতে তার খিদে মেটেনি, বরং তা আরও অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই আরও খাবারের সন্ধানে আছে ওটা।

হঠাৎ করে তার অনুভূতি নতুন, অন্যরকম সঙ্কেত পেল—খাদ্যের সঙ্কেত, জীবিত শিকার, মরা শিকার, আলোর সঙ্কেত, নড়াচড়া, আওয়াজ। একসঙ্গে এতগুলো সঙ্কেত অস্থির ও দিশেহারা করে তুলল ওটাকে। আগুপিছু করছে, ভঙ্গিটা একাধারে আক্রমণাত্মক আবার আত্মরক্ষামূলকও।

অবশেষে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল। শব্দজটের উৎস সন্ধান করছে। কিন্তু খানিক দূর ওঠার পরও কিছু পেল না। কাজেই আবার নিচে নেমে এল।

চোখে আলোর খুদে কণা আঘাত করল, জ্বলছে আর নিভছে—

তারমানে কাছাকাছি ছোটখাট প্রাণী আছে। জলদানব সেগুলোকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। তারপর আরও আলো পড়ল নিচে, প্রায় একটা বন্যা বয়ে গেল। দিশেহারা বোধটা বাড়ল, সুযোগ ও বিপদ, দুটোই অনুভব করছে। শরীরে ঘন ঘন প্রচুর পানি ভরে ছাড়তে শুরু করল ওটা, সাগরতলের একদিক থেকে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে।

আলোর উৎস কাছে চলে আসছে, ক্রমশ কর্কশ হয়ে উঠছে আভাটা, ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। মস্তিষ্ক সতর্ক সঙ্কেত দিল, কেটে পড়ো। কিন্তু ওটার অলফ্যাক্টরি সেনসর ইতিমধ্যে খাদ্যের শক্তিশালী সঙ্কেত পেতে শুরু করেছে—তাজা শিকার, উপাদেয় ও পুষ্টিকর।

ক্ষুধা ওটাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

সাগরের তলা ছেড়ে ওপরে উঠল জলদানব, আলোর অনেক ওপরে উঠে এল, স্রোতের টানে শরীরটাকে ভেসে যেতে দিল আলোর পিছনে। তারপর স্থির হলো ওখানে, যেখানে সঙ্কেত আর হুমকির অস্তিত্ব নেই। এখানে স্থিরভাবে ঝুলে থাকল ওটা, নিচের শিকারের দিকে মনোযোগ।

আরও কিছুক্ষণ পর নিচে নামতে শুরু করল জলদানব।

হাই তুলল ওয়াটারম্যান, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর ঝাঁকাল মাথাটা; ঘুমে বুজে আসছে চোখ, জেগে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। এক ঘণ্টার ওপর হলো মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, দুটোর কোনটাতেই কোন নড়াচড়া নেই। স্ক্রীনগুলো হিপনোটিক, যেন টেস্ট প্যাটার্ন-এর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

সাবমারসিবলে ড. ফ্যাদম, জোনা ও জর্জ প্রায় কোন নড়াচড়াই করছে না, কথাও বলছে না। পোর্টহোলের বাইরে ঘোরাফেরা করছে অদ্ভুত সব প্রাণী, ইতিমধ্যে সেগুলোর ছবি তোলা হয়ে গেছে জোনার।

এখন হাঁটু মুড়ে বসে শুধু দেখছে সে।

সাবমারসিবলের ভিডিও ক্যামেরার দিকে মুখ তুললেন ড. ফ্যাদম। বললেন, 'ক'টা বাজে?'

'নব্বুই মিনিট পার হয়েছে,' মাইক্রোফোনে বলল এলিস।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার পোর্টহোলের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন ড. ফ্যাদম।

বাইরের ক্যামেরা নতুন করে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে, এখন সেটা মরা হাঙরটার দিকে তাক করা—কাদার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। খানিক আগে একটা হ্যাগফিশ ছুটে এসে ওটার গায়ে একটা ফুটো তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চামড়া এত বেশি মোটা যে সুবিধে করতে পারেনি, অন্য শিকারের খোঁজে ফিরে গেছে সে।

কন্ট্রোল রূমের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল রানা, হাতে দু'কাপ কফি। একটা কাপ ওয়াটারম্যানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ক্রীম ছাড়া…আরে, সর্বনাশ, একি!'

'কি?' চমকে উঠে রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে মনিটরের দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান।

'মাছ। সবগুলো চলে গেছে।'

মাথায় হেডসেট পরে মাইক্রোফোনের 'টক' বাটন হাতড়াচ্ছে রানা, ও কি বলতে চাইছে উপলব্ধি করতে পারল ওয়াটারম্যান। গভীর পানির কোন প্রাণী আলোর কিনারায় টহল দিচ্ছে না, মরা হাঙরের কাছে ছোট কোন মাছ ঘুর ঘুর করছে না।

'ড. ফ্যাদম!' মাইক্রোফোনে চিৎকার করল রানা। 'লুক আউট!'

গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলেন ড. ফ্যাদম, পোর্টহোল দিয়ে ভাল করে তাকালেন, কিন্তু নতুন কিছু দেখতে পেলেন না। 'কি দেখব?'

এই সময় ফাঁপা একটা আওয়াজ হলো, তারপর আঁচড়ানোর,

ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল কি যেন, মনে হলো মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা জাহাজকে। পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে ওপর দিকে উঠল ক্যাপসুল, কাত হয়ে গেল মাথা। ভেতরের ক্যামেরায় দেখা গেল জোনা আর ড. ফ্যাদম ছিটকে পড়লেন জর্জের গায়ে, তারপর তিনজনই হুমড়ি খেলেন কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর। বাইরের ক্যামেরায় কাদা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অশ্রাব্য একটা গাল দিল জর্জ। হ্যাণ্ডেলগুলো ধরে ফেললেন ড. ফ্যাদম, মেকানিক্যাল বাহু সচল করার চেষ্টা করলেন। 'কাদায় আটকে গেছে বাহুগুলো!' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

'পাওয়ার দিশ ক্যাপসুলে,' জর্জকে বলল রানা। 'প্রপেলার ওটাকে দূরে সরিয়ে রাখবে।'

ওরা দেখল স্টিক টেনে ধরে পাওয়ার অ্যাপ্লাই করল জর্জ, শুনতে পেল সাবমারসিবলের মোটর গুঞ্জন তুলল, তারপর গর্জে উঠল।

কাত হয়ে ওপরে উঠল ক্যাপসুল, কাদা থেকে মুক্ত হলো মেকানিক্যাল আর্মস।

'ক্যামেরা!' হুঙ্কার ছাড়লেন ড. ফ্যাদম।

বাইরের ক্যামেরার কন্ট্রোল ধরার জন্যে হাত বাড়াল জর্জ, ইতিমধ্যে ড. ফ্যাদম মেকানিক্যাল বাহু উঁচু করেছেন, ফায়ারিং বাটনে স্থির হয়ে আছে তাঁর আঙুল।

মনিটরে দেখা গেল ঘুরে যাচ্ছে ক্যামেরা—পানিকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে কাদা, তারপর লেন্সে ধরা পড়ল ক্যাপসুলের পাশে একটা ঝলক, তারপর...।'

'ওহ্ গড, কি ওটা?' আঁতকে উঠল ওয়াটারম্যান।

একগাদা বৃত্ত দেখাচ্ছে ক্যামেরা; বেগুনি-খয়েরি, প্রতিটি আপনাআপনি ঘুরছে, মনে হলো প্রতিটির কিনারায় সারি সারি দাঁত

রয়েছে, এবং প্রতিটির রয়েছে একটা করে হলুদ রঙা নখ।

'ওটা দুঃসংবাদ,' ওয়াটারম্যানের প্রশ্নের জবাবে বলল রানা। মাইক্রোফোনে চিৎকার করল, 'ফায়ার ইট, মি. ফ্যাদম!'

পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টান দিয়ে মাউন্ট থেকে ভেঙে নেয়া হলো ক্যামেরা, ফাঁকা হয়ে গেল স্ক্রীন।

চাবুক দিয়ে পেঁচিয়ে ক্যামেরাটাকে ছিঁড়ে আনল জলদানব, ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর ফিরে এল হাঙ্গরের ছিন্নভিন্ন লাশটার কাছে, ছোট আটটা বাহু দিয়ে খুবলে আর আঁচড়ে মাংস তুলে এনে খোলা মুখে ভরছে। কিন্তু মাংস আর নেই বললেই চলে।

দিশেহারা বোধ করছে জলদানব, কারণ লক্ষণ আর গন্ধ খাবারের প্রতিশ্রুতি দিলেও পেট ভরার মত কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত অনুভূতি জানাচ্ছে, খাবার আছে; তার ক্ষুধা খাবার দাবি করছে। কিন্তু কোথায় খাবার?

শক্ত, বড় আকৃতির একটা খোল দেখতে পাচ্ছে জলদানব, খাবারের সমস্ত লক্ষণ ও গন্ধ বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে। চাবুক দিয়ে খোলটাকে পেঁচিয়ে ধরল। ক্ষুধার জ্বালা আর হতাশাজনিত প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেছে, ভেঙে চুরমার করতে চায় ওটাকে।

'দেখতে পাচ্ছি না,' চিৎকার করলেন ড. ফ্যাদম। 'গেল কোথায় ওটা?'

'ফায়ার ইট, ড. ফ্যাদম!' চিৎকার করছে রানাও। 'বর্শা ছুঁড়ুন! ওটা এত বড় যে না লাগার প্রশ্ন ওঠে না!'

স্পিয়ার গানের বর্শা ছোঁড়ার জন্যে ড. ফ্যাদম বোতামে চাপ দিলেন, দেখতে পেল ওরা। 'বর্শা যাচ্ছে না!' বোতামটায় আবার চাপ দিলেন তিনি, তারপর আবার।

ককিয়ে উঠল জোনা, 'লুক!' হাত তুলে নিজের পোর্টহোল দেখাল। 'কাদায়। স্পিয়ার গান। ভেঙে নিয়ে গেছে ওটা।'

এই সময় ঝাঁকি খেলো ক্যাপসুল, তারপর দোল খেতে শুরু করল এদিক ওদিক। হড়কে গেলেন ড. ফ্যাদম, ভারি একটা বস্তার মত জোনার ঘাড়ে পড়লেন। কন্ট্রোল ধরে ঝুলে থাকল জর্জ। পোর্টহোলের বাইরে দ্রুত বদলে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো একের পর এক—কাদা, পানি, আলো, অন্ধকার।

আবার ঝাঁকি খেলো ক্যাপসুল, এবার আঁচড়ানোর শব্দ তীক্ষ্ণ হলো।

টিভি মনিটরে চোখ রেখে থরথর করে কাঁপছে ওয়াটারম্যান, অসুস্থ বোধ করছে সে। 'মি. রানা, কিছু একটা করা দরকার আমাদের।'

'যেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক্যাপসুল তুলে আনা যায় না? উইঞ্চ স্টার্ট দিন। ক্যাপসুল গতি পেলে ওটা হয়তো ভয়ে সরে যাবে।'

'ঢিলে কেবল টান টান করতেই লাগবে দশ মিনিট,' বলল রানা। 'অত সময় নেই ওদের। যা ঘটার এখুনি ঘটবে।'

দুর্বলতা খুঁজছে জলদানব। কোথাও না কোথাও দুর্বল একটা জায়গা থাকবেই। সব শিকারেরই স্পর্শকাতর, নরম জায়গা থাকে।

ক্যাপসুলটা আকারে জলদানবের অর্ধেক। জিনিসটা শক্ত আর নিরেট হলেও, যুদ্ধ বা ধস্তাধস্তি করছে না। লম্বা দুই চাবুকের সাহায্যে জড়িয়ে ধরে অনায়াসে তুলে ফেলল, ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছে, অনুভব করছে ক্যাপসুলের গা, নরম কোন জায়গা বা সরু কোন ফাটল পাওয়া যায় কিনা দেখছে। তারপর জলদানব ওটাকে তার আটটা ছোট বাহুর ভেতর টেনে নিয়ে চাপ দিল। মুখ খুলল, জিভ দিয়ে গা চাটছে। জিভের গতি মন্থর—চাটছে, ডগা দিয়ে খোঁচাচ্ছে।

'ও কিসের শব্দ!' হিসহিস করে জানতে চাইলেন ড. ফ্যাদম। শব্দটা শুনে মনে হলো ভোঁতা একটা করাত দিয়ে খোলটা কাটা হচ্ছে।

ক্যাপসুল এখন উল্টো হয়ে রয়েছে, ভেতরে ওরা তিনজন হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে মাথার দিকে, হাত দিয়ে যে-যার খুলি ঢেকে।

'আপনাদের সঙ্গে খেলছে ওটা,' মাইকে বলল রানা। 'ভাগ্য ভাল হলে খেলাটা একঘেয়ে লাগবে, ছেড়ে চলে যাবে আপনাদের।'

মাথাটা একপাশে কাত করলেন ড. ফ্যাদম, যেন নতুন কোন আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছেন। তারপর বললেন, 'আমাদের মোটর থেমে গেছে।'

'ওটা আপনাদের ছেড়ে দিলেই উইঞ্চ চালিয়ে তুলে আনব ক্যাপসুল। আর বোধহয় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

'টক' বাটনে রানা চাপ না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওয়াটারম্যান, তারপর জানতে চাইল, 'আপনি তা বিশ্বাস করেন?'

কথা বলার আগে মাথা নাড়ল রানা। 'না। শয়তানটা ক্যাপসুলের ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজছে।'

আবরণের গায়ে সাপের মত নড়াচড়া করছে জিভ, মসৃণতা পরীক্ষা করছে, পার্থক্য খুঁজছে। কিন্তু আবরণ সবখানে সমান—কঠিন, স্বাদহীন, নির্জীব। জিভের গতি বাড়ল, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে জলদানব।

মস্তিষ্কে একটা সঙ্কেত ধরা পড়ল।

স্থির হলো জিভ, ফিরে গেল মুখের ভেতর, তারপর আবার বেরিয়ে এসে চাটতে শুরু করল, এবার আগের চেয়ে ধীরে ধীরে। আবার! ফিরে এসেছে সঙ্কেতটা, মিলিয়ে যাচ্ছে না।

জিনিসটার আবরণ এখানে অন্যরকম—অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি

মসৃণ, পাতলাও।

জোনা নিশ্চয়ই তার পিছনে কোন শব্দ শুনেছিল, কারণ তাকে ঘাড় ফিরিয়ে পোর্টহোলে তাকাতে দেখল ওরা। যা-ই দেখুক, গলা চিরে আর্তনাদ করে উঠল সে, পিছিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

সেদিকে তাকালেন ড. ফ্যাদম, আঁতকে উঠলেন।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মনে হচ্ছে...,' হাঁপাচ্ছেন ড. ফ্যাদম, '...একটা জিভ।'

সাবমারসিবলে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল বদল করল এলিস, ফোকাস করল পোর্টহোলে। এবার ওরা দেখতে পেল—হ্যাঁ, একটা জিভই। বৃত্তটা চাটছে, লালচে মাংস দিয়ে ঢেকে ফেলছে কাঁচ। তারপর পিছিয়ে গেল জিভ, আকৃতি বদলে মোচার আদল নিল, বাড়ি দিল কাঁচে। হাতুড়ি পেটার মত আওয়াজ হলো।

তারপর আবার সরে গেল জিভটা, মুহূর্তের জন্যে পোর্টহোল ঘন কালো রঙে ঢাকা পড়ে গেল। প্রায় কান ফাটানো আঁচড়ানোর শব্দ শুনতে পেল ওরা।

বাল্কহেডের ক্লিপ থেকে ছোঁ দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিলেন ড. ফ্যাদম, আলো ফেললেন পোর্টহোলে।

জিনিসটার মাত্র অংশবিশেষ দেখতে পেল ওরা, কারণ আকারে পোর্টহোলের চেয়ে বড় সেটা, অনেক বড়—বাঁকা, কাস্তে আকৃতির ঠোঁট, হলুদ রঙা, ডগাটা ছুঁচালো, সেঁটে আছে কাঁচে।

উল্টোদিকের বাল্কহেডে শুয়ে পড়েছে জোনা, হাঁটু গেড়ে বোবা হয়ে রয়েছেন ড. ফ্যাদম, হাতের ফ্ল্যাশলাইট পোর্টহোলের দিকে তাক করা। ক্যামেরার দিকে মুখ ফেরাল জোনা, বলল, 'আমরা কি মারা যাচ্ছি?'

এই সময় কিছু ফাটা বা ভাঙার তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ হলো। এক পলকেরও কম সময়ে গুরু-গম্ভীর শব্দে বিস্ফোরিত হলো পানি। সবার মিলিত চিৎকার শোনা গেল। তারপর থেমে গেল সব, আর কোন আওয়াজ নেই, মনিটর অকেজো হয়ে গেছে।

খালি স্ক্রীনের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা।

সাত

ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল রানা, হোটেলে ফিরছে। টাইয়ের নটটা ঢিলে করে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল, এতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকায় ঘেমে গেছে।

মৃত্যু সম্পর্কিত যে-কোন অনুষ্ঠান বিষণ্ন করে তোলে ওকে। লাশ দেখা, জানাজা পড়া, মাটি দেয়া, কুলখানি—সম্ভব হলে এড়িয়ে যায় এ-সব। বিষণ্ন করে তোলে হাসপাতালও। এ-সব শুধু যে অসুস্থতা আর মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে, তা নয়। এগুলো চরম নিয়ন্ত্রণহীনতার প্রতিনিধিত্বও করে। বুদ্ধিমান, সতর্ক একজন মানুষ হিসেব কষে ঝুঁকি নিলে এবং সীমারেখার ওপারে পা না দিলে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এ ধারণাটা যে কতবড় ভুল, আকস্মিক মৃত্যু এসে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় সেটা। সীমারেখা যে যখন-তখন সরে, তার প্রমাণ দুর্ঘটনা আর মৃত্যু।

তাছাড়া, রানা বিশ্বাস করে, মৃত্যু-পরবর্তী অনুষ্ঠান মৃত ব্যক্তির কোন

উপকারে আসে না।

এ-ব্যাপারে বেল ওর সঙ্গে একমত ছিল। একদিন মৃত্যুর প্রসঙ্গ ওঠায় বেল ওকে বলেছিল, সে তার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনকে বলে রেখেছে, মারা গেলে তার লাশ যেন সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়, যেন কোন আনুষ্ঠানিকতা করা না হয়। তার ইচ্ছাই পূরণ হয়েছে, সাগরে মারা গেছে বেল।

চার্চের অনুষ্ঠানটা সাদামাঠাই হয়েছে। উপস্থিত ছিল শুধু বেলের আত্মীয়স্বজনরা। বাইরের লোক বলতে একা রানা, তা-ও ভেতরে ঢোকেনি ও। দুটো ধর্মীয় গান গাওয়া হয়, বাইবেল থেকে ক'লাইন পাঠ করেন পর্তুগীজ যাজক। কেউ কোন প্রশ্ন বা অভিযোগ তোলেনি, কি ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনাও হয়নি। বেলের স্ত্রী আর আত্মীয়স্বজনরা বরং সান্ত্বনা দিয়েছে রানাকে।

ওদেরকে বেলের মৃত্যুর আসল কারণ জানায়নি রানা। কি ঘটেছে তা শুধু দু'জন জানে—ও আর ওয়াটারম্যান। ওদের কথা বিশ্বাস করেছে সবাই, অন্য রকম কিছু সন্দেহ করেনি। মিথ্যে বলার কারণ হলো, ওরা চায়নি বেলের আপনজনেরা বাকি জীবন ভীতিকর একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকুক। সবাইকে বলা হয়েছে, বোট থেকে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেছে বেল। বলা হয়েছে, পড়ার সময় নিশ্চয়ই তার মাথা ডাইভ স্টেপে বাড়ি খায়, যার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে।

কর্তৃপক্ষকেও তাই বলা হয়েছে। ভিডিও টেপে রোমহর্ষক মৃত্যুর ঘটনা এত বেশি, আরেকটা বীভৎস মৃত্যুর বর্ণনা শুনতে হয়নি বলে কর্তৃপক্ষ স্বস্তিই বোধ করেছেন।

সী কুইনকে রেডিওতে ডেকে রানা যখন কোন সাড়া পেল না, বেলের ওপর খুব রাগ হয় ওর। ধরে নেয়, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে সে। ক্যাপটেন বারবির কাছ থেকে একটা জোডিয়্যাক ধার করে আধ মাইল

খোলা সাগর পেরিয়ে স্রোতে ভাসতে থাকা সী কুইনে চলে আসে রানা, ওয়াটারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। বিহবল ভাবটা তখনও কাটেনি ওয়াটারম্যানের, বোটে উঠল একটা সচল মড়ার মত। তবে যখন দেখল বেল নেই বোটে, তার বিহ্বল ভাব কেটে গেল।

প্রথমে ওরা মনে করল, বোট থেকে পড়ে গেছে বেল। স্রোতের গতিপথ আর বোটের ভেসে যাওয়ার হিসাব কষল ওরা, তারপর জোডিয়্যাক নিয়ে এক দেড় মাইল খোঁজাখুঁজি করল। সিদ্ধান্ত নিল, সী কুইনের ফ্লাইং ব্রিজ থেকে চারদিকে চোখ বুলানো দরকার। ফিরে এসে স্টারবোর্ড সাইড দিয়ে বোটে উঠতে যাবে, রঙের ওপর আঁচড়ানোর দাগ দেখতে পেল।

তারপর, বোটে উঠে এসেছে, বুলওয়ার্কে হাত বুলাতে আঠা আঠা লাগল। এবার গন্ধটাও ঢুকল নাকে।

দুর্ঘটনা ঘটার সময় বোটে ছিল না রানা, আর থাকলেও বোধহয় কিছু করতে পারত না। তবু নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর। সারা জীবন এই বোট নিয়ে মাছ ধরে জীবন ধারণ করেছে বেল, অথচ কখনোই একা উঠত না, একা উঠতে ভয় পেত। ট্যুরিস্ট হিসেবে রানা যখন বারমুডায় আসেনি, মাছ ধরার সময় হয় এনা অথবা মোনাকে নিয়ে সাগরে যেত বেল। ওর অপরাধবোধ করার কারণ হলো, ঠিক বিপদের সময়টা তার সঙ্গে থাকেনি ও। ও-ই তো তাকে সাইড-স্ক্যান সোনারে চোখ রাখার দায়িত্ব দিয়েছিল।

ভুলে যাও এ-সব, নিজেকে ধমক দিল রানা। এখন আর এ-সব কথা ভেবে লাভ কি।

ট্যাক্সি ড্রাইভার তার রেডিও অন করল। দুপুরের খবর হচ্ছে। বারমুডার অর্থনীতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত দুঃসংবাদ। সাবমারসিবল ডুবে যাবার পর গত এক হপ্তায় ট্যুরিস্টদের সংখ্যা আরও কমে গেছে।

বারমুডা সরকার খুব চাপের মধ্যে আছে, মিছিল-মীটিং করে মানুষ দাবি জানাচ্ছে দানবটাকে মারার বা তাড়াবার একটা ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারছে না, বলতে পারছে না কিভাবে কি করা উচিত। বারমুডা সরকার ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, কিন্তু তাঁরাও কোন সমাধান দিতে পারেননি। সবাই এখন একটা আশা নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে—জলদানব নিজেই চলে যাবে।

জলদানবের সঙ্গে এখন আর কেউ নিজেকে জড়াতে চায় না। শুধু জেরি হ্যাসটন আর ড. ফেরেল এখনও হাল ছাড়েননি। ওঁরা দু'জন ঠিক কি করছেন রানার তা জানা নেই, তবে জানে যে বারমুডা ত্যাগ করেননি। ইতিমধ্যে ওঁরা বেলের স্ত্রী এনার সঙ্গে দেখা করেছেন। বেলের অকাল মৃত্যুর জন্যে শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তবে পুরানো প্রস্তাবটা নতুন করে উত্থাপন করতেও ভোলেননি। টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, বোটটার জন্যে দৈনিক তিন হাজার ডলার দিতে রাজি আছেন। এনা হ্যাঁ-ও বলেনি, না-ও বলেনি, যোগাযোগ করতে বলেছে রানার সঙ্গে।

ওদের প্রস্তাব নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করেছে রানা। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উন্মাদ হয়ে আছেন জেরি হ্যাসটন, আর ড. ফেরেল মনে করছেন স্কুইডটাকে পরীক্ষা করার সুযোগ না পেলে তাঁর সারা জীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পরে হলেও, ওয়াটারম্যানের কাছ থেকে জানা গেছে ওঁরা নেভির শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তবে সরাসরি নয়। জেরি হ্যাসটন একজন মার্কিন সিনেটরকে ধরেন, সিনেটর যোগাযোগ করেন ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্যাপটেন স্টিফেন হান্টারকে জিজ্ঞেস করা হয়, স্কুইডটাকে ধরার ও মারার উপায় কি? প্রশ্নটা ভীষণ উদ্বিগ্ন করে

তোলে ক্যাপটেন হান্টারকে, একটা কারণ পেন্টাগন থেকে কোন প্রশ্ন করা হলে সেটাকে সমালোচনা বলে মনে করা হয়, দ্বিতীয় কারণ তিনি অত্যন্ত ভীতু—একজন সিনেটরকে অসন্তুষ্ট করতে চাননি। ভবিষ্যতে তাঁর যদি পদক পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, দেখা যাবে এই সিনেটরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তাঁকে তা দেয়া উচিত হবে কিনা। কাজেই কিছু একটা করে দেখাবার তাগাদা অনুভব করেন তিনি, সমস্যাটা চাপিয়ে দেন ওয়াটারম্যানের ঘাড়ে। পরে, মরগান এক্সপ্লোরারের অভিযান যখন ব্যর্থ হলো, ব্যর্থতার কারণ জানতে চেয়ে যোগাযোগ করেছিলেন সিনেটর ভদ্রলোক। নিজের গা বাঁচানোর জন্যে সমস্ত দোষ ওয়াটারম্যানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন ক্যাপটেন হান্টার।

তবে তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে ওয়াটারম্যান। অফিশিয়ালি সব সময় যাকে দায়ী করা হয়, এক্ষেত্রেও তাকে দায়ী করা হয়েছে, মৃত একজনকে—সব দোষ ড. কাইল ফ্যাদমের। তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কারও কথায় কান না দিয়ে উদ্ভট একটা পরিকল্পনা করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে দায়ী করা হয়েছে জর্জকে, যে তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিল।

ক'দিন ধরেই ভাবছে রানা, ড. ফেরেলের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত ওর। বেল মারা যাবার পর তার পরিবারের প্রতি একটা দায়িত্ব অনুভব করছে ও। বেলের এক ছেলে ও এক মেয়ে বোর্ডিং স্কুলে থেকে লেখাপড়া করে, বাবা মারা যাবার পর টাকার অভাবে স্কুল ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসবে তারা, এ হতে পারে না। এনাও এমন কিছু লেখাপড়া শেখেনি যে চাকরি করবে। সম্বল বলতে ওই সী কুইন, কিন্তু বেল না থাকায় ওটা থেকে আয় করা সম্ভব নয়, বড়জোর ভাড়া খাটানো যেতে পারে। কিন্তু বারমুডায় মাছই নেই, জেলেরা ক'টাকাই বা ভাড়া দিতে রাজি হবে। কাজেই কিছু একটা করা দরকার ওদের সংসার চলার একটা

উপায় যাতে হয়।

তাছাড়া, এই পরিস্থিতিতে আর চুপ করে থাকা যায় না। দিনের পর দিন মানুষ মারতে থাকবে স্কুইড, অথচ কারও কিছু করার নেই, এ-কথা রানা বিশ্বাস করে না। ব্যাপারটা নিয়ে ড. ফেরেলের সঙ্গে আরেকবার আলোচনা করতে চায় ও। ওটাকে কিভাবে মারা সম্ভব, সে-সম্পর্কে ভাল কোন ধারণা নেই ওর। তবে জানে ভীতু বা খামখেয়ালী লোকের কাজ নয় এটা। ওটাকে মারতে হলে সাহস দরকার হবে, সরাসরি মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে।

যদি এ-সময় বারমুডায় না থাকত তাহলে ব্যাপারটা ওর কাছে এত গুরুত্ব পেত না। চোখের সামনে এ-সব ঘটছে বলেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কথা ভাবতে পারছে না রানা। এখনও যদি কিছু একটা না করে, বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে ওকে।

হোটেলের কাছাকাছি চলে এসেছে ট্যাক্সি, সিদ্ধান্ত নিল আজই ড. ফেরেলকে টেলিফোন করবে।

ফোন করতে হলো না, লাউঞ্জে ঢুকতেই ওঁদেরকে দেখতে পেল রানা। সোফা ছেড়ে একযোগে উঠে দাঁড়ালেন ড. ফেরেল ও জেরি হ্যাসটন। 'মি. রানা,' বললেন ড. ফেরেল। 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'কি ব্যাপার?' মনে মনে খুশি হলেও রানার চেহারায় তা প্রকাশ পেল না।

'নিরিবিলি কোথাও বসে কথা বলতে পারলে ভাল হয়,' বললেন হ্যাসটন। 'আপনার রুমে...।'

'বেশ, আসুন,' বলে এলিভেটরের দিকে এগোল রানা।

'নিজের কামরায় ঢুকে ওঁদেরকে বসতে অনুরোধ করল ও, তারপর রুম সার্ভিসকে ডেকে বিয়ার দিতে বলল।

আলোচনা শুরু করলেন হ্যাসটন, আক্ষরিক অর্থেই ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে, কৃত্রিম অভিযোগের সুরটাও অস্পষ্ট থাকল না। 'আপনি কে, আমরা কি করে বুঝব বলুন!' রানার চোখ সামান্য কোঁচকালেও তিনি তা লক্ষ করলেন না। 'নিজের পরিচয় আরও পরিষ্কার করে দেয়া উচিত ছিল আপনার। সে যাই হোক, আমরা এখন জানি আপনি কে…।'

'কে?' মাথা একটু কাত করে তাকাল রানা।

'কে আবার, পৃথিবী বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার, একজন সারভাইভার, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর…আপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে সব কথা বলতে গেলে কাল এই সময় পর্যন্ত এখানে বসে থাকতে হবে আমাদের। আপনি জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট কমিটির একজন সদস্যও বটেন। একাধিক মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রাণ রক্ষা করেছেন…।'

'ধন্যবাদ,' খুক করে কেশে বাধা দিল রানা। 'এখনও বোঝা গেল না ঠিক কি নিয়ে আলোচনা করতে চান আপনারা।' মনে মনে স্বস্তিবোধ করছে ও, ওর আসল পরিচয় ওঁরা জানতে পারেননি। যা জানেন তা কোন গোপন ব্যাপার নয়।

'সিনেটর ব্রাইট আপনার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন আমাকে, তারপর পরামর্শ দিয়েছেন, আমরা যেন অবশ্যই আপনার সাহায্য কামনা করি।'

'কি ব্যাপারে?'

'স্কুইডটাকে, আপনার কথা মত, মারবই আমরা, মি. রানা,' এবার মুখ খুললেন ড. ফেরেল। 'তবে যদি সময় সুযোগ পাই তাহলে চেষ্টা করব ওটাকে পরীক্ষা করতে। তাতেও যদি আপনি আপত্তি করেন…।'

রুম-সার্ভিস বিয়ার পরিবেশন করে ফিরে গেল। রানা জানতে চাইল, 'আপনি নিশ্চিত, ড. ফেরেল, স্কুইডটা এখনও বারমুডার আশেপাশে আছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কেন তা মনে করেন?'

'কারণ কিছুই এখনও বদলায়নি। মরসুম বদলায়নি, স্রোত বদলায়নি—বড় ধরনের কোন ঝড় হয়নি। এন.ও.এ.এ.-এর রিপোর্ট পেয়েছি কাল রাতে—গালফ স্ট্রীম মরসুমি পালা বদল শুরু করতে আরও সম্ভবত এক মাস সময় নেবে।' ড. ফেরেল অনুভব করছেন, তাঁর উত্তেজনা-উৎসাহ আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। 'ইতিমধ্যে আর্কিটিউথিস তার খোরাক পাচ্ছে—তার স্বাভাবিক খাবার নয় অবশ্য, তবে খাবার। কাজেই বারমুডা ছেড়ে চলে যাবার কোন কারণ নেই তার।'

'তার তো এখানে আসারও কোন কারণ ছিল না।'

'ছিল, মি. রানা, ছিল! গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আর্কিটিউথিসকে দানব বা শয়তান হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। ওটা একটা অ্যানিমেল, ডেভিল নয়। ওটার নিজস্ব একটা সাইকেল আছে, সাড়া দেয় প্রাকৃতিক ছন্দে। আমার ধারণা, অসম্ভব খিদেতে দিশেহারা বোধ করছে ওটা। এমনটি ঘটছে স্বাভাবিক খাদ্য না পাবার ফলে। আমার আরও ধারণা, ওটার সামনে আমি একটা মায়া সৃষ্টি করতে পারি, অর্থাৎ ওটা যাতে স্বাভাবিক খাদ্য দেখতে পায় এবং দেখতে পেয়ে সাড়া দেয়, তার আয়োজন করতে পারি…।'

'কিভাবে?'

'সেটা আমি আপনাকে পরে ব্যাখ্যা করে বলব।'

'আপনার ধারণা, কাজ হবে তাতে?'

'আমার তাই বিশ্বাস, হবে।'

'আর কাউকে মারার আগে আমরাই ওটাকে মেরে ফেলতে পারব?'

'হ্যাঁ…হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস।'

'কিন্তু কিভাবে, পদ্ধতিটা কি?'

ইতস্তত করলেন ড. ফেরেল। 'আপনাকে জানাব…শিগগিরই।'

'টপ সিক্রেট কোন ব্যাপার নাকি?'

'না। আমি দুঃখিত। প্লীজ, মি. রানা, আমাকে ভুল বুঝবেন না, এর মধ্যে কোন ছল-চাতুরি নেই। পদ্ধতিটা কি হবে তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর, ওটা কি ধরনের আচরণ করে তার ওপর। ওটা হয়তো…সম্ভাবনা আছে…আমি আসলে চেষ্টা করতে চাই ওটা যাতে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে…।'

হ্যাসটনের দিকে ফিরল রানা। একদৃষ্টে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, পাথুরে চেহারা, আলোচনায় এ-সব খুঁটিনাটি বিষয় তাঁকে যেন বিরক্ত করছে। ও জানতে চাইল, 'কখন আপনারা শুরু করতে চান?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' জবাব দিলেন হ্যাসটন। 'গিয়ার লোড করা হয়ে গেলেই।'

'ফুয়েল আর ফুডও তো লাগবে,' বলল রানা। 'আমরা কাল রওনা হতে পারি।'

'দশ হাজার ডলারে হবে, ফুয়েল আর ফুড?' জানতে চাইলেন হ্যাসটন, হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন ব্রিফকেসটা। একশো ডলারের একটা তোড়া বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।'

'হবে।'

'এবার শর্ত নিয়ে আলোচনা করি, কেমন?' ব্রিফকেস বন্ধ করে বললেন হ্যাসটন। 'ড. ফেরেল বলছেন স্কুইডটাকে খুঁজে বের করতে, তারপর ওটাকে আকৃষ্ট করতে বাহাত্তর ঘণ্টাই যথেষ্ট। কাজেই, মি. রানা, বোটে আমাদের তিন দিন থাকার জন্যে যা যা লাগতে পারে সব

থাকতে হবে। স্কুইডটাকে আমরা ধরতে পারি বা না পারি, ফিরে এসে বোটের ভাড়া মিটিয়ে দেব। কত সেটা?'

'আপনারাই বলুন,' জানতে চাইল রানা।

'পনেরো হাজার ডলার।'

'না।'

'তাহলে কত?'

'আমার শর্তগুলো শুনুন,' বলল রানা। 'বোটটা আমার নয়, মিসেস বেলের। এই বোটটাই তাঁর একমাত্র সম্বল, কাজেই শুধু প্রচুর লাভ হবে বুঝতে পারলেই বোটের ওপর ঝুঁকি নেবেন তিনি। রওনা হবার আগেই পঞ্চাশ হাজার ডলার নগদ তাঁকে দেবেন আপনারা, বাকি পঞ্চাশ হাজার ডলারের চেক দেবেন তাঁর নামে, যদি আমরা না ফিরি সে-কথা মনে রেখে। আর বোটের যদি কোন ক্ষতি হয়, সেজন্যে দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। চেকে।'

ইতস্তত করছেন হ্যাসটন, তারপর আবার ব্রিফকেস খুলে বললেন, 'আপনি সম্মানী মানুষ, মি. রানা। আমার জন্যেও টাকা কোন ব্যাপার নয়। ঠিক আছে, আমরা রাজি।'

ড. ফেরেল ও জেরি হ্যাসটন বিদায় নিয়ে চলে যাবার আধ ঘণ্টা পর টাকার বাণ্ডিলটা পকেটে ভরে হোটেল ছেড়ে বেরুল রানা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল ডকে, বোটে ওঠার সময় ভাবল বটে একবার চুক্তির কথাটা এনাকে এখুনি জানানো দরকার, তারপর সিদ্ধান্ত নিল এখন বেচারীকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, উঠে এল ফ্লাইং ব্রিজে, বোট ছাড়বে এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল এখনও ওটা ডকে বাঁধা রয়েছে।

অনুভব করল কেউ যেন ওর পেটে ঘুসি মেরেছে। আটকে গেল দম,

হেলান দিল রেইলিঙে। বেল যে নেই, এই প্রথম সত্যিকার প্রমাণ পেল ও। ওখানে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও, নিঃশ্বাস নিয়মিত হয়ে আসার পর নিচে নেমে লাইন খুলল।

ডকইয়ার্ডে, ফুয়েল পাম্পে যাচ্ছে রানা। ম্যানগ্রোভ বে ঘোরার সময় ভাবল, সহকারী হিসেবে কাউকে ভাড়া করা দরকার। ড. ফেরেল বা হ্যাসটন যে বোট চালাতে জানেন না, ধরে নেয়া চলে। ওঁদের কাছ থেকে প্রায় কোন সাহায্যই পাবে না ও।

বেল আর ওয়াটারম্যান ছাড়া বারমুডায় আর কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি ওর। বেল থাকলে আর কাউকে লাগত না, কিন্তু সে নেই। আর ওয়াটারম্যানকে পাওয়া সম্ভব নয়, এ-ধরনের একটা অভিযানে নেভি তাকে দ্বিতীয়বার অংশগ্রহণের অনুমতি দেবে বলে মনে হয় না। মুখ চেনা লোকদের প্রস্তাব দিয়ে দেখা যায়, কিন্তু তারা কেউ সাহস করে রাজি হবে কি? ও-ই বা জেনেশুনে কাউকে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে বলবে কেন?

না, একাই ঝুঁকি নেবে ও। ঠিক একা না, হোল্ডের একটা বাক্সে ওর এক মিত্র আছে। প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করা যাবে। বেলের রেখে যাওয়া অস্ত্র, হয়তো ওই অস্ত্রে স্কুইডটা মারা যাবে বলেই বেল ওটাকে ওখানে রেখে গেছে।

দু'হাজার গ্যালন ডিজেল ভরতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর ট্যাঙ্কে ভরতে হলো সাতশো গ্যালন মিষ্টি পানি। সবশেষে ছয় বাক্স ভর্তি গ্রোসারি কিনল রানা—তাজা ও শুকনো ফল, শাক-সব্জি, টিনে ভরা শুকনো মাছ, পনির ও মাখন, পাউরুটি, স্টুর জন্যে মাংস ইত্যাদি। এ-সব খাবার খেয়ে শেষ করার আগেই দেখা যাবে হয় ওরা মারা গেছে নয়তো ডাঙায় ফিরে এসেছে।

ডকে ফিরে আসতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। বোট থেকে কিছু কিছু

গিয়ার নামিয়ে রাখল রানা—ভাঙা ট্র্যাপ, স্কুবা ট্যাঙ্ক, খোলা একটা কমপ্রেসর-এর পার্টস। যে পাম্পটা মেরামত করার চেষ্টা করছিল বেল সেটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল একবার। ওর মনে হলো, বেলের স্পর্শ অনুভব করছে ও, জিনিসটার মধ্যে যেন বেলের শক্তি নিহিত আছে।

বোকার মত আচরণ করো না, নিজেকে তিরস্কার করল রানা। পাম্পটা নামাল বোট থেকে।

চার্চে উপাসনাটাই ছিল আনুষ্ঠানিকতার প্রথম ও শেষ পর্ব, তারপর ছেলে ও মেয়েকে আবার বোর্ডিং স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে এনা। ওদের বাড়িতে দুই বোনকেই শুধু পেল রানা, দূর-দূরান্ত থেকে যে-সব আত্মীয়স্বজন এসেছিল তারাও ফিরে গেছে। বেলের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বেশ কিছু প্রাচীন মুদ্রা ছিল, সেগুলো বের করে দেখছিল ওরা, আলোচনা করছিল বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে। দরজার সামনে রানাকে দেখে বিব্রত বোধ করল দু'জনেই।

'কিছুই বিক্রি করতে হবে না,' খালি একটা চেয়ার টেনে বৈঠকখানায় বসল রানা। 'মি. হ্যাসটন কাল সকালে পঞ্চাশ হাজার ডলার তোমার হাতে দিয়ে যাবেন, বাকি পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা চেকও দেবেন—ওটা ভাঙাতে পারবে তিন দিন পর। কথা হয়েছে, বোটের কোন ক্ষতি হলে তারও ক্ষতিপূরণ দেবেন ওঁরা—আলাদা একটা চেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই বোন, তারপর একযোগে আবার রানার দিকে। দু'জনের চেহারাতেই উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'তুমি তাহলে ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছ?' জিজ্ঞেস করল এনা।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওঁরা আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন।'

মোনা বলল, 'মাসুদ ভাই, আমি জানি, আপনি এনার আর্থিক

অবস্থার কথা ভেবে নিজের জীবনের ওপর এত বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা চাই না…।'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'এ-সব কথা থাক, মোনা। ঝুঁকি নেয়া আমার পুরানো অভ্যেস। পারো যদি এক কাপ কফি খাওয়াও, দুধ চিনি দিয়ে।'

কফি খাবার সময় কোন কথা হলো না, টিভিতে স্থানীয় খবর হচ্ছে। খবর শেষ হবার পরও টিভিটা বন্ধ করল না কেউ, যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে হবে এই ভয়ে। কাপটা খালি হয়ে যাবার পর উঠে পড়ল রানা, বেরিয়ে এল লনে, তাকাল বে-র দিকে। দিনের আলো এখনও সামান্য লেগে রয়েছে পশ্চিম আকাশের গায়ে, অগভীর পানিতে সেন্ট্রির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জোড়া বক, রাতের খাবার হিসেবে দু'একটা মাছ পাবার আশায়। এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে…পাখি, না বাদুড়?

লনে দাঁড়িয়েই আছে রানা, এখনও তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে, কেন যেন নড়তে ইচ্ছা করছে না ওর। পুব দিকে গাছপালার মাথার ওপর আধ খানা চাঁদ উঠল, সোনালি আলো ছড়াল সাগরে, বকগুলোকে মনে হলো একজোড়া মূর্তি।

'মাসুদ ভাই, ভেতরে আসুন,' দরজার কাছ থেকে গলা চড়িয়ে ডাকল মোনা।

রানা সাড়া দিল না। ওর দিকে তাকিয়ে মোনা ভাবছে, মাসুদ ভাই, তোমাকে ঠিক একজন প্রাচীন রেড ইণ্ডিয়ানের মত লাগছে, বসে আছে পাহাড়ের কিনারায়, প্রস্তুতি নিচ্ছে মৃত্যুর।

আট

হোটেলের চারপাশে পাইন গাছের ভেতর দিয়ে শিস দিয়ে ছুটছে বাতাস, তারই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। এখনও আলো ফোটেনি, তবে চোখে না দেখেও আবহাওয়ার অবস্থা বুঝতে পারল ও। কানই বলে দিল, উত্তর-পশ্চিম দিকে বইছে বাতাস, পনেরো থেকে বিশ নট গতি। বছরের এই সময়টায় উত্তর-পশ্চিমমুখী বাতাস খুব খেয়ালী হয়, খুব তাড়াতাড়ি আবার হয়তো উল্টো দিকে বইতে শুরু করবে, নয়তো একেবারে থেমে যাবে। আবার বলা যায় না, রীতিমত একটা ঝড়ও হয়ে উঠতে পারে। তা যেন না হয়, ভাবল ও, সেক্ষেত্রে আজ ওদের সাগরে বেরুনো হবে না।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা, নিচের রেস্তোরাঁয় নেমে ব্রেকফাস্ট সারল, তারপর ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল বোটের কাছে। ইতিমধ্যে ভোর হতে শুরু করেছে। বাতাস এখনও আছে, তবে ততটা জোরালো নয়। দক্ষিণ-পুবের আকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিচু মেঘে ঢাকা। উত্তর দিকেও কালো একটা স্তম্ভ মাথাচাড়া দিচ্ছে আকাশে। রানা ধারণা করল, দুপুরের মধ্যে দক্ষিণ দিকে বইতে শুরু করবে বাতাস। অগভীর পানিতে ঢেউয়ের মাথায় এখন যে ফেনা দেখা যাচ্ছে তখন তা-ও আর থাকবে না। গভীর পানিতে অদৃশ্য হয়ে যাবে বড় বড় আকৃতির ঢেউগুলো।

বোট বাঁধা লাইনগুলো টান টান হয়ে আছে, ধীর গতিতে এদিক ওদিক কাত হচ্ছে সী কুইন। বোটে উঠতে যাবে, রানার হঠাৎ মনে হলো কেবিনে কে যেন আছে। কেন মনে হলো বলতে পারবে না, তাই দাঁড়িয়ে পড়ল ও, কান পাতল। লাইন থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে, ছল ছলাৎ শব্দে খোলে বাড়ি খাচ্ছে পানি, এ-সবকে ছাপিয়ে উঠল নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।

বোধহয় কোন রিপোর্টার, আন্দাজ করল রানা। বাতাসে গন্ধ পেয়ে চলে এসেছে।

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পেরিয়ে এল ও, স্টীল ডেকে নেমে বলল, 'তিন পর্যন্ত গুনব, তার মধ্যেই তীরে নেমে যেতে হবে, তা না হলে বাড়ি ফিরতে হবে লম্বা সাঁতার দিয়ে।' কথা শেষ করে কেবিনের দোরগোড়ায় দাঁড়াল ও। 'এক...।' তারপরই দেখল চমকে উঠে শিরদাঁড়া খাড়া করল ওয়াটারম্যান, আপার বাঙ্ক থেকে গলাটা লম্বা করে দিল দরজার দিকে।

হাই তুলল সে, হাত দিয়ে চোখ ডলল, হাসল, তারপর বলল, 'এই যে, মি. রানা...।'

'তুমি? তুমি এখানে কি করছ?'

'ভাবলাম আজ আপনার কোন সাহায্য দরকার হতে পারে...।'

'সহকারী একজন দরকার বটে, কিন্তু তুমি ...স্যাম চাচা রাগ করবেন না?'

'স্যাম চাচাই তো পাঠিয়েছেন আমাকে...মানে, মানেটা তাই দাঁড়ায় আর কি। বিজ্ঞানীরা—দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানী—চেষ্টা করছেন নেভি যাতে স্কুইডটাকে মারার জন্যে একটা অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু নেভি বলছে, এ-কাজের জন্যে তাদের ফাণ্ড নেই। যদিও আমার ধারণা, আসল কথা হলো যে-বিষয়ে কিছু জানে না সে ব্যাপারে জড়াতে চাইছে না নেভি। বোকা বনার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কাজেই ক্যাপটেন হান্টার

একটা ম্যাজিক ফর্মুলা বের করেছেন। আমার কাছ থেকে তিনি যখন শুনলেন যে আপনারা আজ রওনা হচ্ছেন, উনি ভাবলেন নেভিরও অংশগ্রহণ করা উচিত—অনেকটা পতাকা দেখানোর মত, মানে আমাকে। আমার দায়িত্ব হলো এমন ভূমিকা পালন করা যাতে মনে হয় ক্যাপটেন হান্টার কিছু একটা করছেন।' বিরতি নিল ওয়াটারম্যান। 'আমি আপনাকে ফোন করে পাইনি···ভেবেছিলাম···আশা করি আপনি কিছু মনে করেননি।'

'আরে না। কিন্তু শোনো, টেডি, আমার কর্তব্য তোমাকে জানানো যে··· ।'

'দানবটাকে আমি দেখেছি, মি. রানা, কাজেই সাবধান করার কোন দরকার নেই··· ।'

'ঠিক আছে তাহলে। তুমি তো এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট, তাই না?'

'এক বছরের একটা ট্রেনিং নেয়া আছে, মি. রানা।'

'গুড,' বলল রানা। 'তোমার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগতে পারে। ইতিমধ্যে, সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো, কফি বানানো।'

সাড়ে ছ'টার সময় বোট ছাড়ল ওরা। বে-র মাঝখান দিয়ে ধীর গতিতে এগোল সী কুইন, শহরের ডকে গিয়ে ড. ফেরেল ও জেরি হ্যাসটনকে তুলে নিল।

ওঁরা দু'জন ভাড়া করা একটা পিকআপ ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, ট্রাকে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির কেস। ড. ফেরেল পরেছেন একটা উইণ্ডব্রেকার, খাকি প্যান্ট আর রাবার বুট। হ্যাসটনকে দেখে মনে হলো কোন ক্যাটালগ বুক থেকে বেরিয়ে এসেছেন—পায়ে টপসাইডার বুট শু, পরনে ডোরা কাটা ট্রাউজার, হালকা খয়েরি শার্টের বুক পকেটে ক্লাব লোগো, তার ওপর একটা

জ্যাকেট, বোতাম খোলা।

'ওগুলো কি?' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে জানতে চাইল রানা। 'আপনারা কি সমুদ্রে টাওয়ার বানাতে চান?'

ওঁরা কোন জবাব দিলেন না। মুখ দেখেই বোঝা যায়, চুপচাপ থাকলেও দু'জনেই খুব টেনশনে আছেন। ব্যাপার কি? বোট দরকার ছিল, তা তো পেয়েছেনই!

ড. ফেরেলের তত্ত্বাবধানে সব মিলিয়ে বাইশটা কেস তোলা হলো বোটে। কয়েকটা কেস কেবিনের ভেতর রাখতে চাইলেন তিনি, বাতাস বা রোদ লাগতে দিতে চান না, তবে বেশিরভাগই সাজিয়ে রাখা হলো আফটারডেকে।

সব কেস বোটে তোলার পর ট্রাকের ক্যাবে হাত গলিয়ে লম্বা আরও একটা কেস বের করে আনলেন হ্যাসটন। ওটা তিনি যেভাবে বহন করছেন, দেখেই বুঝতে পারল রানা অসম্ভব ভারি হবে। সন্দেহ নেই, কেসটার ভেতর মূল্যবান কিছু আছে, কারণ অত্যন্ত সাবধানে বয়ে আনলেন তিনি, লক্ষ রাখলেন কিছুর সঙ্গে যাতে ধাক্কা না লাগে।

'ওটা কি?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

ক্ষমা-প্রার্থনার হাসি হেসে হ্যাসটন বললেন, 'পরে শুনবেন, প্লীজ।' রানার দিকে পিছন ফিরে ঢুকে পড়লেন কেবিনে।

হঠাৎ করে ডকের কিনারায় এসে থামল একটা ভ্যান। ভ্যানের গায়ে লেখাগুলো দেখে কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে বাকি থাকল না রানার। দু'জন সহকারীকে নিয়ে প্রথমে নামল একজন ক্যামেরাম্যান, তারা তিনজন ধরাধরি করে নিচে নামাতে শুরু করল ভিডিও ক্যামেরা ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। ভ্যানের ক্যাব থেকে নামল দু'জন রিপোর্টার। 'মি. রানা,' তাদের একজন বলল, 'আপনার সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলতে পারি? বারমুডা টেলিভিশনের তরফ থেকে?'

'দুঃখিত, না,' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে বলল রানা।

'মাত্র দু'মিনিট।' রিপোর্টার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল ক্যামেরাম্যান ছবি তোলার জন্যে তৈরি হয়েছে কিনা। 'আমরা শুনলাম আপনি নাকি জলদানবকে ধরার জন্যে রওনা হচ্ছেন। কেন আপনার মনে হলো…?'

'আপনারা ভুল শুনেছেন,' বলল রানা। 'সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষ এরকম পাগলামি করবে না।' ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল ও। 'টেডি, নোঙর তোলো।' শেষ লাইনটা ডেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোট ছেড়ে দিল। বে-তে আরও দশ-বারোটা বোট রয়েছে, সেগুলোর মাঝখান দিয়ে ধীরগতিতে এগোল সী কুইন।

খানিক দূর আসার পর, যখন মনে হলো ওর কথা ডক থেকে শোনা যাবে না, ফ্লাইং ব্রিজের কিনারা থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে বলল রানা, 'মি. হ্যাসটন, এখানে একবার আসবেন?'

মই বেয়ে উঠে এলেন হ্যাসটন, হেঁটে সামনে চলে এলেন। 'কি ব্যাপার, মি. রানা?'

'কেসটায় কি আছে বলুন আমাকে।'

'সময় হলে… ।'

'আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার!' নাক বরাবর একশো গজ দূরে ষাট ফুটী একটা স্কুনার আড়াআড়িভাবে ভাসছে, দু'পাশে একটা করে পঞ্চাশ ফুটী ফিশিং বোট। 'ঠিক আছে তাহলে…,' হাত বাড়িয়ে খপ করে হ্যাসটনের কব্জি চেপে ধরল রানা, ছেড়ে দিল হুইলের ওপর এনে। 'নিন, সামলান!'

ঘুরল রানা, ফ্লাইং ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে মইয়ের দিকে এগোল।

'কি করছেন আপনি!' চিৎকার করলেন হ্যাসটন।

'হঠাৎ ঘুম পেয়েছে।'

'হোয়াট!'

'আপনার শো, আপনি চালান।'

'প্লীজ, মি. রানা, প্লীজ—ফিরে আসুন!' আর্তনাদ করে উঠলেন হ্যাসটন, তাকিয়ে আছেন সামনে। স্কুনারটা এখন আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে আরও কমে আসছে। হুইল ঘুরিয়ে বোটটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবারও কোন উপায় নেই, কারণ চারদিকে শুধু বোট আর বোট।

'জায়গা মত পৌঁছে ডাকবেন আমাকে,' মই বেয়ে নামতে শুরু করল রানা।

থ্রটল টানলেন হ্যাসটন, হুইল ঘোরালেন, কিন্তু তবু থামল না বোট, এঁকেবেঁকে এগোল, আগের মতই সেই স্কুনারের দিকে ছুটছে। থ্রটল ঠেলে দিলেন তিনি, সগর্জনে রিভার্সে চলে গেল বোট, ঘুরে এগোল একটা ফিশিং বোটের পিছন লক্ষ করে। 'কি চান আপনি?' আতঙ্কিত গলায় জানতে চাইলেন।

রানা বলল, 'এত যখন শখ আপনার, সামলান।'

'না!' প্রতিবাদ করলেন হ্যাসটন। 'আমি...হেলপ! হেলপ!' থ্রটল সামনে ঠেললেন তিনি, আবার স্কুনারের দিকে মুখ করল বোট।

আরও এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা। শূন্যে হাত তুলে হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে এলেন হ্যাসটন। মইয়ের ধাপ দুটো টপকে ডেকের ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে এল রানা, ধরে ফেলল হুইল। ওর হাতে ঘুরল সেটা, তারপর দর্জি যেমন সুচের ফুটোয় সুতো পরায়, বোটটাকে স্কুনারের বো আর ফিশিং বোটের লেজের মাঝখান দিয়ে বের করে আনল, দুটোকেই মাত্র ছ'ইঞ্চির জন্যে স্পর্শ করল না সী কুইন।

'মজার ব্যাপার, তাই না?' বিপদ কেটে যাবার পর বলল রানা। 'কিছু কিছু জিনিস টাকা দিয়েও কেনা যায় না।'

রেগে গেছেন হ্যাসটন। 'এ-সবের কোন দরকার ছিল না...।'

'খুব বেশি দরকার ছিল,' বলল রানা। 'শুনুন, মি. হ্যাসটন। এখানে আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বোটে আমরা সবাই যে যার আলাদা এজেণ্ডা নিয়ে ছুটোছুটি করব, এ হতে পারে না। ড. ফেরেল স্কুইডটা সম্পর্কে জানেন, কিন্তু সমুদ্র সম্পর্কে তাঁর কোন বাস্তব ধারণা নেই। টেডি ওয়াটারম্যান সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ, কিন্তু স্কুইড সম্পর্কে কিছু জানে না। আমি সমুদ্র, বোট ও স্কুইড, তিনটে সম্পর্কেই কম-বেশি জানি। আর আপনি, টাকা বানানোর কৌশল ছাড়া ঘোড়ার ডিম কিছুই জানেন না। কাজেই বলুন, কি আছে কেসটায়?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে হ্যাসটন বললেন, 'একটা রাইফেল।'

'ওটা আপনি আনলেন কিভাবে? বারমুডা কাস্টমস আর্মস আনতে দেয় না।'

'খুলে আনা হয়েছে। ড. ফেরেলের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের সঙ্গে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ওগুলো। একজন আর্মারার ছাড়া আর কারও পক্ষে চিনতে পারার কথা নয়।'

'কি ধরনের রাইফেল?'

'একটা ফিনিশ অ্যাসল্ট রাইফেল। ভালমেট। সাধারণত ন্যাটোর স্ট্যাণ্ডার্ড সেভেন-পয়েন্ট-সিক্সটি-ফাইভ মিলিমিটার কার্তুজ ব্যবহার করা হয় ওটায়।'

'সাধারণত মানে? আপনি ওটার ওপর কারিগরি ফলিয়েছেন নাকি?'

'বুলেটগুলোয়, হ্যাঁ। ক্লিপগুলো লোড করা হয়েছে, যাতে দুটোর পর একটা করে বুলেট ফসফরাস ট্রেসার হয়, বাকিগুলোয় সায়ানাইড ভরা হয়েছে।'

'আপনার ধারণা, স্কুইডটাকে এভাবে মারা সম্ভব?'

'সে-কথা ভেবেই করা হয়েছে আয়োজনটা,' বললেন হ্যাসটন। 'ড. ফেরেল ওটাকে খুঁজে বের করবেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা সারতে চান সারবেন, তারপর আমি ওটাকে মারব।'

'মারার কাজটা আপনারই করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সত্যি মনে করেন, এই পর্যায়ে এসে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু করার আছে আপনার?'

'ব্যাপারটা এখন আর তাদেরকে নিয়ে নয়, মি. রানা। অন্তত এখন আর নয়। ব্যাপারটা এখন আমাকে নিয়ে। এটা এমন একটা কাজ, আমাকে করতেই হবে।'

আবার এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আই সী। ঠিক আছে, মি. হ্যাসটন। তবে আমার একটা পরামর্শ নিন। প্রথম সুযোগেই কাজটা সেরে ফেলবেন। কারণ আমি আপনাকে ওই একটা সুযোগই দেব। তারপর যা করার আমি করব, নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমার হাতে।'

'জানতে পারি, কি করতে চান আপনি?'

'আমি ওটাকে উড়িয়ে দেব। অন্তত চেষ্টা করব।'

'ফেয়ার এনাফ,' বললেন হ্যাসটন। 'কফি চলবে?'

'শিওর। ব্ল্যাক।'

মইয়ের দিকে হেঁটে গেলেন হ্যাসটন, বললেন, 'মেটকে বলছি, পাঠিয়ে দেবে।'

'মেট হলো, মি. হ্যাসটন, আপনাদের ইউএস নেভির একজন লেফটেন্যান্ট। বললে হবে না, অনুরোধ করতে হবে। আর প্লীজ বলতে ভুলবেন না।'

মুখ খুললেন হ্যাসটন, আবার সেটা বন্ধ করলেন। 'এক্সকিউজ মি,' বলে নেমে গেলেন নিচে।

বে-র মুখ থেকে দক্ষিণ দিকে ঘুরল বোট। বাঁক নেয়ার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। একজোড়া পাইন গাছের তলায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বোন, এনা আর মোনা, বাতাসে উড়ছে তাদের নাইটগাউন। রানাকে দেখে হাত নাড়ল তারা, সাড়া দিল রানাও। তারপর মোনাকে ওখানে রেখে ঘুরে দাঁড়াল এনা, লনের ওপর দিয়ে মাথা নিচু করে ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে। যতক্ষণ দেখা গেল ওদের, হাত নাড়ল মোনা।

রানার জন্যে এক মগ কফি নিয়ে এল ওয়াটারম্যান, তারপর ফ্লাইং ব্রিজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওর পাশে। উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকাল ওরা, গভীর পানির কিনারায় নোঙর ফেলে রয়েছে মরগান এক্সপ্লোরার।

কিছুক্ষণ কেউ ওরা কথা বলল না, তারপর রানা বলল, 'মেয়েটাকে তুমি পছন্দ করতে।'

'হ্যাঁ। এমন কি এ-ও ভেবেছিলাম যে...থাক, এখন আর এ-সব ভেবে লাভ কি।'

ব্রিজে উঠে এলেন ড. ফেরেল, একপাশে দাঁড়ালেন। উত্তেজিত ও অস্থির দেখাচ্ছে।

'সাগরে প্রচুর ঘোরাফেরা করেছেন, ড. ফেরেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সামান্য, বহু বছর আগে। অক্টোপাস সংগ্রহ করতাম। তবে এরকম কিছু না। এর জন্যে আমি সারাজীবন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এটাই একমাত্র সাধ আমার, একটা জায়ান্ট স্কুইড ধরব। ওটা আমার ড্রাগন।'

'স্কুইড ড্রাগন হলো কি করে?'

'আমি ওটাকে এভাবেই দেখি। সেজন্যেই আমার শেষ বইটার নাম দিয়েছি, লাস্ট ড্রাগন। মানুষের ড্রাগন দরকার আছে, অচেনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে। আপনি তো প্রাচীন মানচিত্র অবশ্যই দেখেছেন। অচেনা ভূমি আঁকার সময় আগেকার দিনে ওঁরা লিখতেন, 'হিয়ার বি ড্রাগনস। তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে যেত। আমি আমার জীবনটা ড্রাগনের ওপর পড়াশোনা আর লেখালেখি করে কাটিয়েছি। আপনি জানেন এরকম একটা ড্রাগনের মুখোমুখি হতে পারাটা কত বড় একটা সুযোগ, কি পরম সৌভাগ্য?'

'ড্রাগনটাকে আপনি না মারলে, ওটাই হয়তো আপনাকে মেরে ফেলবে, এভাবে কোনদিন ভেবেছেন কি, ড. ফেরেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিজ্ঞানীরা সেই ভয়ে পিছিয়ে আসেন না।' হঠাৎ হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন ড. ফেরেল। 'দেখুন!'

বোটের বো থেকে ছিটকে সরে গেল ছ'সাতটা ফ্লাইং ফিশ, পানি ছুঁয়ে উড়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ গজ, তারপর আবার ডুব দিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন ড. ফেরেল।

এক সময় ওরা শেওলার লম্বা একটা বিস্তার দেখতে পেল, হলুদ লতাপাতা, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয় অথচ একটা আরেকটাকে অনুসরণ করছে, পিঁপড়েদের মত, সেই দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত।

'ওগুলো কি সব সময় সরল একটা রেখা তৈরি করে?' জানতে চাইলেন ড. ফেরেল।

'সেরকমই তো দেখি। এটা একটা রহস্য। স্তূপ হয়ে থাকা মাছের ডিম বা ওই ধরনের কিছু আমরা যা দেখেছিলাম, ওটার মত। ওটা কি ছিল, বুঝতে পারিনি আমি, জানি না কোত্থেকে এল বা কোথায় গেল।'

'কিসের কথা বলছেন? কি রকম দেখতে?'

স্বচ্ছ জেলির মত জিনিসটার বর্ণনা দিল রানা, মাঝখানে একটা গর্ত আছে, ব্যাখ্যা করল কিভাবে ওগুলো ঘুরছে বলে মনে হচ্ছিল, যেন প্রতিটি অংশ মেলে ধরছিল সূর্যের দিকে।

একের পর এক প্রশ্ন করলেন ড. ফেরেল, জেরা করার সুরে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলেন। প্রতিটি উত্তর তাঁকে যেন আরও বেশি উত্তেজিত করে তুলল। 'ওটা ছিল ডিমের একটা থলি,' অবশেষে বললেন তিনি। 'এর আগে কেউ কোনদিন দেখেনি, অন্তত গত একশো বছরে কেউ দেখেনি। আপনার কি মনে হয়, ওরকম আরেকটা আপনি দেখতে পাবেন?'

'কি করে বলি। সেদিনই প্রথম দেখলাম, আগে কখনও চোখে পড়েনি। দু'বার দেখেছি, একবার চেষ্টা করি খানিকটা সংগ্রহ করার, কিন্তু খসে পড়ে যায়।'

'তাই তো যাবে। আর একবার ওটার জরায়ু ছিঁড়ে গেলে, ভেতরের প্রাণীগুলো সব মারা যাবে।'

'এ-ধরনের একটা থলেতে কি ধরনের প্রাণী বাস করে?'

সাগরের দিকে তাকালেন ড. ফেরেল। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালেন রানার দিকে। 'আপনার কি ধারণা, মি. রানা?'

'আমি কি করে জানব…!' মাঝপথে থেমে গেল রানা, তারপর প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'মাই গড! শিশু দানব? ওই জেলির ভেতর?'

'শয়ে শয়ে,' ড. ফেরেল বললেন। 'এমন কি হয়তো হাজারে হাজারে।'

'কিন্তু ওগুলো মারা যাবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'সাধারণত, হ্যাঁ। বেশিরভাগ।'

রানা বলল, 'কিছুতে খেয়ে ফেলবে।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন ড. ফেরেল। 'তবে খেয়ে ফেলার জন্যে কিছু যদি থাকে পানিতে।'

নয়

'আপনার বুক শেলফে আমি হোমারের ইলিয়াড দেখেছি,' বললেন ড. ফেরেল, নিজের একটা কেস থেকে ছয় ইঞ্চি স্টেনলেস-স্টীল হুক বের করে ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে। 'আপনি সম্ভবত তাঁর অডিসিও পড়েছেন।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। হুকের কাঁটা একটা ম্যাকারল্-এর গায়ে ঘষল ও, তারপর মাছটাকে ছুঁড়ে দিল একদিকে, ওখানে ধীরে ধীরে একটা স্তূপ তৈরি হচ্ছে।

'আমি নাম শুনেছি, কিন্তু পড়িনি,' বলল ওয়াটারম্যান। হুকের চোখে সুইভেল আটকাচ্ছে সে, তারপর প্রত্যেক সুইভেলে ছয়-ফুটী টাইটেনিয়াম ওয়্যার লিডার বাঁধছে।

'এমন অনেক মানুষ আছে, তাদের মধ্যে আমি একজন, যারা বিশ্বাস করে হোমার তিন হাজার বছর আগে জায়্যান্ট স্কুইড সম্পর্কে লিখে গেছেন। তিনি ওটার নাম দিয়েছিলেন সিলা। তার দেয়া সিলার বর্ণনা শুনুন—''চ্যাপটা বারোটা পা আছে ওটার, লম্বা হাড্ডিসার গলা আছে ছ'টা। প্রতিটি গলার ওপর রয়েছে একটা করে কুৎসিত মাথা, ঘন সন্নিবেশিত কালো তিন সারি দাঁত থেকে মৃত্যু উদ্‌গিরণ করে…খাদ্য হিসেবে মানুষই ওটার বিশেষ পছন্দ, প্রতিটি অন্ধকার জাহাজ থেকে মাথার সাহায্যে একজন মানুষ ছিনিয়ে নিতে ভুল করে না''।' হাসলেন

ড. ফেরেল। 'খুঁটিয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, তাই না?'

'আমার মনে হয়েছে,' বলল রানা, ড. ফেরেলের একটা আমব্রেলা রিগে লিডার ওয়্যার আটকাল, 'হোমার মহাশয় খানিকটা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন।' আমব্রেলা রিগটা ডেকের ওপর দিয়ে টেনে আনল ও, আরও দুটোর পাশে রাখল।

'মোটেও তা নয়,' বললেন ড. ফেরেল। 'নিজেকে কল্পনা করুন সেই প্রাচীন যুগের একজন নাবিক হিসেবে, যখন মনস্টার আর ড্রাগনই ছিল সব প্রশ্নের উত্তর। ধরুন, একটা আর্কিটিউথিস দেখতে পেয়েছেন। ডাঙায় ফিরে লোকজনকে ওটার কি বর্ণনা দেবেন আপনি? কিংবা আধুনিক যুগেই, ধরুন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, আপনি একটা ট্রুপ ট্রান্সপোর্টে রয়েছেন, এই সময় একটা আর্কিটিউথিস হামলা করল আপনার জাহাজকে। বলা নেই কওয়া নেই প্রকাণ্ড একটা দৈত্য হঠাৎ পানি থেকে মাথাচাড়া দিয়ে আপনার জাহাজের রাডার পোস্ট ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চেষ্টা করল, আপনার মুখ থেকে কি ধরনের বর্ণনা শুনতে পাব আমরা?'

'সেরকম কিছু ঘটেছে নাকি?' আমব্রেলা রিগের ক্যাপ রিঙ এক প্রস্থ কেবলের সঙ্গে আটকাল রানা, কেবলটা জোড়া লাগানো রয়েছে নাইলন রোপ-এর সঙ্গে।

'একবার নয়, কয়েকবার—হাওয়াইয়ে। অবশ্য সেটা গত শতাব্দীর কথা।'

'একটা স্কুইড কি কারণে জাহাজের ওপর হামলা চালাবে?'

'কেন, কেউ তা জানে না,' বললেন ড. ফেরেল। 'এটা একটা রহস্য।'

ওদের পাশে গুলি ছুটল। ত্রিশ রাউণ্ড, এত দ্রুত যে মনে হলো কেউ বুঝি কাপড় ছিঁড়ল। ঝট করে তাকাতেই জেরি হ্যাসটনকে দেখতে পেল

ওরা, স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। বোটের পিছনে পাখির পালক দেখা গেল, উড়ছে।

‘গুলি করা হলো কেন?’ জিজ্ঞেস করলেন ড. ফেরেল।

‘একটু প্র্যাকটিস করলাম, ড. ফেরেল,’ বললেন হ্যাসটন। রাইফেল থেকে খালি ক্লিপ বের করে নতুন একটা ভরলেন।

গিয়ারটা পানিতে নামাতে এক ঘণ্টা সময় লাগল ওদের। ড. ফেরেল জানালেন, তাঁর অপারেশনের এটা প্রথম পর্ব। আধ ইঞ্চি মোটা রশি, তিন হাজার ফুট লম্বা; খানিক দূর পরপর ছ'টা আমব্রেলা রিগ আটকানো হয়েছে, বিভিন্ন স্তরে; প্রতিটিতে টাইটেনিয়াম লিডারের সঙ্গে দশটা করে টোপ আছে। ওয়্যার ছিঁড়বে না, হুক বাঁকা হবে না। প্রতিটি হুক গোড়ায় চার ইঞ্চি। এত বড় হওয়ায় অন্য আর মাত্র একটা প্রাণী আকৃষ্ট হতে পারে—হাঙর। হুকে যদি একটা হাঙর আটকায়, ড. ফেরেল যুক্তি দেখিয়েছেন, ওটার ধস্তাধস্তি ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবে, ফলে স্কুইডের আকৃষ্ট হবার সম্ভবানা আরও খানিকটা বাড়বে। আর যদি আর্কিটিউথিস একটা টোপ গেলে, ওটার অনেকগুলো বাহু ঘন ঘন আছাড় খাবে, ফলে অন্যান্য হুক গেঁথে যাবে ওগুলোয়, এভাবে এক সময় অচল হয়ে পড়বে ওটা।

‘স্কুইডটার ওজন কি রকম হতে পারে বলে আপনার ধারণা?’ ড. ফেরেল তাঁর প্ল্যান ব্যাখ্যা করার সময় জানতে চেয়েছে রানা।

‘তা কেউ বলতে পারে না। আমি মরা স্কুইডের মাংস মেপেছি, প্রায় হুবহু সীওয়াটারের সমান ওজন। কাজেই সত্যিকার বড় একটা স্কুইড পাঁচ থেকে দশ টন হওয়া সম্ভব।’

‘দশ টন! এই বোটে আমি দশ টন মাংস তুলতেই পারব না। তাছাড়া ওটাকে মরা দেখতে পাব বলেও মনে হয় না। সী কুইনের পক্ষে

দশ টন টো করা সম্ভব, কিন্তু···।'

'কেউ আপনাকে ওটা তুলতে বলছে না, মি. রানা। আমরা ওটাকে উইঞ্চে আটকে ওপরে তুলব, তারপর মি. হ্যাসটন ওটাকে মেরে ফেলার পর নমুনা হিসেবে খানিকটা মাংস কেটে নেব আমি···।'

'কি দিয়ে, আপনার পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে?'

'আমি দেখেছি নিচে একটা চেইন স আছে। কাজ করে?'

'আপনি অ্যামবিশাস, ডক্টর, এটা মানতেই হবে,' বলছে রানা। 'কিন্তু ধরুন, ওটা যদি আপনার নিয়মে খেলতে রাজি না হয়?'

'ওটা একটা জন্তু, মি. রানা,' জবাব দিলেন ড. ফেরেল। 'স্রেফ একটা জন্তু। কথাটা ভুলবেন না।'

পানিতে রশি নামানোর পর তিনটে চার-ফুটী লালচে প্লাস্টিক মুরিং বয়া এক লাইনে ফেলেছে রানা ও ওয়াটারম্যান, রশির শেষ মাথায় আটকে ছুঁড়ে দিয়েছে বোটের বাইরে।

'এবার কি?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'অন্তত দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'তারপর না হয় তোলা যাবে রশি। চলো, খেয়ে নিই।'

লাঞ্চের পর ড. ফেরেল তাঁর কয়েকটা কেস খুললেন। একটা ভিডিও মনিটর সেট করে এক জোড়া ক্যামেরা পরীক্ষা করলেন তিনি। বাঙ্কে বসে একটা ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছেন হ্যাসটন। ওয়াটারম্যানকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। বয়াগুলোর সঙ্গে ভেসে চলেছে বোট, তবে বোটের গতি একটু বেশি হওয়ায় বয়াগুলো একশো গজের মত পিছিয়ে পড়েছে। 'লম্বা ফাঁদের সঙ্গে নিজেকে কেউ জড়ালে হুকগুলো সত্যি তাকে গেঁথে ফেলবে।'

ওয়াটারম্যান বলল, 'কিন্তু, মি. রানা, আমার মনে হয় না ড.

ফেরেল ওটাকে মারতে চান।'

'না, তা চান না। উনি প্রথমে ওটাকে দেখতে চান, দেখে কিছু শিখতে চান। বিজ্ঞানী মানুষ তো, দোষ দিতে পারো না। তবে, মনে রেখো, আমাদের দু'জনকে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। বিপদ দেখলে কাউকে কোন সুযোগ দেব না আমরা—না ড. ফেরেলকে, না স্কুইডটাকে।'

'এমন হতে পারে লাইনে জড়িয়ে নিজেই ওটা মারা পড়বে।'

'সম্ভাবনা আছে,' ওয়াটারম্যানকে আশ্বাস দিয়ে হাসল রানা। 'কিন্তু তবু ব্যাটার যদি কোন কুমতলব থাকে, আমাদের তৈরি থাকতে হবে। তুমি আমাকে বোট হুকটা দাও।'

'বোট হুক? কেন, মি. রানা?'

'সাবধানের মার নেই, টেডি। ছোট একটা বীমার ব্যবস্থা করে রাখি।' মই বেয়ে আফটার হ্যাচ দিয়ে নিচে নামল ও, অদৃশ্য হয়ে গেল হোল্ডের ভেতর।

বো থেকে বোট হুক নিয়ে ফিরে এল ওয়াটারম্যান, দেখল ইতিমধ্যে হোল্ড থেকে উঠে এসেছে রানা, দাঁড়িয়ে আছে মিডশিপ হ্যাচ কাভারের পাশে, জুতোর বাক্স আকৃতির একটা কার্ডবোর্ড কার্টন খুলছে। কার্টনটার পাশে একটা মাত্র শব্দ স্টেনসিল করা—বিদেশী একটা শব্দ।

'কি ওটা, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

কার্টনের ভেতর হাত গলিয়ে ছ'ইঞ্চি লম্বা একটা জিনিস বের করল রানা, ডায়ামিটারে ইঞ্চি তিনেক হবে, গায়ে গাঢ় লাল প্লাস্টিকের আবরণ। জিনিসটা হাতে ধরে উঁচু করে দেখাল ও। বলল, 'সেমটেক্স।'

'সেমটেক্স!' বলল ওয়াটারম্যান। 'জেসাস, ওটা তো টেরোরিস্টরা ব্যবহার করে।' সেমটেক্স সম্পর্কে শুনেছে সে, তবে দেখেনি কখনও। চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরি, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সফিসটিকেটেড

বিস্ফোরক, টেরোরিস্টদের সেরা পছন্দ। কারণ হলো, সেমটেক্স অত্যন্ত শক্তিশালী, নমনীয় ও টেকসই। সেমটেক্স দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরিত হতে পারে শুধু আনাড়ি কোন লোকের বোকামির কারণে। যে ক্যাসেট প্লেয়ারটা প্যান অ্যাম একশো-ত্রিশ উড়িয়ে দিয়েছিল তাতে ঠাসা ছিল এই জিনিস। 'এ আপনি পেলেন কোথায়?'

'সে লম্বা এক কাহিনী,' বলল রানা। 'মানুষ যদি জানত তাদের চারপাশে কি উড়ে বেড়াচ্ছে, ভয়ে তারা বোধহয় ঘর ছেড়ে বেরই হত না।'

কৌতূহলী ওয়াটারম্যানকে কাহিনীটা শোনাতে হলো।

কমপ্রেসর পার্টস-এর জন্যে জার্মানীতে অর্ডার দিয়েছিল বেল, সেগুলোর সঙ্গে চলে আসে জিনিসটা। ধরে নিতে হবে, প্যাকিং-এ ভুল হয়েছিল। কে জানে কোথায় ওটা পাঠাবার কথা ছিল। দেখে বেল প্রথমে বুঝতে পারেনি জিনিসটা কি, বুঝতে পারেনি কাস্টমস ইন্সপেক্টরও। ভবিষ্যতে কোনদিন কাজে লাগতে পারে ভেবে জিনিসটা কাস্টমসকে দান করতে চায়নি বেল, প্রশ্নের উত্তরে জানায় ওটা লুব্রিক্যান্ট। এর প্রায় দু'হপ্তা পর একটা বইতে সেমটেক্সের ছবি দেখে সে, তখন বুঝতে পারে কি রেখেছে গ্যারেজে।

বলার পর সেমটেক্সটা আবার ওয়াটারম্যানকে দেখাল রানা। 'দেখতে সামান্য হলে কি হবে, এটুকু দিয়েই বারমুডার শেষ মাথাটা হাইতি পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারি। তবে ছোট্ট একটা সমস্যা আছে আমাদের।'

'কি সেটা?'

'কোন ডেটোনেটর নেই। বেল নিশ্চয়ই ডাঙায় কোথাও রেখেছিল, পরে বোটে তুলতে ভুলে গেছে। বেল চায় না...,' থামল রানা, বড় করে শ্বাস টানল, শুধরে নিয়ে বলল আবার, '...চায়নি বোটে এমন কিছু

থাকুক যা বোটটা ডুবিয়ে দিতে পারে।'

ডেটোনেটর একটা বানিয়ে নেয়া যায়,' বলল ওয়াটারম্যান।

'কি কি দরকার তোমার?'

'বেনজিন...রেগুলার গ্যাসোলিন।'

'আউটবোর্ডের জন্য নিচে একটা গ্যালন আছে।'

'গ্লিসারিন। লাক্সের গুঁড়ো আছে বোটে?'

'গ্যালিতে, সিঙ্কের নিচে। ব্যস?'

'না, আমার একটা ট্রিগার দরকার হবে, ওটাকে ইগনাইট করার জন্যে। ফসফরাস হলে সবচেয়ে ভাল হয়। এক বাক্স কিচেন ম্যাচ পেলে হয়তো...।'

'কোন সমস্যা নয়। মি. হ্যাসটনের কাছে দুশো রাউণ্ড ফসফরাস ট্রেসার রয়েছে। কতটা দরকার তোমার?'

'ট্রেসার একটা হলেই চলবে। কিন্তু, মি. রানা, এর আগে কখনও এ-কাজ করিনি আমি। জানি কিভাবে কি করতে হয়, কিন্তু...।'

'আমিও তো এর আগে কখনও দশ টনী একটা স্কুইডকে ধাওয়া করিনি,' বলল রানা। হাসল। 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, কোথাও ভুল হচ্ছে দেখলে আমি তোমাকে শুধরে দেব।'

'দেখে বোমা বলে মনে হচ্ছে না,' কাজটা ওরা শেষ করার পর বলল ওয়াটারম্যান। 'মনে হচ্ছে সস্তা একটা পটকা।'

'কিংবা কসাইয়ের উদ্ভাবিত প্র্যাকটিক্যাল জোক,' বলল রানা। 'প্রশ্ন হলো, জিনিসটা কাজ করবে কিনা।'

'করা উচিত।'

'একটা সান্ত্বনা আছে, টেডি; কাজ যদি না করে, তোমাকে দোষ দেয়ার জন্যে আশপাশে কেউ থাকবে না।'

প্রথমে সাবানের গুঁড়ো আর গ্যাসোলিন দিয়ে খানিকটা পেস্ট তৈরি করেছে ওরা, তারপর সেমটেক্স থেকে বেরিয়ে আসা স্টিকের শেষ মাথায় আটকে দিয়েছে সেটা। একটা ট্রেসার বুলেট আগেই খুলেছিল ওয়াটারম্যান, কাজ করার সময় হাত দুটো ছিল পানি ভর্তি একটা প্যানের ভেতর, কারণ বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্র আগুন ধরে যায় ফসফরাসে। সীসার খোল আলাদা করার পর ফসফরাস, গানপাউডার আর পানির মিশ্রণ ছোট একটা কাঁচের পিল বটলে ভরেছে, মুখ বন্ধ করে কবর দিয়েছে পেস্টে।

এই মুহূর্তে দশ ফুট লম্বা বোট হুকের শেষ মাথায় ডাক্ট টেপ দিয়ে পুরো জিনিসটা আটকাচ্ছে ওরা। কাজটা শেষ হতে বোট হুক ওপরে তুলে ঝাঁকাল রানা, বোমাটা শক্তভাবে আটকে থাকে কিনা দেখে নিল। 'বলো তো, পিল বটল ভাঙার আগেই যদি স্কুইডটা এটা গিলে ফেলে, কি ঘটবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ফাটবে না,' বলল ওয়াটারম্যান। 'ফসফরাসে বাতাস না লাগলে কোন কাজ হবে না। ওটায় যদি আগুন না ধরে, ডেটোনেটরের বাকি অংশ জ্বলবে না। বোমাটা হবে অকেজো।'

'তারমানে তুমি চাও আমি যেন স্কুইডটাকে বাধ্য করি ওটায় কামড় বসাতে?'

'ওটার নাগালের মধ্যে এক সেকেণ্ডের বেশি থাকবেন না, মি. রানা। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেবেন, তা না হলে...।'

'জানি, জানি। ভাগ্য ভাল হলে ড. ফেরেলের প্ল্যানেই কাজ হবে, এ-সব আমাদের দরকার হবে না।' একবার থামল রানা। 'ভাগ্য আরও ভাল হলে, দেখা যাবে স্কুইডটা নেই, বারমুডা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।'

ফ্লাইং ব্রিজে উঠল রানা, হেঁটে চলে এল হুইলের কাছে, বোটটা

ঘুরিয়ে নিল দক্ষিণ দিকে, সাগরের পিঠে চোখ বুলিয়ে বয়াগুলো খুঁজছে। সেমটেক্সের সাহায্যে শুধু বোমাটা তৈরি করেনি ওরা, রেইলিঙের গায়ে একটা রড হোল্ডারও খাড়া করেছে, বোট হুকটা যাতে নিরাপদ দূরত্বে খাড়াভাবে থাকে। এ-সব কাজ সারতে ঘণ্টাখানেক লেগেছে ওদের। এতক্ষণ বয়াগুলোর কথা মনে ছিল না রানার।

সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো দেখতে না পাওয়ায় অবাক হলো ও। ওগুলোর কাছ থেকে আধ মাইলের বেশি এগিয়ে আসতে পারে না বোট, আর এরকম পরিষ্কার দিনে লাল বলগুলোকে অন্তত এক মাইল দূর থেকে দেখতে পাবার কথা। তবু, ঠিক কোথায় আছে ওগুলো, জানে ও; পানিতে ফেলার সময় ল্যাণ্ডমার্ক দেখে রেখেছিল। বোধহয় ওর ধারণার চেয়ে উঁচু ঢেউগুলো। তাছাড়া, এই মুহূর্তে একটা ঢেউয়ের নিচে রয়েছে ওরা। এক আধ মিনিটের মধ্যে দেখতে পাবে ওগুলোকে।

কিন্তু পেল না। দু'মিনিট পর নয়, তিন মিনিট পরও নয়। তারপর, পাঁচ মিনিট হলো দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে সী কুইন, ল্যাণ্ডমার্ক দেখে রানা বুঝতে পারল বয়াগুলো যেখানে পানিতে ছেড়েছিল সেই জায়গার ওপর দিয়ে আরও সামনে চলে এসেছে ওরা।

নেই ওগুলো।

বিনকিউলার চোখে তুলে সামুদ্রিক শেওলার ওপর ফোকাস ফেলল রানা। বয়াগুলো যদি স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়ে থাকে, শেওলার পথ ধরেই যাবে। বিস্তৃত শেওলা অনুসরণ করে দিগন্তরেখা পর্যন্ত চোখ বুলাল রানা। কোথাও নেই।

পিছনে পায়ের শব্দ, তারপর জেরি হ্যাসটনের গলা শোনা গেল, 'ওগুলো কি খুইয়েছেন?'

'না,' বলল রানা। 'এখনও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আসলে খানিক পরপর নজর রাখা উচিত ছিল,' বললেন হ্যাসটন।

'বোমা তৈরির কাজে এত বেশি ব্যস্ত ছিলেন আপনারা…।'

একটা হাত তুলল রানা, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। কিছু একটা শুনেছে ও, কিংবা অনুভব করেছে…নাকি সন্দেহ করেছে?

তারপর রানা উপলব্ধি করল, অনুভূতিটা আসছে পায়ের মাধ্যমে। অস্পষ্ট, অনেক নিচে থেকে আসছে, দুম-দুম একটা আওয়াজ। যেন দূরে কোথাও বিস্ফোরিত হচ্ছে কিছু।

'মি. রানা, আপনি কি ভেবেছেন…?'

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল রানা, চিনতে পারল শব্দটা। প্রথম এক সেকেণ্ড অবিশ্বাসে নড়তে পারল না। 'সান-অভ-আ-বীচ!' দাঁতে দাঁত পিষল ও, কাঁধের এক ধাক্কায় ভদ্রলোককে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ছুটল রেইলিঙের দিকে, ঝুঁকে তাকাল তলাবিহীন নীল সাগরে।

ঠিক এই সময় দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল ওটা, ওই একটাই অক্ষত আছে, সারফেসে উঠে আসছে নিক্ষিপ্ত মিসাইলের মত। জোরাল হুস শব্দের সঙ্গে পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওটা, ছয় ফুট শূন্যে উঠল, পানি ছিটাল ওদের গায়ে, তারপর পানির ওপর দোল খেতে শুরু করল—ওটার পিছু নিয়ে পানির নিচে ঝুলে আছে বিস্ফোরিত বাকি দুটো বয়ার ছিন্নভিন্ন অবশিষ্টাংশ।

ইতিমধ্যে ওয়াটারম্যানের পিছু নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছেন ড. ফেরেল। রানা ডেকে নেমে দেখল এরই মধ্যে রশির মাথায় হুক বেঁধে বয়াটাকে বোটে তুলে আনছে ওয়াটারম্যান।

হুক খুলে বয়াটাকে মুক্ত করল রানা, উইঞ্চে রশি আটকে চালু করল ওটা।

'ওটা কি…?' জানতে চাইছেন হ্যাসটন, '…ওটা কি স্কুইড?'

রশিটা কাঁপছে, পানির ছিটা ছড়াচ্ছে। আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে অনুভব করল রানা। 'বলতে পারছি না, মি. হ্যাসটন। তবে জানি যে

তিনটে মুরিং বয়ার প্রতিটি আধ টন ভার বহন করেও ভেসে থাকতে পারে, এর সঙ্গে যোগ করুন আধ মাইল পলি রোপ-এর টান। বয়াগুলো পানির এত গভীরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনটের মধ্যে দুটো ফেটে গেছে। এত শক্তি কার হতে পারে, আমার জানা নেই।' রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে সাগরে তাকাল ও। 'ওখানে এখনও ওটা আছে কিনা তা-ও আমি বলতে পারছি না।'

'হুকে যদি আটকা পড়ে থাকে,' ড. ফেরেল বললেন, 'তাহলে আছে। ওই ওয়্যার ছিঁড়তে পারবে না, কিংবা হুকগুলোও বাঁকা করতে পারবে না।'

'নেভার সে নেভার, ডক,' বলল রানা। 'অন্তত যখন আপনি নিজেও জানেন না কিসের সঙ্গে লাগতে গেছেন।' ওয়াটারম্যানের দিকে ফিরল ও। 'একটা ছুরি আনো, টেডি। ধার দাও ওটায়, ক্ষুরের মত হওয়া চাই। তারপর ফিরে এসে আমার পাশে দাঁড়াও।'

কেবিনে ফিরে গেল ওয়াটারম্যান, তার পিছু নিয়ে ড. ফেরেলও ঢুকলেন, ভিডিও ক্যামেরা লোড করছেন।

'ছুরি, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যাসটন। 'কি জন্যে?'

'সাবধানের মার নেই, মি. হ্যাসটন,' বলল রানা। 'যদি দেখি যে সত্যি ওটা একটা দানব, যে আকারের কথা ড. ফেরেল বলছেন তার চেয়ে যদি অর্ধেক ছোটও হয়, আর যদি দেখি আমরা ওটার সঙ্গে পারছি না, লাইন কেটে চলে যেতে দেব ওটাকে।'

'আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি তা দেখছি মিথ্যে!' রাগে ডেকের ওপর পা ঠুকলেন হ্যাসটন। 'আপনি কথা বলছেন একজন কাপুরুষের মত, মি. রানা! আমি গুলি না করা পর্যন্ত ওটাকে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন না!'

'সময় হলে দেখা যাবে কে কাপুরুষ আর কে বীরপুরুষ,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আপনি ওটাকে মারতে পারলে মারবেন, কেউ আপনাকে

বাধা দেবে না। আপনি তো শোকে এমন কাতর হয়ে আছেন, কি বলছেন নিজেও বুঝছেন না, নিজের প্রাণের ওপর আপনার কোন মায়াও আর নেই। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার শখ এখনও মেটেনি।'

কথা না বলে গট গট করে কেবিনের দিকে চলে গেলেন হ্যাসটন।

ফ্লাইং ব্রিজে একটা তেপায়া খাড়া করে তার ওপর ভিডিও ক্যামেরা বসালেন ড. ফেরেল। রেইলিঙের গায়ে গা ঠেকিয়ে পজিশন নিলেন জেরি হ্যাসটন, ত্রিশ রাউণ্ড ব্যানানা ক্লিপে লোড করা তাঁর রাইফেল, সেটা বাগিয়ে ধরেছেন বুকের কাছে। নিচে একটা উইঞ্চ চালাচ্ছে রানা, প্লাস্টিক ড্রামে রশি যোগান দিচ্ছে ওয়াটারম্যান।

ড্রামটা প্রায় অর্ধেক ভরে যেতে হাত বাড়িয়ে রশির গায়ে বার কয়েক আঙুল দিয়ে বাড়ি মারল রানা। এরপর উইঞ্চ বন্ধ করে এক হাতে জড়াল রশিটা, টান দিল।

'নেই ওটা,' বলল ও। 'ছিল কিনা কে জানে। তবে রশি এখন মুক্ত।'

'তা হতে পারে না!' প্রতিবাদ জানালেন ড. ফেরেল।

'একটু পরই জানতে পারবেন,' বলে আবার উইঞ্চ চালু করল রানা।

'তাহলে আসলে হুকে ওটা ঠিকমত আটকায়নি।'

'আপনি বলতে চান, বয়াগুলোকে নিয়ে শুধু খেলছিল ওটা?'

প্রথম আমব্রেলা রিগটা উঠে এল, পানি থেকে সেটাকে বোটে তুলে আনল ওয়াটারম্যান। টোপটা রয়েছে, পুরোটা, অক্ষত। এক মুহূর্ত পর দ্বিতীয় রিগটা উঠল, তারপর তৃতীয়টা। তিনটের কোনটাই খাওয়া হয়নি।

চতুর্থ রিগ চোখের সামনে উঠে আসছে, একটা হাত তুলল ওয়াটারম্যান, উইঞ্চের গতি কমাল রানা।

'লর্ড!' বলল ওয়াটারম্যান, রিগটা ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল, 'দেখে মনে হচ্ছে এটার ওপর দিয়ে যেন একটা ট্রেন চলে গেছে।'

রিগটা চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেছে, তারগুলো রশির চারধারে শক্তভাবে জড়ানো। রশি আর তারের শক্ত বুননের মধ্যে থেকে বেরিয়ে রয়েছে সাদা আঁশের মত কি যেন। দুটো টোপ অক্ষত পাওয়া গেল, হুকের সঙ্গে আটকানো, বাকিগুলো নেই। আর হুকগুলোর অবশিষ্ট বলতে আছে দেড়-দু'ইঞ্চি লম্বা একটা করে দণ্ড, গায়ে খোদাই করা গিঁট-এর নকশা।

ড. ফেরেলের ক্যামেরা চলছে, ভিউফাইণ্ডারে চোখ সেঁটে রেখেছেন তিনি। লেন্সের সামনে একটা হুক তুলে ধরল রানা। 'এগুলো বাঁকা করা সম্ভব নয়, তাই না? দেখতেই পাচ্ছেন, ড. ফেরেল, শুধু বাঁকা করেনি, কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। ওটাকে তাহলে আপনি কি বলবেন?'

রিগ থেকে কিছু সাদা আঁশ ছাড়াল ওয়াটারম্যান, তার আঙুলে উৎকট গন্ধ রেখে গেল ওগুলো। মুখ বিকৃত করে ট্রাউজারে হাত মুছল সে।

'ওটা আর্কিটিউথিস,' বললেন ড. ফেরেল। 'অ্যামোনিয়ার গন্ধ শুঁকুন। এই গন্ধই তার ভিজিটিং কার্ড।' ক্যামেরা বন্ধ করলেন তিনি।

'অ্যামোনিয়ার গন্ধ কি আর কারও নেই?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান।

'আর্কিটিউথিসের মত এতটা না,' বললেন ড. ফেরেল। 'এই অ্যামোনিয়াকে ওটার সিগনেচার বলা যেতে পারে। আর এই অ্যামোনিয়ার কারণেই ওটা সম্পর্কে যা কিছু জানতে পেরেছি আমরা। চলতি শতাব্দীতে জীবিত দেখা যায়নি, একটা বাদে—উনিশশো চল্লিশ সালে কিছু লোককে মেরে ফেলে সেটা। তা-ও সময়টা ছিল রাত, অন্ধকার, আসলে কিছুই দেখতে পায়নি কেউ। তবে মরা স্কুইড দেখেছে মানুষ। ষাটের দশকে স্রোতের সঙ্গে ভেসে এসেছিল

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে। ডুবে না গিয়ে ভেসে ওঠার কারণ হলো ওগুলো মাছের মত নয়, সুইম ব্লাডার নেই—মাংসে আছে অ্যামোনিয়াম আইয়ন। আর অ্যামোনিয়াম আইয়ন-এর গ্র্যাভিটি সীওয়াটারের চেয়ে সামান্য কম।'

'ঠিক কতটা কম?'

'সীওয়াটারের গ্র্যাভিটি ওয়ান-পয়েন্ট-ওহ্-টু-টু, আর অ্যামোনিয়াম আইয়নের গ্র্যাভিটি ওয়ান-পয়েন্ট-ওহ্-ওয়ান। আমি মরা স্কুইড দেখেছি, মি. রানা। অ্যামোনিয়ার তীব্র গন্ধ ছাড়ে।' ড. ফেরেল ঘাড় ফিরিয়ে হ্যাসটনের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলেন। 'আমরা ওটাকে পেয়েছি, মি. হ্যাসটন। কোন সন্দেহ নেই, এখানেই আছে ওটা।'

'কিন্তু একটা কথা, ড. ফেরেল,' বলল রানা। 'হয় আপনি পাগলামি করছেন, না হয় কিছু গোপন করে রেখেছেন। একটা জায়্যান্ট স্কুইডকে আপনি হুক দিয়ে অটকাতে পারবেন না। ওটাকে এমন কি সাবমেরিনের সাহায্যেও ধরা সম্ভব নয়। কাজেই সত্যি কথাটা এবার বলুন তো, আসলে কিভাবে ওটাকে ধরতে চাইছেন আপনি?'

মুখে সবজান্তার হাসি, ড. ফেরেল বললেন, 'জীবিত যে-কোন প্রাণী আদিম দুটো ইন্সটিঙ্কট-এর দ্বারা পরিচালিত হয়, মি. রানা, তাই নয় কি? প্রথমটা হলো খিদে। দ্বিতীয়টি কি?'

ওয়াটারম্যান অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

'সেক্স ?' বলল রানা।

'সেক্স,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ড. ফেরেল। 'আমি প্রকাণ্ড এই দানবটাকে সেক্স দিয়ে ধরতে চাই।'

দশ

কেসগুলোয় নম্বর দিয়েছেন ড. ফেরেল, কোনটার ভেতর কি আছে তা-ও নম্বর অনুসারে একটা কাগজে বিস্তারিতভাবে লিখে রেখেছেন। এই মুহূর্তে কাগজে চোখ রেখে, ওয়াটারম্যান ও হ্যাসটনের সাহায্য নিয়ে, কেসগুলো বাছাই করছেন তিনি, আফটারডেকে সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে রাখছেন।

কাজটা শেষ হবার পর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকালেন হ্যাসটন। রানার দৃষ্টিতে, ভদ্রলোক বেঁচে আছেন শুধু একটা মাত্র উদ্দেশ্যে, স্কুইডটাকে খুন করবেন। আর সব কিছু তাঁর কাছে নগণ্য হয়ে গেছে। এ-ধরনের নেশাগ্রস্ত মানুষ আগেও দেখেছে রানা, তাদের কাছে নিরাপত্তার কোন গুরুত্ব নেই। এ-ধরনের লোক বোটে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

রানা ও ওয়াটারম্যানকে ডাকলেন ড. ফেরেল। লম্বা একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি, আকারে সেটা কফিনের মত। স্ন্যাপ লক দিয়ে সুরক্ষিত। তালা খুলে ঢাকনিটা তুললেন তিনি। 'স্বীকার করুন,' গর্বভরে বললেন তিনি, 'এরচেয়ে সেক্সি জিনিস আগে কখনও দেখেননি।'

ফোম রাবারে পড়ে থাকা জিনিসটা দেখে বোলিং পিন বলে মনে হলো রানার। ছ'ফুট লম্বা, নতুন প্লাস্টিকে তৈরি, উজ্জ্বল লাল রঙ করা।

ওটার চারধারের সুইভেল থেকে কয়েকশো স্টেনলেস স্টীল হুক ঝুলছে, মাথার দিকে গাঁথা রয়েছে তিন ইঞ্চি স্টেনলেস রিঙ।

রিঙ ধরে জিনিসটা তুললেন ড. ফেরেল, ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে। রানা অনুভব করল, দশ পাউণ্ডের মত ওজন হবে। টোকা দিতে ভেতরটা ফাপা লাগল।

'হার মানলাম,' বলল রানা, জিনিসটা ধরিয়ে দিল ওয়াটারম্যানের হাতে।

'ইট'স জিনিয়াস, পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল,' সহাস্যে বললেন ড. ফেরেল।

'বোঝাই যাচ্ছে,' সমর্থন করল ওয়াটারম্যান, 'কিন্তু জিনিসটা কি?'

হেসে ফেলল রানা।

গম্ভীর হয়ে গেলেন ড. ফেরেল। ওয়াটারম্যানের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে দু'প্রান্তে হাত রাখলেন, উঁচু করলেন তার চোখের সামনে। 'এটাকে আপনারা মূল দেহ হিসেবে কল্পনা করুন, মাথা আর ধড়—যেটাকে আমরা ম্যানটল্ বলব—আর্কিটিউথিসের। সাধারণ নিয়ম হলো, একটা জায়্যান্ট স্কুইডের মূল শরীর সর্বমোট দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ হবে। কাজেই এই জিনিসটা এমন একটা প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করছে যার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য, বাহু আর চাবুক সহ, হবে আঠারো বা বিশ ফুট।'

'একটা শিশু,' মন্তব্য করল ওয়াটারম্যান। 'নগণ্য একটা প্রাণী।'

'নট নেসেসারিলি। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেক্স ড্রাইভ বা যৌনাবেগ আকৃতির ওপর নির্ভর করে না। এমনকি আমাদের আলোচ্য প্রাণীটি যদি এই জিনিসটার চেয়ে চার কি পাঁচ গুণ বেশি বড়ও হয়, হবে বলে আমি ধারণা করছি, ওটার উত্তেজনা এটা জাগাতে পারবে। প্রাণীটি যদি পুরুষ হয়, সে তার স্পার্ম ঢালবে এটার মধ্যে; আর যদি মেয়ে হয়,

সে তার ডিম নিষিক্ত করতে চাইবে।'

'এক টুকরো প্লাস্টিকে কেন ওটা কিছু করতে চাইবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখানেই উদ্ভাবনী শক্তির বাহাদুরি।' স্ক্রুর প্যাঁচ ঘুরিয়ে স্টীল রিঙটা খুলতে শুরু করলেন ড. ফেরেল। 'আর্কিটিউথিসকে যৌন কর্মে আকৃষ্ট করে, হুবহু সেরকম একটা কেমিকেল বানিয়েছি আমি—আমার কয়েক বছরের গবেষণার ফল। দুটো মরা নমুনা থেকে টিস্যুও সংগ্রহ করেছি। নোভা স্কটিয়ায় ভেসে উঠেছিল বড় আকৃতির একটা মেয়ে, সেটা থেকে ওভিডাক্ট বের করে নিয়েছি। তার দু'বছর পর খবর পেলাম কেপ কড-এ ভেসে উঠেছে একটা পুরুষ। পুরোটা নয়, আংশিক ম্যানটল্। ওখানে যখন গিয়ে পৌছুলাম, বেশি কিছু অবশিষ্ট ছিল না, পাখি আর কাঁকড়া পেয়ে বসেছিল। তবে বালির ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ায় খানিকটা রক্ষা পায়। ওখান থেকে আমি পুরোটা স্পারমাটোফোরাল ব্যাগ উদ্ধার করি। প্রায় তিন ফুট লম্বা ছিল ওটা। কয়েক মাস ধরে দুটো অংশই পরীক্ষা করি আমি, মেয়ে ও পুরুষের—মাইক্রোস্কোপ, স্পেকট্রোগ্রাফ আর কমপিউটরের সাহায্যে। অবশেষে আমি কৃত্রিম কেমিকেলটা তৈরি করে ফেলি।'

'আপনি পজিটিভ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'জিনিসটা কখনও পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে? না। তবে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করেছি। সায়েন্টিফিক্যালি ঠিকই আছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দিয়ে আপনাকে আমি বিড়ম্বিত করব না, শুধু এটুকু বলব যে উত্তেজিত একটা কুকুর যেমন গন্ধ ছড়ায়, মানুষ যেমন টেসটসটেরোন ও ফেরমোন সহ আমাদের সমস্ত হরমোন সিগন্যালে সাড়া দেয়, সেরকম একটা জায়্যান্ট স্কুইডও তার প্রজাতির অন্যান্যদের ছড়ানো রাসায়নিক পদার্থের সঙ্কেতে

সাড়া দেয়।' স্টীল রিঙের নিচে একটা গর্তের ভেতর আঙুল রাখলেন ড. ফেরেল। 'একটা ফাইল থেকে তরল কেমিকেল পড়বে এটার ভেতর, প্রতিটি হুকের পিছন দিকের খুদে গর্ত থেকে পানিতে বেরিয়ে যাবে। জিনিসটা কয়েক মাইল পর্যন্ত ছড়াবে। আর্কিটিউথিস বুঝতে পারবে, তারই মত একটা প্রাণী বংশবৃদ্ধি করার জন্যে তৈরি হয়েছে। প্রকৃতির ডাক, কাজেই এড়িয়ে যেতে পারবে না সে।'

'বুঝবে না যে ব্যাপারটা ভুয়া?' জানতে চাইল ওয়াটারম্যান।

'না। মনে রাখবেন, নিচে প্রায় কোন আলোই নেই, অর্থাৎ ওটা তার চোখের ওপর খুব একটা নির্ভর করে না। আমরা জানি বটে যে স্কুইড রঙ বদলায়, কিন্তু জানি না রঙ চিনতে পারে কিনা, সেজন্যেই নকলটা বা টোপটায় আমি লাল রঙ দিয়েছি। আমরা সবাই জানি, লাল উত্তেজনাকর রঙ। নকলটার আকৃতি একদম ঠিক। সাবধানের মার নেই ভেবে ওটার পাশে আমরা কেমিকেল লাইট ঝোলাব, বলা যায় না নিশ্চিত হবার জন্যে স্কুইড হয়তো চোখের ওপরও নির্ভর করতে পারে। যথেষ্ট আভা ছড়াবে ওগুলো।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'স্কুইডটা এই নকলটার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এল। কিন্তু তারপর?'

'ওটার আছে আটটা বাহু আর দুটো চাবুক। সন্দেহ নেই, সবগুলোর সাহায্যে নকলটা জড়িয়ে ধরবে সে। সম্পূর্ণ শরীর চেপে ধরবে ওটার সঙ্গে, এ-কাজে যেমন করা হয় আর কি।' খুদে হুকগুলো নাড়লেন ড. ফেরেল, ঠনঠন আওয়াজ করল ওগুলো। 'এগুলো সব ওটার মাংসে গেঁথে যাবে—গাঁথলেও ব্যথাটা সচকিত হবার মত যথেষ্ট হবে না। তবে যখন নকলটাকে ছেড়ে সরে যেতে চাইবে, পারবে না। তখনই ওটাকে আমরা পানি থেকে ওপরে তুলে আনব, সারফেসের যতটা কাছাকাছি আনলে আমার পক্ষে ছবি তোলা সম্ভব হবে। তারপর মি. হ্যাসটন

ওটাকে নিয়ে যা খুশি করবেন। সবশেষে আমি ওটা থেকে নমুনা হিসেবে কিছু কিছু অংশ কেটে নেব।' প্রথমে ওয়াটারম্যান, তারপর রানার দিকে তাকালেন তিনি, দাঁত বের করে হাসছেন।

'একটা ব্যাপারে বোধহয় নিশ্চিত হওয়া যায়,' বলল রানা। 'পানির ওপর উঠে আসবে ক্রুদ্ধ ও আক্রোশে অন্ধ একটা স্কুইড…।'

'আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা, তখন শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অস্থির হয়ে থাকবে ওটা। পানির তাপমাত্রা দ্রুত বদলে যাওয়ায় নির্জীব হয়ে পড়তে পারে, প্রেশার-এর পরিবর্তনে সারফেসে ওঠার আগে মারাও যেতে পারে, কিংবা এত বেশি ক্লান্ত থাকবে যে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া অচল হয়ে পড়বে। তবে যা-ই ঘটুক না কেন,' ইঙ্গিতে হ্যাসটনকে দেখালেন তিনি, 'মি. হ্যাসটন ওটাকে সামলাবেন নিজের দায়িত্বে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের রাইফেলটা দেখালেন হ্যাসটন।

'আমার ভয়টা কি জানেন?' বলল রানা। 'এ-সবের ওপর বড় বেশি নির্ভর করছেন আপনারা। অনেক নিখুঁত প্ল্যান গুবলেট হয়ে যেতে দেখেছি আমি।'

'ওঁদের প্ল্যান ব্যর্থ হলেও চিন্তার কিছু নেই,' বলল ওয়াটারম্যান, হাসছে সে। 'আমাদের কাছেও একটা অস্ত্র আছে। একটা বোমা।'

'বিস্ফোরকের কোন প্রয়োজন হবে না,' ড. ফেরেল আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'আমি বলছি, দেখবেন।'

'না হলেই ভাল,' বলল রানা। 'তবে এ-পর্যন্ত যা বুঝেছি, ওটাকে আণ্ডারএস্টিমেট করা উচিত হবে না।'

ড. ফেরেলের রিগ সেট করতে তিন ঘণ্টা লাগল ওদের। জিনিসটা অসম্ভব জটিল, উপকরণ হিসেবে থাকল কয়েক হাজার ফুট রশি,

কয়েকশো ফুট কেবল, সঙ্গে একটা লো-লাইট সার্ভেইল্যান্স ভিডিও ক্যামেরা—ফুটবল আকৃতির প্লেক্সিগ্লাস গোলকের মাথায় বসানো। ড. ফেরেল বুঝতে পারেননি পানির তলায় লম্বা লাইনে কোন জিনিস থাকলে তা ঘোরে। বরং ধরে নিয়েছিলেন যে টোপের পাশেই থাকবে তাঁর ক্যামেরা, সেটার দিকেই সারাক্ষণ ফোকাস করবে। কাজেই চেইন শ খুঁজে বের করতে হলো রানাকে, লোহার একটা পাত কেটে ক্যামেরা ও টোপের মাঝখানে আটকাতে হলো।

'কতক্ষণ সচল থাকবে ক্যামেরা?' জিজ্ঞেস করল রানা, ড. ফেরেল ব্যাটারি প্যাকে পাওয়ার কর্ড ঢোকাবার পর।

'টেপটা চলবে একশো বিশ মিনিট,' ড. ফেরেল বললেন। 'বেসে এটা লিথিয়াম ব্যাটারি, ক্যামেরা আর লাইটগুলোতে পাওয়ার সাপ্লাই দেবে। তবে ক্যামেরাটা আমরা অন করে ছেড়ে দেব না। প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর এক মিনিটের জন্যে ওটাকে অন করবে একটা টাইমার। কিংবা ইচ্ছে করলে এখান থেকেও আমি যখন খুশি অন-অফ করতে পারব।'

শেষ রিগটা তৈরি করতে সন্ধে হয়ে এল। ইতিমধ্যে বাতাস মরে গেছে, ঢেউগুলোকে ইস্পাতের মত চকচকে আর মসৃণ লাগছে।

স্টার্নের ওপর একজোড়া সী গাল দেখল ওয়াটারম্যান, শূন্যে স্থির হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, যেন আশা করছে দু'এক টুকরো রুটি বা দু'একটা মাছ দেয়া হতে পারে। তারপর বাঁক ঘুরে চলে গেল। ওগুলোর পিছু নিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি। দূরে কি যেন একটা দেখতে পেল সে। পানির সারফেসে।

প্রথমে ওয়াটারম্যান ভাবল, পানিতে ডাইভ দিচ্ছে কোন মাছ, ছলকে ওঠা পানি দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু ছলকে ওঠা পানির মত লাগছে না, ওঠার পর অনেকক্ষণ থাকছে, উঠছেও বেশ অনেকটা ওপরে। স্প্রে-র

মত।

তারপর ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। 'মি. রানা, দেখুন!' হাত লম্বা করল ওয়াটারম্যান। 'তিমি।'

'চমৎকার,' বলল রানা। 'দু'একটা তাহলে এখনও আছে।'

'কি ওগুলো? হাম্পব্যাক?'

'না। স্পার্ম হোয়েল। হাম্পব্যাক এক জায়গায় ওভাবে দেরি করে না, চলার মধ্যে থাকে। সন্ধের দিকে সব সময় এক জায়গায় জড়ো হয় স্পার্ম হোয়েল, কেন জানি না।'

তিমিগুলোর দিকে তাকালেন ড. ফেরেল, তারপর দুই হাত এক করে মুখের সামনে চোঙ বানিয়ে গর্জে উঠলেন, 'ভাগো! যাও! ভাগো!'

হেসে উঠল রানা। 'তিমির বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা কি, ড. ফেরেল?'

'কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি চাই না ওগুলো আর্কিটিউথিসকে ভয় পাইয়ে দিক। আপনি জানেন, ওগুলো স্কুইড খায়।'

'তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই আপনার,' বলল রানা। 'ওই প্রাণীটাকে ভয় পাইয়ে দেবে এমন কিছু আল্লাহ তৈরি করেছেন বলে জানা নেই আমার। তিমিরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, জানে কখন কোত্থেকে সরে যেতে হবে।'

কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন ড. ফেরেল। আবার যখন বেরিয়ে এলেন, তিমিগুলো চলে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে পানি।

স্বচ্ছ তরল পদার্থ ভরা ছয় আউন্সের একটা ভায়াল রয়েছে তাঁর হাতে। ওদেরকে নির্দেশ দিলেন তিনি, ওয়াটারম্যান টোপটাকে খাড়া করে ধরল, হ্যাসটন এক বালতি সীওয়াটার ঢাললেন ওটার ভেতর। এরপর ড. ফেরেল ভায়ালের ছিপি খুললেন, মুখ খোলা ভায়ালটা বাড়িয়ে দিলেন ওদের দিকে। 'শুঁকুন, শুঁকে দেখুন,' আহ্বান জানালেন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'স্কুইডের দুর্গন্ধ শোঁকার সুযোগ জীবনে বারবার আসে না...।' ড. ফেরেলের কব্জিটা মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরল ও, তারপর ভায়ালের কাছাকাছি সরিয়ে আনল নাক। ওর মনে হলো, নাকের ভেতরে আগুন ধরে গেল। পানি বেরিয়ে এল চোখে, পেটের ভেতর নাড়ীভুঁড়ি সব মোচড় খেলো। পিছিয়ে এসে কাশতে শুরু করল ও।

হেসে উঠে ড. ফেরেল জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দিয়ে তৈরি বলুন তো দেখি!'

'কি দিয়ে আবার,' বলল রানা। 'অ্যামোনিয়া, সালফার, অ্যামিল নাইট্রেট আর... কি যেন... জানি না। খুব খারাপ কিছু হবে।'

টোপটার ভেতর ভায়ালটা খালি করলেন ড. ফেরেল, তারপর স্ক্রু এঁটে রিঙটা আগের জায়গায় বসালেন। রিঙটা জিঞ্জির দিয়ে কেবলের সঙ্গে বাঁধা হলো, ধরাধরি করে রিগটা নামানো হলো স্টার্ন থেকে। পানিতে কিছুক্ষণ ভেসে থাকল ওটা, টোপের ভেতর থেকে সবটুকু বাতাস না বেরুনো পর্যন্ত, তারপর একগাদা বুদবুদ ছেড়ে ডুবে গেল।

স্টার্নের দু'দিকে হস্তচালিত দুটো উইঞ্চ রয়েছে, ঘোরাতে শুরু করল ওয়াটারম্যান আর রানা। পালা করে প্রথমে কেবল ছাড়ল ওরা, তারপর রশি, প্রতি বারো মিনিট পর পর থামল, ক্যামেরার কেবল রশিতে বাঁধার কাজে ড. ফেরেলকে সুযোগ দেয়ার জন্যে।

এরপর অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, স্থির সমুদ্রে ফুটে উঠল রূপালি তারার প্রতিবিম্ব, সেই সঙ্গে পুব দিগন্তরেখা থেকে সী কুইনের স্টার্ন পর্যন্ত সোনালি একটা পথ তৈরি করল চাঁদ। ওদের পিছন থেকে আসছে কেবিন লাইটের উষ্ণ আভা।

অবশেষে, ন'টার দিকে, চারশো আশি ফ্যাদম চিহ্ন সহ ওদের হাত

থেকে বেরিয়ে গেল রশিগুলো, রিগটা থামাল ওরা, রশি জড়াল উইঞ্চে, তারপর সেগুলো লোহার একটা টোইং পোস্টে বাঁধল—পোস্টটা ডেক থেকে বোটের তলা পর্যন্ত চলে গেছে।

'কিছু খাবেন, মি. হ্যাসটন?' ওয়াটারম্যানকে নিয়ে বোটের সামনে আসার জন্যে তৈরি হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

কথা না বলে মাথা নাড়লেন হ্যাসটন, এখনও একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কেবিনের ভেতর, টেবিলে বসে ভিডিও রেকর্ডার, মনিটর ও কন্ট্রোল বক্স অ্যাডজাস্ট করছেন ড. ফেরেল। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে মনিটরের দিকে তাকাল রানা। ফ্রেমে ধরা পড়েছে টোপটা, আগুপিছু নড়াচড়া করছে, ওটার গায়ের কয়েকশো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে ল্যাবে তৈরি চকচকে কেমিকেল, পিছনে অস্পষ্ট একটা দাগ তৈরি করছে, হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

রানা লক্ষ করল, ড. ফেরেল ঘামছেন, কন্ট্রোল বক্সের ডায়াল ঘোরানোর সময় হাত কাঁপছে। 'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন, ড. ফেরেল?' জিজ্ঞেস করল ও। 'অনেক সময় স্বপ্ন সত্যি না হওয়াই ভাল।'

'ভয় পাব কেন!' তীক্ষ্নস্বরে প্রতিবাদ জানালেন ড. ফেরেল। 'আমি উত্তেজিত। বুঝতে পারছেন না, আজকের এই দিনটার জন্যে ত্রিশ বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি আমি। না, ভয় পাব কেন!'

'কোন কোন সময় ভয় পাওয়া ভাল,' বলল রানা। 'সাবধান হবার কথা মনে করিয়ে দেয়।' কেবিন থেকে হুইল হাউসে চলে এল ও।

জানালা দিয়ে শান্ত সাগরের দিকে তাকাল রানা। চারদিকে কোথাও অন্য কোন আলো নেই, নেই কোন ফিশিং বোট, কোন জাহাজও আসা-যাওয়া করছে না। সাগরে ভেসে আছে শুধু ওরা কয়েকজন। ঘাড়ের পেছনে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর, কাঁধ ঝাঁকিয়ে থামিয়ে দিল

সেটাকে।

ফ্যাদোমিটারের দিকে ফিরল রানা। গ্রাফ পেপারে একটা নকশা তৈরি হচ্ছে। ডেপথ পড়ল ও। তিন হাজার ফুট পানির নিচে তলা। লাইন মাপায় যদি ওর ভুল না হয়ে থাকে, তলা থেকে একশো বিশ ফুট ওপরে ঝুলে আছে ক্যামেরা আর টোপটা। কেবিনে ফিরে আসার জন্যে এগোতে যাবে, কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত বাড়িয়ে অন করল ফিশ-ফাইণ্ডার। ডেপথ পড়ল, পাঁচশো ফ্যাদম। স্ক্রীন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, সাগরের তলা সরল একটা রেখার মত আভা ছড়াচ্ছে। স্ক্রীনের বাকি অংশ খালি।

'আপনার কেমিকেলের গন্ধ বারমুডা থেকে সব কিছুকে খেদিয়ে দিয়েছে,' কেবিনে ফিরে এসে ড. ফেরেলকে বলল ও। 'সী কুইন আর বটমের মাঝখানে কোন মাছই নেই।'

'হ্যাঁ,' বললেন ড. ফেরেল, 'থাকার কথা নয়।' ক্যামেরা বন্ধ করে টাইমার চালু করলেন তিনি।

দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসে একটা বোতামে চাপ দিল রানা, ফ্লাইং ব্রিজের ওপর আলোটা জ্বলে উঠল, উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল আফটার ডেক। জানালা দিয়ে দেখল, একচুল নড়লেন না হ্যাসটন, যেন হঠাৎ আলোর এই বিস্ফোরণও তিনি লক্ষ করেননি। মিডশিপ হ্যাচ কাভারের ওপর বসে আছেন, দু'পাশে ঝুলে রয়েছে কাঁধ, রাইফেলটা ধরে আছেন কোলের ওপর।

রানার হাতে একটা স্যাণ্ডউইচ ধরিয়ে দিল ওয়াটারম্যান। ইঙ্গিতে হ্যাসটনকে দেখিয়ে অনুমতি চাইল, 'ভদ্রলোককে দিয়ে আসব একটা?'

'ওঁর খিদে নেই,' বলল রানা। 'উনি নিজেই নিজেকে খাচ্ছেন।'

'মি. হ্যাসটন আসলে দুর্ভাগা,' রুটি আর পনিরের জন্যে হাত বাড়িয়ে বললেন ড. ফেরেল। 'ভদ্রলোক ভবিষ্যৎ হারিয়ে ফেলেছেন।

তিন হপ্তা আগে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন তিনি, জানতেন সেই ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে, তাতে তিনি প্রতিশোধ নিতে পারবেন। সেজন্যেই এটাকে তিনি একটা ভাল চুক্তি বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপারটা একটা অবসেশন হয়ে উঠেছে।'

'আপনি তাঁকে দোষ দিতে পারেন না,' বলল ওয়াটারম্যান।

'অবশ্যই পারি,' বললেন ড. ফেরেল। 'উনি বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, চিন্তা-ভাবনায় কোন যুক্তি থাকছে না।'

'তারচেয়েও খারাপ,' বলল রানা। 'উনি এখন রীতিমত বিপজ্জনক। সেজন্যেই ভদ্রলোকের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে।'

'এই অবস্থা উনি কাটিয়ে উঠবেন। আমরা তাঁকে আর্কিটিউথিসকে গুলি করার সুযোগ দেব। তারপর আগাগোড়া যা ছিলেন আবার তাই হয়ে উঠবেন—একজন বিজয়ী।'

'অতি সরলীকরণ হয়ে যাচ্ছে না, ড. ফেরেল?'

'অ্যানিমেলস আর প্রেডিক্টেবল, মি. রানা, ইভেন দ্য হিউম্যান ওয়ান।'

'আর্কিটিউথিস সহ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি নিশ্চিত, একটা মেশিনের মতই প্রোগ্রাম করা ওটা। আমরা একবার যদি ওটার কোড জানতে পারি, কখন কি করবে অনায়াসে বলে দিতে পারব।'

সাড়ে দশটার মধ্যে বারোবার ক্যামেরা চালু করল টাইমার, প্রতিবার মনিটরের সামনে ভিড় জমাল ওরা, ফ্রেমের ভেতর টোপটাকে আগুপিছু নড়তে দেখল, ফিতের মত দাগ ছাড়ছে। টোপ থেকে স্রোতের উজানে আলোর ফুলকির মত দু'একটা খুদে মাছ ছুটে গেল, স্রোতের ভাটিতে কিছু নেই, শুধুই অন্ধকার।

শান্ত সাগরে ভেসে চলেছে বোট, সামান্য হেলছে দুলছে। কেবিনের আলোয় কমলা একটা ভাব আছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত শান্তির একটা ভাব তৈরি হয়েছে, ওদেরকে যেন সম্মোহিত করতে চায়।

'ধরুন আজ যদি ওটা না আসে?' ড. ফেরেলকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাহলে কাল সকালে আসবে, কিংবা দুপুরে। তবে আসবেই।'

'আপনারা তাহলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে পারেন।'

'আমি?' হেসে উঠলেন ড. ফেরেল। 'ওটাকে না দেখা পর্যন্ত ঘুম নেই আমার, মি. রানা। তবে, প্লীজ, আপনারা শুধু শুধু জেগে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন, দরকার হলে আমি ডাকব।'

'তর্ক করবেন না, ড. ফেরেল। আপনাকেও বিশ্রাম নিতে হবে।'

রানার নির্দেশে নিচের বাঙ্করুমে নেমে গেল ওয়াটারম্যান। মনিটরের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বেঞ্চের ওপর লম্বা হলেন ড. ফেরেল, বন্ধ করলেন চোখ দুটো। হাসি চেপে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

এখনও হ্যাচ কাভারের ওপর রয়েছেন হ্যাসটন, তবে ঢলে পড়েছেন, গভীর ঘুমে অচেতন।

রশিগুলো পরীক্ষা করল রানা—সরল রেখার মত ঝুলে আছে ওগুলো, নড়ছে না।

কালো আকাশের গায়ে হালকা গোলাপি আভার মত লাগছে বারমুডাকে। সাউথহ্যাম্পটন প্রিন্সেস হোটেলের আলোর নকশা আর গিবস হিল লাইটহাউসের সচল রশ্মি চিনতে পারল ও। ওগুলো দশ মাইল দূরে, তবু ওখানে ডাঙা আছে বলে খানিকটা যেন স্বস্তিবোধ করল। এনা আর মোনার কথা মনে পড়ল ওর, বিছানায় শুয়ে আছে, তবে বোধহয় ঘুমাতে পারছে না। বেলের কথা ভাবছে দুই বোন।

কেবিনে ফিরে এসে রানা দেখল, আবার চালু হয়েছে টেলিভিশন মনিটর, ম্লান আলো ছড়াচ্ছে ড. ফেরেলের মুখে। তিনি ঘুমাচ্ছেন।

হুইলহাউসে উঠে এল রানা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাতের শব্দ শুনছে। জেনারেটর থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে, হিসহিস করছে ফ্যাদোমিটার, গুঞ্জন তুলছে ফিশ-ফাইণ্ডার। ফিশ-ফাইণ্ডারের স্ক্রীন এখনও খালি। ইস্পাতের খোলে পানির আলতো স্পর্শ, শুনতে পাচ্ছে ও। আরও শুনতে পাচ্ছে ড. ফেরেলের নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ।

কেবিনে ফিরে একটা বাঙ্কে শুয়ে পড়ল রানা। চোখে ঘুম নেই, তবু ভয় হচ্ছে চোখ বুজলে ঘুম না এসে যায়। খুবই ক্লান্ত ও, বলা যায় না। যদিও, ওর ঘুম খুব পাতলা। বিশেষ করে এ-ধরনের বিপজ্জনক অভিযানে ঘুমের ভেতরও ওর ব্রেনের একটা অংশ সজাগ থাকে—তাপমাত্রা বা বাতাসের গতি বদলে গেলে ঠিক টের পেয়ে যায়। সাগরের নিয়মিত ছন্দে সামান্য পরিবর্তনও জাগিয়ে দেয় ওকে।

রানা জানে, ওর ব্রেনে যে পাহারাদার আছে, বিশেষ করে আজ খুব সজাগ হয়ে থাকবে সে। কাজেই চোখ বুজে বিশ্রাম নেয়া যায়। ঘুমাবে না ও, তবে ঘুমিয়ে পড়লেও কোন অসুবিধে নেই।

ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। শারীরিক ক্লান্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল মস্তিষ্ক। পাহারাদার সজাগ দাঁড়িয়ে থাকল, নিঃসঙ্গ একজন সেন্ট্রি।

এগারো

অতিকায় স্কুইড প্রসারিত করল ম্যানটল্, ভেতরে পানি টানল, পেটের ফানেল থেকে বের করে দিল আবার। বিশাল শরীরটা অন্ধকার পানির ভেতর দিয়ে এত জোরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে যে প্রেশার ওয়েভ তৈরি হচ্ছে তার সামনে, পিছনে রেখে যাচ্ছে বিপুল আলোড়ন।

আদিম একটা প্রবৃত্তি তাকে একদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর থামছে সে, আবার ছুটছে আরেকদিকে। তার সেন্স বা ইন্দ্রিয় অনেকগুলো, সবগুলো প্রখর হয়ে উঠেছে, ছড়ানো-ছিটানো যে-সব সঙ্কেত তাকে অস্থির করে তুলেছে সেগুলো আরও ভালভাবে অনুভব করতে চাইছে। তার শরীরের কেমিস্ট্রি এলোমেলো হয়ে গেছে—গায়ের রঙ দ্রুত বদলে যাচ্ছে, ম্লান ধূসর থেকে বেগুনি, বেগুনি থেকে গোলাপি, তারপর লাল। কখনও উদ্বেগ তাকে অস্থির করে তুলছে, আবার কখনও প্রবল উত্তেজনা।

যে-সব সঙ্কেত পাচ্ছে সেগুলো আংশিক অচেনা, আংশিক পরিচিত, তবে তার ব্রেন ওগুলোকে দুর্নিবার আকর্ষণ হিসেবে সনাক্ত করছে। আর তাই উদভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছে ওটা, কখনও ওপর থেকে নিচে বা নিচে থেকে ওপরে ছুটছে, আবার কখনও এক পাশ থেকে আরেক পাশে, অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হারানো প্লেনের মত।

হঠাৎ করে একসঙ্গে অনেকগুলো সঙ্কেত পেয়ে গেল জলদানব।

দীর্ঘ একটা রেখার মত, অত্যন্ত ঝাঁঝাল আর স্পষ্ট।

বাকি সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেল তার, দীর্ঘ সঙ্কেত ধরে ছুটল সে তীরবেগে।

ঘুম ভেঙে গেল রানার, জানে না কেন ভাঙল। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে শুয়ে থাকল, নড়ল না। কান পেতে থাকল, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ।

পরিচিত শব্দগুলো পাচ্ছে ও। রিফ্রিজারেটরেরগুঞ্জন, ফ্যাদোমিটারের কাগজে স্টাইলাস-এর আঁচড় কাটার আওয়াজ, ড. ফেরেলের নিঃশ্বাস। পরিচিত দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছে। অন্ধকার দূর হয়েছে শুধু হুইলহাউসের বিনাকল থেকে বেরিয়ে আসা অস্পষ্ট লাল আভায়। পার্থক্য অনুভব করল শুধু বোটের দোলায়। সী কুইনের মধ্যে কেমন একটা অনিচ্ছার ভাব, যেন সাগরের স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে এখন আর এগোচ্ছে না বোটটা।

একটা গড়ান দিয়ে বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল রানা, দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বেরিয়ে এল বাইরে। পানির ওপর চোখ পড়া মাত্র বুঝতে পারল কেন ওর ঘুম ভেঙেছে।

সী কুইন উল্টোদিকে যাচ্ছে। কিছু একটা পিছন দিকে টেনে নিয়ে চলেছে ওটাকে।

তারপর স্টার্নের দিকে তাকাল রানা, দেখল বোটের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ, ছলকে উঠছে পানি। রশিগুলো আগের মতই রয়েছে, সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে, তবে এখন সেগুলো কাঁপছে। এতটা দূর থেকেও টান পড়া ফাইবারের মচমচ শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল ও।

আচ্ছা, ভাবল রানা। তাহলে শুরু হয়েছে।

মাথা নিচু করে কেবিনে ঢুকল ও, চিৎকার করে ডাকল,

'ওয়াটারম্যান!'

ধড়মড় করে বেঞ্চের ওপর উঠে বসলেন ড. ফেরেল। 'কি? কি?'

'টিভি মনিটর অন করুন, জলদি!' বলল রানা, তারপর আবার ডাকল, 'ওয়াটারম্যান, তাড়াতাড়ি চলো!'

'কেন?' হাঁপাচ্ছেন ড. ফেরেল, এখনও পুরোপুরি সজাগ নন। 'কি...?'

'স্কুইডটা হুকে আটকেছে, আবার কেন। পিছন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোট।' ড. ফেরেলের মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়াল রানা, চাপ দিল বোতামে। কাঁপতে কাঁপতে উজ্জ্বল হলো মনিটর।

স্পষ্ট কোন দৃশ্য নয়, শুধু অনেকগুলো ছায়া আর বুদবুদ দেখা যাচ্ছে স্ক্রীনে। অন্ধকার আর আলো জড়িয়ে যাচ্ছে ঘন ঘন। এলোমেলো একটা দৃশ্য, পরিষ্কার কিছু বোঝার উপায় নেই।

'টোপ!' আঁতকে উঠলেন ড. ফেরেল। 'টোপটা কোথায়?'

'টোপ এখন ওটার দখলে,' বলল রানা। 'টোপ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।'

ঠিক তখনই নিচে থেকে উঠে এল ওয়াটারম্যান। হাত-ইশারায় তাকে ডাকল রানা, বেরিয়ে এল বাইরে। স্টার্নে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হ্যাসটন, পানির ছিটা লাগায় ভিজে গেছেন, তাকিয়ে আছেন অস্থির রশিগুলোর দিকে। 'ওটাই কি?' জিজ্ঞেস করলেন রানাকে।

'হয় ওটা, নয়তো খোদ শয়তান।' হাত তুলে ওয়াটারম্যানকে স্টারবোর্ড উইঞ্চটা দেখাল রানা, পোর্টসাইড উইঞ্চটা নিজে ধরল। দু'জন এক সঙ্গে পেঁচাতে শুরু করল রশিগুলো।

দু'এক মিনিট রশি পেঁচাল না, উইঞ্চ ড্রামে পিছলে গেল। বোট আগের মতই পিছন দিকে যাচ্ছে, ঢেউয়ের গায়ে নাক গলিয়ে দিচ্ছে স্টার্ন, ছলকে উঠছে পানি।

তারপর হঠাৎ ঢিল দিয়ে সচল হলো রশি, থেমে গেল বোট।

'রশিতে কোন টান নেই,' বলল ওয়াটারম্যান। 'তারমানে কি টোপ ছেড়ে দিয়েছে ওটা?'

'হতে পারে। কিংবা হয়তো স্রেফ বাঁক ঘুরছে, বলতে পারব না। ঘোরাতে থাকো।'

ধীরে ধীরে উঠছে রশি, প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট, প্রতি মিনিটে এক ফ্যাদম। ব্যথা শুরু করল রানার পেশীতে, তারপর মনে হলো যেন আগুন ধরে গেছে, কয়েকবার উইঞ্চ ঘুরিয়েই হাত বদল করতে হলো।

'ওটা বোধহয় চলে গেছে,' বলল ওয়াটারম্যান, রশির দুশো ফ্যাদম মার্ক উইঞ্চ ড্রাম হয়ে ওদের পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাতে দেখে। 'তা না হয়েই যায় না।'

'কি জানি, মনে হয় না,' বলল রানা। রশিতে একটা হাত দিয়ে রেখেছে ও, কিছু অনুভব করা যায় কিনা পরীক্ষা করছে। ভার আছে রশিতে, তবে টান নেই। 'এমন হতে পারে, আছে ওটা, টানছে না। হয়তো একটু দম নিচ্ছে।'

'কিংবা হয়তো মরে গেছে,' বলল ওয়াটারম্যান, গলায় আশার সুর।

'ঘোরাতে থাকো, টেডি,' তাগাদা দিল রানা।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ড. ফেরেল। 'ভিডিওতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি,' বললেন তিনি। 'সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে রয়েছে।'

'তবু চালু থাকুক,' বলল রানা।

'রেখেছি।' ওদের পিছনে দাঁড়ালেন ড. ফেরেল, কেবিন বাল্কহেডের গায়ের সঙ্গে সেঁটে। অন্য একটা কেস থেকে আরেকটা ভিডিও ক্যামেরা বের করেছেন তিনি, এই মুহূর্তে সেটায় টেপ ভরে ব্যাটারি লাগাচ্ছেন।

হঠাৎ ওয়াটারম্যান বলল, 'মি. রানা! দেখুন...!' হাত তুলল সে।

রশিগুলো এখন আর খাড়া ঝুলছে না, ধীরে ধীরে বোট থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। তবে এখনও উইঞ্চ ঘোরাতে কোন বাধা অনুভব করছে না ওরা, বোটে উঠে আসছে রশিগুলো।

'সাবধান!' অকস্মাৎ চিৎকার করল রানা। 'উঠে আসছে ওটা!'

'সত্যি?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করলেন ড. ফেরেল।

হ্যাসটনের দিকে ফিরল রানা। 'গান কক করুন। এর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন আপনি।' তারপর ড. ফেরেলকে বলল, 'যদি কোন ছবি তুলতে চান, যা করার তাড়াতাড়ি করবেন। ওটা পানির ওপর বেশিক্ষণ থাকবে না।'

পরবর্তী কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। শান্ত-নিস্তব্ধ পরিবেশটা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হলো রানার।

ওয়াটারম্যান আর রানা অবিরাম উইঞ্চ ঘোরাচ্ছে, বোটের ওপর স্তূপ তৈরি করছে রশিগুলো। তারপর এক সময় সবটুকু রশি উঠে এল। মোটা জিঞ্জির বুলওয়ার্কে লেগে ঝন ঝন আওয়াজ তুলল, ওটার পিছু নিয়ে এল প্রথম প্রস্থ কেবল। 'পঞ্চাশ ফ্যাদম, টেডি,' বলল রানা। 'আর দেড় কি দু'মিনিট।'

উঠে আসছে কেবল, পুরোপুরি খাড়া নয়, টান টান হয়ে আসছে, কাঁপছে। তবে এখনও উঠে আসছে। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সারফেসের কাছাকাছি উঠে এসেছে স্কুইডটা, তবে নিশ্চিতভাবে বোঝার কোন উপায় নেই। কে জানে কত দূরে এখনও।

স্টার্নের নিচে পানির দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, রূপালি কেবল দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে, ল্যাম্পের আলোয় দেখার চেষ্টা করছে পানির নিচে কিছু আছে কিনা।

'চেহারা দেখাও, বেজন্মা শয়তান!' হঠাৎ হিসহিস করে উঠলেন জেরি হ্যাসটন।

ঠিক তখনই বাধা পেল উইঞ্চ, হড়কে গেল, সেই সঙ্গে এইমাত্র বোটে উঠে আসা কেবল কুণ্ডলী ছাড়িয়ে নেমে যেতে শুরু করল সাগরে।

'কি করছে ওটা?' চিৎকার করল ওয়াটারম্যান।

'ছুটছে আবার,' বলল রানা, উইঞ্চের হাতল ধরে শরীরের ভর চাপাল ওটার ওপর। কিন্তু মানছে না উইঞ্চ, স্পূল ঘুরছে, পানিতে ফিরে যাচ্ছে কেবল।

'না!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন হ্যাসটন। 'থামান ওটাকে!'

'পারছি না,' বলল রানা। 'সম্ভব নয়।'

'আসলে আপনি চাইছেন না! আপনি ভয় পেয়েছেন! কিভাবে থামাতে হয় দেখুন।' হাতের রাইফেল নামিয়ে রাখলেন হ্যাসটন। কুণ্ডলী পাকানো রশির দিকে ঝুঁকলেন তিনি, ঢিলে এক প্রস্থ কেবল ধরলেন।

'না!' নিষেধ করল রানা, হ্যাসটনের দিকে এক পা এগোল। কিন্তু বাধা দেয়ার আগেই লোহার পোস্টে কেবল জড়িয়ে ফেললেন হ্যাসটন। এই পোস্ট ডেক থেকে বোটের তলা পর্যন্ত চলে গেছে।

পোস্টে কেবল জড়িয়ে বেঁধে ফেললেন হ্যাসটন। 'এবার দেখুন,' বললেন তিনি, হাতে আবার রাইফেল তুললেন।

স্টার্ন থেকে এখনও নেমে যাচ্ছে কেবল, স্টীল বুলওয়ার্কে ঘষা খেয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলছে। স্টার্নের দিকে ফেরার জন্যে ঘুরলেন হ্যাসটন, উঁচু করলেন রাইফেল, তাঁর সাইটে স্কুইডটা উঠে আসার অপেক্ষায় থাকবেন। কিন্তু তাঁর ঘোরা তখনও শেষ হয়নি, পিছলে গেল পা, আর নিশ্চয়ই ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবল হলো স্কুইডের গতি, কারণ হঠাৎ দেখা গেল কেবলের কুণ্ডলীগুলো লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে ডেক ছেড়ে। ভারসাম্য ফিরে পাবার জন্যে হোঁচট খাচ্ছেন হ্যাসটন, বৃত্তের আকৃতি নিয়ে পড়ে থাকা এক প্রস্থ কেবলের মাঝখানে পা ফেললেন। চোখের

পলকে বৃত্তটা উঠে এল তাঁর হাঁটুর ওপর, শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল তাঁর উরু, একটা পুতুলের মত ডেক থেকে শূন্যে উঠে পড়লেন তিনি। আলোর ভেতর এক সেকেণ্ড ঝুলে থাকলেন। কোন শব্দ করলেন না, হাত থেকে পড়ে গেল রাইফেলটা।

তারপর প্রচণ্ড একটা শক্তি টান দিল কেবলে, দেখে মনে হলো পিছন দিকে উড়ে যাচ্ছেন হ্যাসটন, টানটা লাগছে তাঁর পায়ে, হাত দুটো প্রসারিত, যেন ডাইভ দিতে যাচ্ছেন।

পলকের জন্যে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। সেখানে কোন আতঙ্ক, কোন কষ্ট বা কোন প্রতিবাদ দেখতে পেল না রানা। শুধু বিস্ময়ের ভাব ফুটে আছে হ্যাসটনের চেহারায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তিনি যেন হতভম্ব।

ডেকে পড়ল রাইফেল, একটা বুলেট ছুটল, বুলওয়ার্কে লেগে ছিটকে গেল আরেক দিকে।

রানার মনে হলো, হ্যাসটনের পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কেবল থেকে কি যেন খসে পড়ল একটা। তবে পানিতে কোন শব্দ হলো না, কারণ সেই মুহূর্তে বিকট শব্দে লোহার পোস্টে টান দিল কেবল।

কেবলে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে ছুটল বোট, ঢেউগুলো লাফ দিয়ে বোটে উঠল, পানির ছিটা ভিজিয়ে দিল ওদেরকে।

তারপর রানা দেখল, পানি থেকে উঠে আসছে কেবল। গলা ফাটাল ও, 'উঠে আসছে ওটা!'

'কোথায়?' গর্জে উঠলেন ড. ফেরেল। 'কোথায়?'

এই সময় সবেগে উথলে ওঠা পানির আওয়াজ পেল ওরা, সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর একটা গর্জন শোনা গেল। উৎকট দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। ঝর্ণার মত ঝর ঝর করে নেমে এসে যে পানি ওদেরকে ভিজিয়ে দিচ্ছে

তা কালির মত কালো।

ডেকে হাঁটু গেড়ে ছিল রানা, সিধে হতে যাচ্ছে,এই সময় দেখতে পেল স্টার্ন থেকে দশ কি পনেরো ফুট পিছনে রূপালি একটা ঝিলিক। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল কি ওটা—কেবলের রোঁয়াগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে, পাক খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে।

চিৎকার করল ও, 'পালান!'

'হোয়াট?' হাঁ করে তাকালেন ড. ফেরেল্।

ডাইভ দিয়ে তাঁর ওপর পড়ল রানা, ডেকে-ফেলে দিল তাঁকে। ওরা পড়ে যাচ্ছে, বোটের পিছন থেকে বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ হলো, যেন একটা টানেলের ভেতর ম্যাগনাম পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, পরমুহূর্তে বাজতে শুরু করেছে তীক্ষ্ণ একটা হুইসেল।

মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ আর্তনাদ তুলে ছুটে গেল এক প্রস্থ কেবল, ভেঙে চুরমার করে দিল কেবিনের পিছনের জানালাটা। দ্বিতীয় আরেক প্রস্থ কেবল অনুসরণ করল সেটাকে। ওরা শুনতে পেল ড. ফেরেলের ক্যামেরা হাউজিং স্টীল বাল্কহেডে আছাড় খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দোল খেলো বোট, আগুপিছু করল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

'জেসাস গড...' সশব্দে হাঁপ ছাড়লেন ড. ফেরেল।

একটা গড়ান দিয়ে তাঁর ওপর থেকে নেমে সিধে হলো রানা। পিছন দিকে, অন্ধকারে তাকাল ও। এমন কিছু নেই যা দেখে বোঝা যেতে পারে ওখানে কখনও কিছু ছিল—পানি সম্পূর্ণ শান্ত, কোথাও কোন শব্দ নেই। নিস্তব্ধ সাগরে শোনা যাচ্ছে শুধু বাতাসের ফিসফিসানি।

ড. ফেরেলের চেহারা কার্ডবোর্ডের মত মলিন, ডেক থেকে উঠে

দাঁড়াবার সময় কাঁপছেন থরথর করে। 'আমি কখনও ধারণাই করতে পারিনি…,' শুরু করলেও, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল গলা।

'ভুলে যান,' বলল রানা। বোটের গা ঘেঁষে রশির ছেঁড়া টুকরো গিজগিজ করছে, ওয়াটারম্যানকে নিয়ে সেগুলো তুলছে ও।

'আপনার কথাই ঠিক,' বললেন ড. ফেরেল। 'প্রথম থেকেই আপনি ঠিক বলে আসছেন। এমন কোন উপায় নেই যার সাহায্যে ওটাকে আমরা…।'

'শুনুন, ড. ফেরেল…।' প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, ভাবল, উনি একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'প্রথমে তীরে ফিরে চলুন, তারপর আত্মসমালোচনা করার আর শোক প্রকাশের প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। মি. হ্যাসটনের জন্যে আমরা সবাই দুঃখিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি চাই নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে। আপনি কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, প্লীজ।'

ছেঁড়া রশিগুলো বোটে তোলার পর স্টার্ন থেকে নিচের দিকে ঝুঁকল ওয়াটারম্যান, বলল, 'ভাবছি রশির দু'একটা টুকরো প্রপেলারে জড়ায়নি তো?'

'নিচে নেমে একবার দেখতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। 'আমি চাই না।' তারপর বলল, 'ড. ফেরেলের একটা ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। কাজে লেগেছে টোপটা। কেমিকেলের গন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছিল ওটা। কিন্তু এখন কি হবে কে জানে! ওটার আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হলে কি ঘটাবে বলা কঠিন।'

কেবিনে ঢুকল রানা। টেবিলে বসে আছেন ড. ফেরেল। ভিডিও টেপ রিওয়াইণ্ড করেছেন, মনিটরে চোখ রেখে রেকর্ড করা দৃশ্যগুলো দেখছেন।

'কি দেখতে পাবেন বলে আশা করছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যদি কোন আকৃতি দেখতে পাই,' বললেন ড. ফেরেল। 'ঝাপসা হলেও একটা আভাস পেতে চাই।'

হুইলহাউসের দিকে পা বাড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ওয়াটারম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'অয়েল প্রেশার চেক করো, টেডি।'

এঞ্জিন রুমের হ্যাচ খুলে নিচে তাকাল ওয়াটারম্যান।

হঠাৎ সীটের ওপর একটা ঝাঁকি খেলেন ড. ফেরেল। 'জেসাস, মেরি অ্যাণ্ড জোসেফ!' চোখ দুটো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছেন মনিটরে। অন্ধের মত রেকর্ডারের কন্ট্রোল হাতড়াচ্ছেন।

ছুটে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়াল রানা ও ওয়াটারম্যান। টেপ কন্ট্রোল খুঁজে পেয়ে 'পজ' বাটনে চাপ দিলেন ড. ফেরেল।

মনিটরে শুধু ফেনা আর বুদবুদ দেখা যাচ্ছে। 'ফ্রেম-অ্যাডভান্স' বাটনে চাপ দিলেন ড. ফেরেল। লাফ দিল দৃশ্যটা। 'ওই আমাদের টোপ,' বললেন তিনি, ঘন আর চকচকে একটা জিনিসের দিকে আঙুল তাক করলেন। সাদা-কালো স্ক্রীনে ওটাকে গাঢ় রূপালি মাছের মত লাগছে। পরবর্তী ফ্রেমে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা, তারপর আবার স্ক্রীনের ওপর দিকে উদয় হলো। স্ক্রীনের নিচের দিকটা দেখালেন ড. ফেরেল, বললেন, 'এবার দেখুন!'

ধূসর রঙের কুঁজসদৃশ্য একটা আকৃতি স্ক্রীনের নিচ থেকে মাথাচাড়া দিল। ওপর দিকে উঠে আসছে, যতক্ষণ না ঢেকে ফেলল পুরোটা স্ক্রীন। ফ্রেম বদলে যাচ্ছে আগের মত, ধূসর রঙের ছায়াটা এখনও ওপর দিকে উঠছে। আর তারপরই স্ক্রীনের তলার দিকটায় সাদাটে কি যেন একটার অনুপ্রবেশ ঘটল, ওটার মাথার দিকটা ক্রমশ বেঁকে গেছে। ওপর দিকে উঠে আসছে, যেন স্ক্রীনটাকে ঢেকে ফেলতে চায়।

জিনিসটা নিশ্চয়ই ক্যামেরার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, কারণ দৃশ্যটা

ক্রমশ চওড়া হতে শুরু করেছে। নিখুঁত সাদাটে একটা বৃত্তের আকৃতি পেল জিনিসটা, বৃত্তের মাঝখানে আরেকটা নিখুঁত বৃত্ত, কয়লার চেয়েও কালো।

'মাই গড!' বলল ওয়াটারম্যান। 'ওটা কি…একটা চোখ?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. ফেরেল।

'কত বড়?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা।

'বলতে পারছি না,' উত্তর দিলেন ড. ফেরেল। 'ওটার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু নেই। তবে ক্যামেরার ফোকাল লেংথ্ যদি ছয় ফুট হয়, আর চোখটা যদি পুরো ফ্রেম জুড়ে থাকে, ওটার আকার হবে তাহলে…এরকম।' দুই ফুট ব্যবধানে হাত দুটো উঁচু করলেন তিনি। এক সেকেণ্ড নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন অবাক হয়ে, যেন চোখের যে আকৃতি তিনি তৈরি করেছেন তা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগছে। তারপর, এমন নিচু স্বরে কথা বললেন, কোন রকমে শোনা গেল, 'তারমানে ওটা নব্বুই ফুট, সম্ভবত আরও বড়।' রানার দিকে তাকালেন। 'ওটা একশো ফুটী একটা দানবও হতে পারে।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা। মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, হার্টবিট বেড়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে একবার ওর দিকে, একবার ড. ফেরেলের দিকে তাকাচ্ছে ওয়াটারম্যান।

ধাপ দুটো টপকে হুইল হাউসে চলে এল রানা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ভোর হয়ে আসছে। এরই মধ্যে হালকা নীল হয়ে উঠেছে পুবদিকের আকাশ, দিগন্তে ফিকে লাল একটা রেখা তৈরি হয়েছে।

স্টার্টার বাটনে চাপ দিল রানা, এঞ্জিন রুম থেকে ওয়ার্নিং বেল বাজার অপেক্ষায় থাকল। খক খক করে কেশে জ্যান্ত হয়ে উঠবে এঞ্জিন।

কিন্তু শুধু ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, আর কিছু শোনা গেল না।

বাটনে আবার চাপ দিল রানা। এবার কোন শব্দই হলো না। বিড়বিড় করে কিছু বলল ও। রাগে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল হুইলে। এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না দেখেই বুঝে ফেলেছে কারণটা।

জেনারেটর থেকে কোন শব্দ আসছে না। তারমানে রাতে কোন এক সময় জেনারেটরের ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে। আপনা থেকেই দায়িত্ব নিয়েছিল ব্যাটারি, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলো জ্বলেছে, রিফ্রিজারেটর, ফ্যাদোমিটার আর ফিশ-ফাইণ্ডার চলেছে, ফলে ব্যাটারির শক্তিও ফুরিয়ে গেছে। এখনও সামান্য যে শক্তি আছে, বড় আকৃতির ডিজেল এঞ্জিনটাকে জ্যান্ত করার জন্যে যথেষ্ট নয়।

পুরোপুরি চার্জ করা দুটো কমপ্রেসর ব্যাটারি আছে, একটা বেছে নিয়ে মেইন এঞ্জিনে নিয়ে যেতে হবে। প্রথমে ওটাকে নামাতে হবে মাউন্ট থেকে, তারপর রাজ্যের মেশিনারির ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে এঞ্জিন রুমে, বসাতে হবে এঞ্জিনের পাশে।

অত্যন্ত খাটনির কাজ, তবে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

হুইলহাউস থেকে বেরুতে যাবে, খেয়াল হতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইন্সট্রুমেন্টগুলো বন্ধ করা দরকার, পাওয়ার বাঁচানোর জন্যে। নতুন ব্যাটারির সমস্ত শক্তি এঞ্জিন চালু করার জন্যে দরকার হবে। ফ্যাদোমিটারের নব ঘোরাল রানা, স্টাইলাসের নড়াচড়া থেমে গেল। ফিশ-ফাইণ্ডারের সুইচ আরও খানিক দূরে। সেদিকে হাত বাড়িয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকাল ও।

স্ক্রীনটা এখন খালি নয়। প্রথমে রানা ভাবল, যাক, সাগরের তলায় প্রাণ ফিরে আসছে। তারপর আরও কাছ থেকে তাকাল, উপলব্ধি করল স্ক্রীনে এরকম দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। ছোট ছোট বিন্দুগুলো ছড়ানো-ছিটানো মাছের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু বিন্দুগুলো অনুপস্থিত। মোটা দাগ দেখলে বোঝা যায় ওখানে বড় আকৃতির মাছ আছে, কিন্তু

সেরকম কোন দাগও নেই। স্ক্রীনে একটা জিনিসই শুধু দেখা যাচ্ছে—নিরেট একটা স্তূপ। মনে হলো স্তূপটা জ্যান্ত।

কিছু একটা সারফেসের দিকে উঠে আসছে। উঠে আসছে দ্রুত।

বারো

সাগরের তলা থেকে একটা টর্পেডোর মত ওপর দিকে ছুটল জলদানব। কোন দর্শক থাকলে ভাবত, পালাচ্ছে ওটা, কারণ পিছন দিকে ছুটছে। কিন্তু না, পালাচ্ছে না। প্রকৃতি ওটাকে প্রচণ্ড বেগে দক্ষতার সঙ্গে পিছন দিকে ছোটার মত করে তৈরি করেছে। আসলে আক্রমণে রয়েছে জলদানব, তেকোণা লেজ তীরের মাথার মত, টার্গেটের দিকে গাইড করছে ওটাকে।

চাবুকের মুগুর থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত একশো ফুটেরও বেশি লম্বা ওটা, ওজন বারো টন। তবে নিজের আকৃতি সম্পর্কে ওটার কোন ধারণা নেই, জানে না পানির জগতে তার ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি।

জলদানবের চাবুকগুলো শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে এখন, বাহুগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো, গতি বেশি পেতে হলে এভাবেই ওগুলোকে রাখতে হবে।

ওটার কেমিস্ট্রি এলোমেলো হয়ে গেছে, ফলে রঙ বদলেছে বহুবার। ইন্দ্রিয়গুলো অস্থির হয়ে উঠেছে সঙ্কেতগুলোর অর্থ বোঝার জন্যে। প্রথমে যৌন-সঙ্গমের অদম্য ইচ্ছে অনুভব করছিল, কিন্তু মিলিত হতে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। তারপরও অচেনা একটা বস্তু আদিম

প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার মত গন্ধ ছেড়ে দিশেহারা করে তোলে তাকে। মিলিত হবার চেষ্টা করে সে, ব্যর্থ হয়, অচেনা বস্তুটা তার জন্যে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অগত্যা তার চাবুক আর বাহুর সাহায্যে জিনিসটাকে ধ্বংস করে দেয় সে।

এখন খেপে গেছে জলদানব, প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে। এ এক নতুন ধরনের রাগ তার। জলদানবের রঙ এখন গভীর, গাঢ় লাল।

এর আগে অতিকায় স্কুইডের রাগ হলেই ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠত, ফলে খানিক পরই পানি হয়ে যেত রাগ। কিন্তু এবার রাগটা কোনমতে দূর হচ্ছে না, আরও যেন বাড়ছে। এবং এখন তার সামনে একটা উদ্দেশ্য আছে। আছে একটা টার্গেট।

কাজেই সাগরের তলা থেকে ওপরে উঠে আসছে জলদানব। শুধু ধ্বংসযজ্ঞে আজ সন্তুষ্ট হবে না, আজ তাকে হত্যার নেশায় পেয়েছে।

ফিশ-ফাইণ্ডারে চোখ রেখে বিড়বিড় করল রানা, 'এক হাজার ফুট!' স্কুইডটা এক হাজার ফুট নিচে রয়েছে, ছুটে আসছে দ্রুত। তারমানে খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট সময় পাবে ওরা।

লাফ দিয়ে কেবিনে ঢুকল ও। 'বোট হুক, টেডি—জলদি! ফায়ারের জন্যে ডেটোনেটর রেডি কিনা দেখে নাও। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!'

'কি ব্যাপার? আবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন ড. ফেরেল।

'আবার ওটা উঠে আসছে,' বলল রানা। 'বোট চলবে না, ব্যাটারি শেষ।' হ্যাচ গলে এঞ্জিন রুমে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

ফ্লাইং ব্রিজে উঠে বোট হুকটা তুলল ওয়াটারম্যান, তারপর বোমাটা পরীক্ষা করল। গ্লিসারিন আর গ্যাসোলিন দিয়ে তৈরি পেস্ট শক্ত হয়ে গেছে, তবে এখনও ভেজা ভেজা, বিস্ফোরকের চারদিকে ভাল করে সেঁটে দিল সে। এরপর কাঁচের শিশিটা পেস্টের আরও গভীরে ঢোকাল,

বোট হুকের শেষ মাথাটা চারদিকে ছুটোছুটি করলেও যাতে পড়ে না যায়।

সহজ একটা ডিভাইস, কাজ না করার কোন কারণ নেই। ফসফরাসে বাতাস লাগা মাত্র আগুন ধরবে, সঙ্গে সঙ্গে একটা চেইন রিয়্যাকশন শুরু হবে, বিস্ফোরিত হবে সেমটেক্স। ওদেরকে শুধু দেখতে হবে, স্কুইড যেন বোতলটা কামড়ায়, কিংবা চাবুকের বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলে।

একশো ফুটী একটা দৈত্যকে বিস্ফোরক গেলানো সহজ কাজ? তারপর সময় মত লাফ দিয়ে সরে যেতে না পারলে ওটার সঙ্গে ওরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

হঠাৎ অসুস্থ বোধ করল ওয়াটারম্যান। শান্ত সাগরের দিকে তাকাল সে, সদ্য উঠে আসা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। সব কিছু শান্ত, নিরাপদ দেখাচ্ছে। মি. রানা কি করে বুঝলেন, আবার উঠে আসছে ওটা? স্ক্রীনে হয়তো একটা তিমি দেখেছেন তিনি।

এ-সব চিন্তা বাদ দাও, হাতের কাজ সারো, তৈরি হও।

বোমাটা কাজ করবে।

এঞ্জিন রুমে হামাগুড়ি দিচ্ছে রানা, সামনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ভারি টুয়েলভ-ভোল্ট ব্যাটারি। ওর হাঁটু আর কনুইয়ের চামড়া রক্তাক্ত হয়ে গেছে, পা দুটো ক্র্যাম্পের শিকার। যখন বুঝল কেবলটা ব্যাটারির নাগাল পাবে, অকেজো ব্যাটারি থেকে খুলে নিল সেটা, মাউন্ট থেকে অকেজো ব্যাটারি খোলার ঝামেলায় গেল না। নতুন ব্যাটারি কাত হয়ে পড়ে গেলে বা কেবল ছিঁড়ে ফেললে কিছু আসে যায় না ওর, এঞ্জিন একবার চালু হলে ওটা আর দরকার হবে না।

শান্তভাবে কাজ করছে রানা, কেবলগুলো ঠিকমত জোড়া লাগানো হচ্ছে কিনা দেখে নিয়ে—পজিটিভের সঙ্গে পজিটিভ, নেগেটিভের সঙ্গে

নেগেটিভ।

কাজটা শেষ করে মইয়ের দিকে ছুটল ও।

জলদানবের শিকার সরাসরি ওপরে।

চোখ দিয়ে সেটাকে দেখতে পাচ্ছে, শরীরের সেনসরের সাহায্যে অনুভবও করতে পারছে। শিকারের ভাল-মন্দ বোঝার জন্যে বা খুঁটিয়ে দেখার জন্যে থামল না ওটা। প্রাণের লক্ষণ বা খাবারের কোন গন্ধ আছে কিনা জানার কোন গরজ নেই।

তবে যেহেতু শিকার অচেনা, সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল ওটা, জিনিসটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল। তিমি যেমন সোনার ইমপাল্‌স্‌ ছাড়ে, ফিরে আসা ইমপালস ডিসাইফার করে, অচেনা বস্তুটার তলা দিয়ে চক্কর দেয়ার সময় আর্কিটিউথিস ডাক্স-ও তাই করল। এবার জিনিসটাকে চোখ দিয়েও দেখল সে। তার ছোটার পথের সামনে তৈরি হলো একটা প্রেশার ওয়েভ।

তারপর হঠাৎ ওটার ওপরে ঝুলে থাকা শিকার থেকে বিস্ফোরিত হলো তুমুল শব্দ। সেই সঙ্গে শিকার সচল হলো।

আওয়াজ আর গতিটাকে যুদ্ধের আহ্বান বলে ধরে নিল জলদানব। পেটের ফানেল ঘোরাল, সেই সঙ্গে ঘুরে গেল তার পুরোটা দৈর্ঘ্য। হামলা শুরু করল জলদানব।

ওর নিচে বোট উঁচু হচ্ছে অনুভব করে দম আটকাল রানা, তাড়াতাড়ি চাপ দিল বোতামে। এক সেকেণ্ড পর ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ এল কানে। এঞ্জিন পুরোপুরি সচল হবার অপেক্ষায় থাকল না ও, গায়ের জোরে সামনে ঠেলে দিল থ্রটল, হেলান দিল সেটার ওপর।

প্রথমে লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল বোট, তারপর হঠাৎ হারিয়ে ফেলল গতি, যেন স্টার্নের সঙ্গে নোঙরে বাঁধা রয়েছে। পিছন দিকটা ডেবে

গেল, উঁচু হলো বো, ছিটকে বাল্কহেডে পড়ল রানা। পরমুহূর্তে বোটের সামনের দিকটা নিচু হলো; নাক ঢোকাচ্ছে পানিতে। এখনও গতি পাচ্ছে না।

বদলে যাচ্ছে এঞ্জিনের আওয়াজ। প্রথমে কর্কশ গর্জন, তারপর প্রতিবাদের সুরে গোঙাতে শুরু করল, সবশেষে খক খক করে কাশছে। দু'বার কেশে থেমে গেল এঞ্জিন। অচল পড়ে থাকল সাগরে।

সর্বনাশ! চেহারা কালো হয়ে গেল রানার। স্কুইডটা সী কুইনের প্রপেলার ভেঙে ফেলেছে। হঠাৎ শীত অনুভব করল ও।

কেবিন হয়ে আফটারডেকে বেরিয়ে এল রানা।

মিডশিপ হ্যাচের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ড. ফেরেল, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা অসাড়, বোকার মত তাকিয়ে আছেন সাগরের দিকে। রানার সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কোথায় বলুন তো? আপনি বললেন যে...।'

'ঠিক আমাদের নিচে,' বলল রানা। 'খুব সাবধান, যা করবেন বুঝেসুঝে করবেন।' স্টার্নে চলে এল ও, ট্র্যানসমের ওপর দিয়ে পানির দিকে তাকাল। সুইম স্টেপের কয়েক ফুট নিচে, বোটের তলা থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে একটা টেনট্যাকল-এর ডগা।

রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ড. ফেরেল, বললেন, 'কোন সন্দেহ নেই, ওটা দিয়ে প্রপেলার জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল।'

'একটা বাহু হারিয়ে এবার যদি শান্ত হয়,' বলল রানা। 'বা ভয় পায়।'

'মাথা খারাপ!' ড. ফেরেল বললেন। 'আরও বরং খেপে উঠবে।'

মুখ তুলে ফ্লাইং ব্রিজে তাকাল রানা, দেখল রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়াটারম্যান, হাতে জেরি হ্যাসটনের রাইফেল। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ও, শুনতে পেল ড. ফেরেল বলছেন, 'মি. রানা...।'

'বলুন।'

'আমি দুঃখিত,' বললেন ড. ফেরেল। 'এর জন্যে একা আমি দায়ী··· ।'

'ভুলে যান। এখন দুঃখিত হওয়া সময়ের অপচয় মাত্র। তাড়াতাড়ি একটা লাইফ জ্যাকেট পরে নিন।'

'তারমানে··· আমরা কি ডুবে যাচ্ছি?'

'এখনও না,' বলল রানা। 'তবে সম্ভাবনা আছে।'

একটা রড হোল্ডারে খাড়াভাবে ঝুলছে বোট হুক, নামিয়ে সেটার ওজন অনুভব করল রানা।

'আমাকে দিন,' বলল ওয়াটারম্যান, বোট হুকের শেষ মাথায় আটকানো বোমাটা ইঙ্গিতে দেখাল।

'না, টেডি,' বলে জোর করে একটু হাসল রানা। 'এই বোটে আমি ক্যাপটেন। এটা ক্যাপটেনের দায়িত্ব।'

তারপর দু'জনই ওরা পানির দিকে তাকাল।

অন্ধকারে মোচড় খাচ্ছে জলদানব, ব্যথা ও বিস্ময়ে দিশেহারা। সদ্য হারানো টেনট্যাকল-এর গোড়া থেকে সবুজ তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে।

জলদানব পঙ্গু হয়ে যায়নি, শক্তির কোন অভাব অনুভব করছে না। শুধু জানে যেটাকে শিকার বলে ধারণা করেছিল সেটা শুধু শিকার নয়—শত্রুও।

আবার সারফেসের দিকে উঠতে শুরু করল জলদানব।

রানা আর ওয়াটারম্যান বোর দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ ওদের পিছন থেকে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ভেসে এল ড. ফেরেলের। 'না!'

চরকির মত আধ পাক ঘুরে স্টার্নের দিকে তাকাল ওরা, পরমুহূর্তে স্থির পাথর হয়ে গেল।

বুলওয়ার্কের ওপর দিয়ে কিছু একটা উঠে আসছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো জিনিসটা যেন প্রকাণ্ড আকারের লাল একটা শামুক, গা থেকে পিচ্ছিল কি যেন ঝরছে। তারপর ওটার সামনের অংশ ঠোঁটের মত উল্টে গেল। আরও উঁচু হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, যতক্ষণ না চওড়ায় চার ফুট আর লম্বায় আট ফুট হলো—আড়াল করল রোদকে। জিনিসটার গায়ে সজীব বৃত্ত গিজগিজ করছে, প্রতিটি একেকটা ক্ষুধার্ত মুখ। রানা দেখতে পেল, প্রত্যেক বৃত্তের মাঝখানে চকচক করছে কালো একটা করে ফলা।

'গুলি করো, টেডি।' চিৎকার করল ও। 'ফায়ার!'

কিন্তু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল ওয়াটারম্যান, সম্মোহিত হয়ে পড়েছে সে। তার হাতের রাইফেল কোন কাজে আসছে না। তারপর, ওদের নিচে, কিছু একটা শুনতে পেলেন ড. ফেরেল, ঘুরলেন বাম দিকে, পরমুহূর্তে তাঁর গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। বোটের মাঝখানে, চুপিসারে উঠে আসছে জলদানবের আরেকটা চাবুক।

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে সংবিৎ ফিরল ওয়াটারম্যানের, ঝট করে ঘুরে তিনটে গুলি করল সে। একটা অনেক ওপর দিয়ে চলে গেল, দ্বিতীয়টা লাগল বাল্কহেডে, ছিটকে আরেক দিকে বেরিয়ে গেল, শেষ বুলেটটা চাবুকের ডগায় অর্থাৎ মুগুর আকৃতির ঠিক মাঝখানে ঢুকল। মাংসে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, কোন রক্ত ঝরল না, এমনকি একটু ঝাঁকিও খেলো না। মনে হলো, বুলেটটা যেন গিলে ফেলা হয়েছে।

দুটো চাবুকই আরও বেশি করে উঠে আসছে বোটে, মোচড় খাচ্ছে সাপের মত, লাল মাংসের স্তূপ তৈরি হচ্ছে, প্রতিটি ইঞ্চি আপন ছন্দে নড়াচড়া করছে, কাঁপছে, যেন প্রতি ইঞ্চি দিয়ে অনুভব করতে চায়। ওগুলো সম্ভবত আন্দাজ করতে পারছে যে বোটে জ্যান্ত কিছু আছে, কিছু নড়াচড়া করছে—কারণ দেখা গেল, চাবুকের মাথার মুগুরগুলো সামনে বাড়তে শুরু করল, অনুসন্ধানী মাকড়সার মত।

ড. ফেরেলকে মনে হলো পঙ্গু হয়ে গেছেন। তাঁর চোখের পাতা

পড়ছে না। স্থির, অনড় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'ড. ফেরেল!' চিৎকার করল রানা। 'পালিয়ে আসুন, সরে আসুন ওখান থেকে!'

দুটো চাবুকই যখন স্টার্নে উঁচু স্তূপ হয়ে উঠল, এক মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল ওগুলোর নড়াচড়া। যেন ইতস্তত করছে জলদানব। আর তারপরই হঠাৎ এক সঙ্গে লম্বা হলো চাবুক দুটো, শক্ত টান টান হয়ে আছে পেশী, সেই সঙ্গে বোটের স্টার্ন নিচের দিকে দেবে গেল। বোটের পিছনে মাথাচাড়া দিচ্ছে সাগর, যেন জন্ম দিচ্ছে একটা পাহাড়কে। শুষে নেয়ার তীব্র একটা আওয়াজ হলো, সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা গর্জন।

'ওহ্ গড!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'বোটে উঠে আসছে!' পিছিয়ে এল ও, কাঁধের পাশে ধরে আছে বোট হুক।

প্রথমে ওরা টেনট্যাকলগুলো দেখতে পেল। সাতটা ছুঁড়ে দেয়া বাহু, আঁকড়ে ধরল স্টার্ন, যেন একজন অ্যাথলেট নিজেকে কোন প্যারালাল বার-এ তুলে আনছে, ওপরে ওঠার জন্যে চাপ দিচ্ছে নিচের দিকে।

তারপর ওরা একটা চোখ দেখল, সাদাটে হলুদ আর এত বড় যে বিশ্বাস করা যায় না, যেন সূর্যের নিচে একটা চাঁদ উঠছে। মাঝখানে অতল গহীন কালো একটা গোলক।

পানিতে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত নিচের দিকে দেবে গেল স্টার্ন। বোটে পানি উঠল, ছুটে এল সামনের দিকে, ঢুকে পড়ছে আফটার হ্যাচগুলোয়।

সত্যি যে এ-সব ঘটছে, চোখে দেখেও অবিশ্বাস্য লাগছে রানার। ডুবে যাচ্ছে ওরা, ভাবল ও। বোট ডুবে গেলে সবাই ওরা পানিতে পড়বে, আর তখন একটা একটা করে শিকার ধরবে ওটা।

একবার অন্য চোখটা উঁচু হচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে ওদের দিকে ফিরল ওটা, মনে হলো চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে ওদের ওপর। চোখ দুটোর সামনে

বাহুগুলো কাঁপছে, মোচড় খাচ্ছে। আর বাহুগুলোর গোড়ায়, একটা টার্গেটে বুল'স আই-এর মত, দুই ফুট লম্বা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ আর ফোলা, খাবারের প্রত্যাশায় খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে ঘন ঘন। শব্দটা ঠিক যেন একটা বনভূমি ঝড়ের কবলে পড়েছে, বিশাল সব গাছের কাণ্ড ভেঙে যাচ্ছে বিকট আওয়াজের সঙ্গে।

হঠাৎই সংবিৎ ফিরল ড. ফেরেলের। ঘুরলেন তিনি, ছুটলেন। পৌঁছে গেছেন মইয়ের তলায়। ধাপ বেয়ে উঠতেও শুরু করেছেন। ফ্লাইং ব্রিজে ওঠার জন্যে অর্ধেকটা মই পেরিয়ে এসেছেন। এই সময় তাঁকে দেখতে পেল স্কুইডটা।

মোচড় খেয়ে, কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল একটা চাবুক; শূন্যে উঠল, তারপর ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত সামনে ছুটল, ড. ফেরেলের নাগাল পেতে চাইছে। ওটাকে আসতে দেখলেন তিনি, মাথা নিচু করে ধাপের ওপর বসে পড়তে চাইলেন, কিন্তু পিছলে গেল পা। হাত দিয়ে ধাপ ধরে ঝুলে আছেন। চাবুকটা তাঁকে নয়, মইটাকে প্যাঁচাল, এক টানে বাল্কহেড থেকে ছিঁড়ে নিল, ঝুলিয়ে রাখল ফ্লাইং ব্রিজের ওপর। ধাপ ধরে এখনও দোল খাচ্ছেন ড. ফেরেল। তোবড়ানো একটা পুতুলের মত লাগছে তাঁকে।

'হাত ছেড়ে দিন, ডক্টর!' চিৎকার করল রানা। 'খসে পড়ুন!'

সেই মুহূর্তে অপর চাবুকটা বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল, আঘাত করতে চাইছে ড. ফেরেলকে।

মইয়ের ধাপ ছেড়ে দিলেন ড. ফেরেল। ফ্লাইং ব্রিজের আউটবোর্ড লিপ-এ পা দিয়ে পড়লেন তিনি, এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়েই টললেন, নাচানাচি করে রেইলিং ধরতে চেষ্টা করছে হাত দুটো। বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ, হাঁ হয়ে আছে মুখ। তারপর, প্রায় স্লো মোশনে, পিছন দিকে হেলে পড়লেন তিনি, খসে পড়লেন সাগরে। চাবুকটা আছাড় মারল মইটাকে, ছুঁড়ে ফেলে দিল আরেক দিকে।

ক্লিপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্কুইডটাকে গুলি করল ওয়াটারম্যান। ট্রেসার বুলেটগুলো ভেজা জবজবে মাংসে ঢুকে হারিয়ে গেল।

জলদানবের লেজ আছাড় খেলো, শরীরটাকে বোটের আরও ওপরে টেনে আনছে, পানির তলায় আরও খানিকটা ডেবে গেল স্টার্ন। পানি থেকে উঠে পড়ল বো, সেই সঙ্গে নিচ থেকে ভেসে এল টুলস, চেয়ার আর তৈজসপত্র স্টীল বাল্কহেডে লেগে ভেঙে চুরমার হবার শব্দ।

'পালাও, টেডি!' রানার গলা।

'আপনি যান, মি. রানা! ওটা আমাকে দিন···।'

'যাও বলছি! ওহ গড!'

রানার দিকে তাকাল ওয়াটারম্যান, কিছু বলতে চাইল, কিন্তু বলার আর কিছু নেই। বিস্ফারিত চোখ নিয়ে বোট থেকে সাগরে লাফিয়ে পড়ল সে।

পিছন দিকে ঘুরল রানা। কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে, ওর নিচে ঢালু হয়ে রয়েছে ডেক। বাধ্য হয়ে বসে পড়তে হলো, একটা পা বাধিয়ে রাখল রেইলিঙে।

জলদানব বোটটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে। এলোপাতাড়ি ভাবে একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যাচ্ছে চাবুকগুলো, কিছুর স্পর্শ পেলে সঙ্গে সঙ্গে আঁকড়ে ধরছে সেটাকে—রশি জড়ানো একটা ড্রাম, হ্যাচ কাভার, অ্যান্টেনা মাস্ট—আছাড় মেরে ভাঙছে, ফেলে দিচ্ছে সাগরে। ম্যানটেলে বাতাস ভরার আর ফানেল দিয়ে তা বের করে দেয়ার সময় স্কুইডটা ঘোঁতঘোঁত শব্দ করছে হাঁপিয়ে ওঠা শূকরের মত।

আর তারপর হঠাৎ ধ্বংসযজ্ঞে বিরতি দিল সে। যেন জরুরী কি একটা মনে পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করল বিশাল মাথা। মুখটা যেন অজগরদের একটা আস্তানা। ধীরে ধীরে রানার দিকে ঘুরে গেল ওটা। বাতাসে শিস দিয়ে ছুটে এল চাবুকগুলো। ফ্লাইং ব্রিজের একটা স্টীল স্ট্যানচিঅনে জড়াল। পেশীতে টান পড়ায় ওটার মাংস ফুলে

উঠতে দেখল রানা। টান দিল চাবুক, সামনের দিকে লাফ দিল স্কুইড।

একটা পা রেইলিঙে, একটা পা ডেকে রেখে ভারসাম্য রক্ষা করছে রানা; মাথার ওপর বোট হুকটা ধরে আছে হার্পূনের মত করে। একটা মাপ পাবার চেষ্টা করল ও, ঠোঁট থেকে কতটা দূরে রয়েছে ও।

মনে হলো প্রকাণ্ড দানব রানার ওপর নেমে আসছে। নাগাল পাবার চেষ্টা করল বাহুগুলো। কোন দিকে খেয়াল নেই রানার, সমস্ত মনোযোগ এক করে তাকিয়ে আছে ঠোঁটটার দিকে। তারপর ছুঁড়ল।

ঠিক ছুঁড়তে পারল কিনা বলা কঠিন, বরং বলা উচিত বোট হুকটা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়া হলো। সেই সঙ্গে লোহার রেইলিঙের গায়ে ছিটকে পড়ল ও। দেখল, বোট হুক নিয়ে উঁচু হচ্ছে একটা চাবুক, ঝাঁকি দিয়ে সাগরে ফেলে দিল সেটা।

শুধু একটা কথা ভাবতে পারছে রানা, আমি মারা যাচ্ছি।

বাহুগুলো ওর নাগাল পাবার জন্যে এগিয়ে আসছে। রেইলিঙ বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল রানা। বাঁচার এখন একটাই উপায়, বোট থেকে নেমে যাওয়া। পানিতে নেমে যদি বোটের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে, ভাঙাচোরা কিছু একটার আড়ালে যদি লুকানো সম্ভব হয়।

ওর নাগাল পেয়ে যাচ্ছে বাহুগুলো। এখন আর রেইলিঙ টপকানো সম্ভব নয়। শরীরটা কুঁকড়ে ছোট করে ফেলতে চেষ্টা করল রানা। পিছু হটছে বসে বসে। কাত হয়ে থাকা ডেকে পিছলে গেল ও। ফ্লাইং ব্রিজের কিনারা থেকে ঢালু আফটার ডেকে পড়ে গেল।

আফটার ডেকে কোমর সমান উঁচু হয়ে উঠেছে পানি। পানি কেটে রেইলিঙের দিকে এগোল রানা। না, সাগরে না নেমে আর কোন উপায় নেই।

জলদানব এবার কেবিনের কোণ ঘুরে ওর নাগাল পাবার চেষ্টা করল, ঝুলে থাকল ওর ওপর, নৃত্যরত কেউটের মত এদিক ওদিক নড়াচড়া করছে চাবুকগুলো। সাতটা ছোট বাহুও ওর নাগাল পাবার চেষ্টা করছে,

এমন কি ডগা কাটা অষ্টম বাহুটাও স্থির নয়, ওকে ধরে ঠেলে দিতে চাইছে ঠোঁটের ভেতর।

ঘুরল রানা, বোটের অপর দিকে ছুটল। ওর পাশের পানিতে আছাড় খেলো একটা বাহু, ঝট করে আরেক পাশে সরে গেল ও। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে আবার পানির ভেতর দিয়ে ছুটল। আর কতদূর? সাত ফুট? দশ ফুট? না, বোট থেকে কোনদিনই নামা হবে না ওর। তবু থামছে না রানা, কারণ আর কিছু করার নেই ওর, কারণ ওর ভেতর কি যেন একটা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হচ্ছে না।

একটা বাধা থামিয়ে দিল ওকে। পথ থেকে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু জিনিসটা অসম্ভব ভারি, নড়বে না। কি ওটা দেখার জন্যে তাকাল রানা, ভাবছে ওটার আড়ালে লুকাতে পারবে কিনা। মিড়শিপ হ্যাচের বড় কাভার, ভাসছে। কাভারের ওপর পড়ে রয়েছে চেইন স।

ইতস্তত করেনি রানা, কিছু চিন্তাও করেনি, চেইন স-টা তুলে নিয়ে টান দিল স্টার্টার কর্ডে। প্রথমবারেই স্টার্ট নিল ওটা, ছোট্ট মোটর জ্যান্ত হয়ে উঠল। চাপ দিল ট্রিগারে, ফলাটাকে ঘুরতে দেখল। নিজের গলার আওয়াজ শুনল ও, 'ও. কে.।' তারপর ঘুরল, মুখোমুখি হলো জলদানবের।

মনে হলো এক মুহূর্তের জন্যে বিরতি নিয়েছে ওটা। তারপরই রোমহর্ষক শব্দে বাতাস ছাড়ল, লাফ দিল রানার দিকে।

আবার ট্রিগারে চাপ দিল রানা, করাতের তীব্র আওয়াজ উঠল।

মোচড়ানো একটা উড়ন্ত বাহু রানার মুখের সামনে চলে এল, সেটা লক্ষ্য করে করাতটা ঠেলে দিল ও। করাতের দাঁত কামড় বসাল মাংসে, সেই সঙ্গে অ্যামোনিয়ার দুর্গন্ধ গ্রাস করল ওকে। প্রতিবাদ করল মোটর, কমে গেল গতি, যেন ভিজে কাঠ কাটতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। রানা ভাবল, না! হাল ছেড়ো না! ডুবিয়ো না আমাকে!

মোটরের শব্দ বদলে গেল আবার। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। দাঁতগুলো মাংসের গভীরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, ঝর্ণার পানির মত মাংসের কণা ছিটকে পড়ছে রানার চোখে-মুখে।

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাহুটা, খসে পড়ল নিচে। জলদানবের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের বেরিয়ে এল একটা শব্দ, ক্রোধ আর ব্যথার আওয়াজ।

আরেকটা বাহু ছুটে এল রানার দিকে, তারপর আরও একটা; করাত দিয়ে কেটে যাচ্ছে রানা। ইস্পাতের দাঁতগুলোর স্পর্শ পাওয়া মাত্র কুঁচকে যাচ্ছে বাহুগুলো, ঝাঁকি খেয়ে সরে যাচ্ছে, তারপর জলদানবের উদভ্রান্ত মস্তিষ্কের নির্দেশে আবার ছুটে এসে আক্রমণ করছে। রানার চারপাশে বৃষ্টির মত পড়ছে যেন মাংসের কিমা, সবুজ আঠাল পদার্থ আর কালো কালিতে ভিজে গেল ও।

হঠাৎ রানা অনুভব করল পানির তলায় ওর একটা পা ছুঁয়েছে কি যেন। হাঁটু বেয়ে উঠে আসছে সেটা, পেঁচিয়ে ধরছে কোমর।

একটা চাবুক পেয়ে গেছে ওকে।

ঘুরল রানা, পাবার চেষ্টা করছে ওটাকে, ওকে শক্তভাবে পেঁচিয়ে ধরার আগেই হামলা করতে চাইছে চেইন স দিয়ে। কিন্তু এঁকেবেঁকে থাকা, মোচড় খাওয়া একগাদা বাহুর মধ্যে থেকে সেটাকে আলাদা করে চিনতে পারছে না।

ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিল জলদানব, একটা পাইথনের মত। বাঁচার আর উপায় নেই, শেষ রক্ষা হলো না। সাকার ডিস্ক-এর হুকগুলো সেঁধিয়ে যাচ্ছে রানার চামড়ায়, ছোরার ফলা গাঁথার মত তীব্র ব্যথা অনুভব করছে ও। চাবুকটা শূন্যে তুলে নিচ্ছে ওকে, অনুভব করল পা দুটো ডেক ছাড়ল। উপলব্ধি করল, পুরোপুরি শূন্যে উঠে গেলে বাঁচার আর কোন আশা থাকবে না।

শরীরটা মুচড়ে ঘুরল রানা, যাতে ঠোঁটটার দিকে ফিরতে পারে।

চাবুকটা যখন চাপ দিয়ে বের করে আনছে ওর দম, ঠোঁটটার দিকে ঝুঁকল ও, সামনে ধরে আছে করাত।

ঠোঁট খুলে গেল। মুহূর্তের জন্যে অস্থির একটা জিভ দেখতে পেল রানা, লাল, দাঁতের মত সারি সারি কাঁটা গিজগিজ করছে। খোলা ঠোঁটের ভেতর করাত-টা সবেগে ঢুকিয়ে দিল ও।

হাড়সর্বস্ব ঠোঁট কাটতে ব্যর্থ হলো স-র দাঁতগুলো, হড়কে পিছিয়ে এল। আবার সেটা তুলছে রানা, ওর মুখের সামনে চলে এল একটা বাহু, পেঁচিয়ে ধরল ওর হাত, ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল স-টা, ফেলে দিল ছুঁড়ে।

এবার সত্যি মারা গেলাম, ভাবল রানা।

কোমরে চাপ বাড়াল চাবুক, রানা অনুভব করল ঝাপসা হয়ে আসছে ওর চোখ। তারমানে জ্ঞান হারাচ্ছে ও, এ তারই লক্ষণ। দেখতে পেল শূন্যে উঠে যাচ্ছে ওর শরীর, ওর দিকে নিচু হচ্ছে ঠোঁটটা, তীব্র গন্ধে অসুস্থ বোধ করল রানা।

জলদানবের একটা চোখ দেখতে পাচ্ছে ও। গাঢ় আর খালি, অস্থির।

আর ঠিক তখন মনে হলো জলদানব নিজেই উঁচু হচ্ছে, যেন নিচ থেকে একটা শক্তি ঠেলছে তাকে। একটা শব্দ হলো, জীবনে এরকম কোন শব্দ কখনও শোনেনি রানা। শোঁ শোঁ গর্জনের মত। বিশাল কি যেন একটা, নীলচে-কালো বিস্ফোরিত হলো সাগর থেকে, স্কুইডটাকে ধরে আছে মুখে।

ওকে জড়িয়ে ধরা চাবুকটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো, ছিটকে পড়ল রানা, কোত্থেকে কোথায় পড়ে যাচ্ছে জানে না। ওর জগৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে।

তেরো

'টানুন!' চিৎকার করল ওয়াটারম্যান।

পানির নিচে হাত ঢুকিয়ে রানার বেল্ট ধরার জন্যে হাতড়াতে শুরু করলেন ড. ফেরেল। বেল্টটা পেয়ে টান দিলেন তিনি, ওয়াটারম্যান ওর হাত দুটো ধরে ফেলল। উল্টো হয়ে ভেসে থাকা হ্যাচ কাভারে তোলা হলো রানাকে। ভেসে থাকলেও মাঝে মধ্যে পানি উঠছে ওটার ওপর। অত্যন্ত পুরু কাঠ একদম নিরেট, তিনজনের ঠাঁই হবার মত যথেষ্ট বড়ও।

রানার শার্ট ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। বুক আর পেটে রক্তের দাগ, যেসব জায়গায় স্কুইডটার হুক চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে।

ওর ঘাড়ের একটা রগ আঙুল দিয়ে অনুভব করল ওয়াটারম্যান। পালস নিয়মিত। 'ভেতরে কিছু ফেটে না থাকলে,' বলল সে, 'উনি বাঁচবেন!' হাসছে।

গাঢ় কুয়াশার ভেতর রানা শুনতে পেল, 'বাঁচবেন!' মনে হলো আলোর দিকে সাঁতার কাটছে ও। তারপর চোখ মেলল।

'মি. রানা, কেমন লাগছে এখন?'

'মনে হচ্ছে আমার ওপর দিয়ে একটা ট্রাক চলে গেছে।'

রানাকে ধরে বসাল ওয়াটারম্যান, ওর পিঠে একটা হাত রাখল। 'দেখুন,' বলল সে।

চারদিকে তাকাল রানা। হ্যাচ কাভারের দোলা বমির ভাব এনে

দিচ্ছে, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা দূর করতে চাইল ও।

বোটটা নেই। স্কুইডটাও নেই।

'কি ছিল ওটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কার কাজ?'

'একটা স্পার্ম হোয়েল,' বলল ওয়াটারম্যান। 'পুরো স্কুইডটাকে তুলে ফেলেছিল। ঠিক মাথার পেছনে কামড় বসিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।'

হঠাৎ পানির ওপর কি যেন একটা নড়ল। চমকে উঠল রানা।

'কিছু না,' ড. ফেরেল বললেন। 'স্রেফ মাছ। লাইফ অ্যাণ্ড নেচার।'

সাগরের সারফেসে ছড়িয়ে রয়েছে মাংস, ছোট বড় স্তূপের আকারে ভাসছে, প্রতিটি টুকরো হামলার শিকার। বোটের চার দিকে আলোড়ন ও শব্দ ছিল ডিনার পরিবেশনের ঘণ্টাধ্বনি, গভীর ও অগভীর পানি থেকে ডেকে এনেছে নানা জাতের প্রাণীদের। আবর্জনার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল হাঙরের একটা ফিন। প্রকাণ্ড এক কাছিমের মাথা পানির ওপর উঁকি দিল, তাকাল চারদিকে, তারপর ডুবে গেল আবার। ভোজনে ব্যস্ত বলে টাইগারফিশ, ইয়েলোটেইল, জ্যাকস কেউ কারও দিকে খেয়াল করছে না।

'আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল!' বলল রানা।

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোনদিকে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াটারম্যান। 'আমি তো কোথাও তীর দেখতে পাচ্ছি না। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

একটা আঙুল ভিজিয়ে বাতাসে তুলল রানা। 'বাড়ি যাচ্ছি,' বলল ও। 'উত্তর-পশ্চিমে বইছে বাতাস। বারমুডায় ফিরছি আমরা।'

সাগরের গভীরে জন্মেছে, কয়েক হপ্তা ওখানেই ছিল, পাহাড়ের গা থেকে ঝুলে পড়া একটা পাথরকে অবলম্বন করে। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক প্রকৃতি যেমনটি চেয়েছে। জমাট বাঁধা অ্যামোনিয়াম আইয়ন ভাসমানতা দেয় ওটাকে, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করে সারফেসের দিকে। যুগটা প্রাচীন হলে, ওপরে ওঠার পথে খেয়ে ফেলা

হত ওটাকে, কারণ খাদ্য হিসেবে খুবই উপাদেয় ওটা।

কিন্তু কেউ ওটাকে আক্রমণ করেনি, ফলে আবরণ ছিঁড়ে সাগরের পানি ঢোকেনি ভেতরে। তা ঢুকলে ভেতরের খুদে প্রাণীগুলো মারা যেত। কাজেই নিরাপদে উঠে এল সারফেসে, রোদ মাখল গায়ে। এই রোদ ওদের বেঁচে থাকার জন্যে একান্ত দরকার।

শান্ত পানিতে ভাসতে থাকল ওটা, বাতাস বা আবহাওয়া সম্পর্কে কোন সচেতনতা নেই, এত পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ বলে মনে হবে। তবে জেলি স্কিন বেশ মজবুত।

জিনিসটা গোলাকার, মাঝখানে একটা গর্ত আছে, শত-সহস্র বছরের পুরানো জেনেটিক নির্দেশ অনুসারে চারদিকে ঘোরায় নিজেকে, রোদে উন্মুক্ত করে দেয় নিজের সবদিক, কারণ রোদই পুষ্টি যোগান দেয়, যে পুষ্টি প্রায় একশো মিলিয়ন মাইল দূর থেকে আসে।

তবে এখনও ওটা অরক্ষিত। একটা কাছিম ওটাকে খেয়ে ফেলতে পারে, কামড় বসাতে পারে কোন হাঙর। প্রকৃতির বিধি অনুসারে এই প্রজাতির অসংখ্য সদস্য মারা যাবে, খোরাক হবে অন্যান্য প্রজাতির, যাতে করে ফুড অভ চেইনে ভারসাম্য রক্ষা পায়।

কিন্তু যেহেতু প্রকৃতি নিজেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, জেলির মত নরম আর মোমের মত স্বচ্ছ জিনিসটা দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘুরতে থাকে, যতদিন না তার মেয়াদ পুরো হয়। অবশেষে, পূর্ণতা পেয়ে, হাজার হাজার ছোট থলির আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সাগরে, প্রত্যেকটিতে রয়েছে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা প্রাণী। প্রাণীগুলো যখন বুঝতে পারে জীবন সংগ্রামের সময় হয়েছে, থলি থেকে বেরিয়ে আসে ওরা, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় খাদ্যের সন্ধান।

ওগুলো রাক্ষস, স্বগোত্রভোজী, খিদে পেলে পরস্পরকে খেয়ে ফেলে। তবে সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি আর এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সাগরে যে বেশিরভাগই বেঁচে থাকে, নেমে যেতে শুরু করে অন্ধকার

গভীরে।

সাগরের তলায় পৌছুবার আগে প্রায় সবগুলোকেই খেয়ে ফেলার কথা, বাঁচার কথা প্রতি একশোতে একটা। কিন্তু শিকারীরা প্রায় সবাই অদৃশ্য হয়েছে, মাঝে মধ্যে দু'একটা দেখা যায়। কাজেই নিরাপদ পানির ভেতর দিয়ে তিন হাজার ফুট নিচে নেমে এসে পাহাড় প্রাচীরে আশ্রয় নেয় ওগুলো, ইতিমধ্যে টিকে আছে শতকরা দশ ভাগ। তা-ও কম নয়, এক দেড়শো তো হবেই। এগুলো বেঁচে থাকে—বড় হয়।

সাগরের অতলতলে ঝুলে থাকে ওগুলো, প্রত্যেকে একা, কারণ সবাই ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ম্যানটেলে পানি ভঁরে, বের করে দেয় পেটের ফানেল থেকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বাড়ে ওদের আত্মবিশ্বাস। ওদের শরীর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে, এক কি দেড় বছর শিকারীদের ভয়ে সাবধান থাকবে ওরা। তবে একটা সময় আসবে যখন ওরা নিজেদের অমিত শক্তি আর কর্তৃত্ব উপলব্ধি করতে পারবে, আর তখন ওরা বেরুবে অভিযানে।

ঝুলে থাকে ওরা, অপেক্ষায়।

[শেষ]

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও ১৬পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২-৫-৯৫ বিষের ভয় (তিন গোয়েন্দা) রকিব হাসান

বিষয়: কল্পনাই করতে পারেনি তিন গোয়েন্দা সাধারণ চোর পাহারা দেয়ার ঘটনা তাদেরকে নিয়ে যাবে ভয়াবহ ফ্লোরিডা এভারগ্লেডের গভীরে। সাপের কামড় খেলো মুসা। আটকা পড়ল কিশোর ও রবিন। উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

আরও আসছে

২৮-৫-৯৫ রহস্যপত্রিকা (১১ বর্ষ ৮ সংখ্যা জুন, ১৯৯৫)